আজব নগরী

শ্রীপান্থ

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গল্পক্রম : গৌরচন্দ্রিকা ; কোলকাতার পিতামহ ; ফাঁসির ফ্যান্সি ; শহরে নৌকাডুবি ; ইন্দের স্মরণে ; রোটি আউর বেটি ; রাইটার ; চীনে পাড়ায় গৃহযুদ্ধ ; ঐতিহাসিক ভূত ; মূর্তি চোর ; দুই বীরের গল্প ; একটি তারকার গল্প ; জর্নালিষ্ট ; হুক্কা ও এক্কা ; অথ উত্তমর্ণ অধমর্ণ কথা ; মশা থেকে ম্যালেরিয়া ? ; কাজী থেকে মাননীয় বিচারপতি ; লালবাজার : লালপাগড়ি ; কোলকাতার ভাষা ও সাহিত্য ; কোলকাতার বাঙালী ; লটারীর শহর ; কাফি হৌস ; কলেজ-বয় ।

আজব নগরী

শ্রীপান্থ

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আজব নগরী

মীরা-কে

গল্পক্রম : গৌরচন্দ্রিকা ; কোলকাতার পিতামহ ; ফাঁসির ফ্যান্সি ; শহরে নৌকাডুবি ; ইন্দের স্মরণে ; রোটি আউর বেটি ; রাইটার ; চীনে পাড়ায় গৃহযুদ্ধ ; ঐতিহাসিক ভূত ; মূর্তি চোর ; দুই বীরের গল্প ; একটি তারকার গল্প ; জর্নালিষ্ট ; হুক্কা ও এক্কা ; অথ উত্তমর্ণ অধমর্ণ কথা ; মশা থেকে ম্যালেরিয়া ? ; কাজী থেকে মাননীয় বিচারপতি ; লালবাজার : লালপাগড়ি ; কোলকাতার ভাষা ও সাহিত্য ; কোলকাতার বাঙালী ; লটারীর শহর ; কাফি হৌস ; কলেজ-বয় ।

॥ গৌরচন্দ্রিকা ॥

রূপকথার কাহিনীই বটে। আশ্চর্য কাহিনী। আলাদীনের প্রদীপও টিম্‌টিমে এর কাছে। ময়দানবের কীর্তির কথা শুনেছি। কিন্তু সে কাহিনী দানবের। আর এই আজব নগরীর কাহিনী মানবের। সম্পূর্ণত মানুষের। সেন্টজন গীর্জার নির্জন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কোন এক সন্ধ্যায় অতি আশ্চর্য ভাবে মনে পড়ছিল আমার সেই মানুষকে। সুতানটী-গোবিন্দপুরের আদিবাসী সমাজকে। বাউরী-বাগদী-জেলে, আর্মেনিয়ান-পর্তুগীজ-ইংরেজ নরনারীকে।

আমার ডাইনে সেন্ট জন গীর্জা। সেন্ট জন গীর্জা কোলকাতার অন্যতম প্রাচীন গীর্জা। আজ বয়সে বয়সে বিবর্ণ, নোনাধরা পলেস্তারা-উঠে-যাওয়া চেহারা। এর উঁচু চূড়ায় দু'টো কালো বাদুড়ের মতো সেঁটে আছে দু'জন মানুষ। মাথায় একরাশ ইট চাপিয়ে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে আর দু'জন। নীচে ছাদের কোণে আরও একজন। এক হাতে খুন্তির ঘায়ে ভেঙে দিচ্ছে জীর্ণ কার্নিশ, অন্য হাতে পালেস্তারা লাগাচ্ছে সে ক্ষত স্থানটায়। সংস্কার চলছে গীর্জাটার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। ছবির মতো লাগছিল দেখতে। মনে হচ্ছিল যেন ছবি দেখছি কোন কোলকাতার। সপ্তদশ শতকের সুতানটীর। ডানিয়েল কিংবা রবার্ট হোমের আঁকা তৈলচিত্র নয়, দেশী পটুয়ার পাকা হাতের কাজ। আবশ্যকটুকুই মাত্র আছে আর সব বাতিল হয়ে

গেছে ক্ষিপ্র তুলির টানে। চার পাশের বিরাট বিরাট বাড়ি, বিরাটতর নগর কোলকাতা কিছুই যেন নেই। কোথায় আজ মেকলের সেই 'প্রাসাদপুরী' ?

মোড়ের মাথায় হেস্টিংস সাহেবের জন্য বাড়িটি ওঠেনি এখনও। অনুমতি মেলেনি গড় তৈরি করার। গড়ে ওঠেনি লালদীঘির পাড়ে করণিক-শালা, রাইটার্স বিল্ডিংস। সাবর্ণ চৌধুরীদের একতালা কাছারী বাড়িটারই ছায়া পড়েছে সামনের দীঘিটায়। সুতানটী, গোবিন্দপুর এবং ডিহি কোলকাতা এখনও তাঁদের জমিদারী। কোম্পানি এখানে ব্যবসায়ী মাত্র। শুল্কের বিনিময়ে এখানকার পণ্যে তার বেচা-কেনার অধিকার আছে; কিন্তু জমিতে নয়। জমিতে এখনও জল আর জঙ্গলের রাজত্ব। মাঝে মাঝে দু-চারখানা দরিদ্রের কুটির আর সাদায় কালোয় মেশানো কিছু মানুষের আনাগোনা। ফিস্‌ফাস্। আজকের সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে সেদিনের কোলকাতার।

হয়ত বা ছুটির দিনের সন্ধ্যা বলেই। নয়ত আড়াই শো বছ পর কোলকাতার কোন নাগরিকের চোখে এতো স্পষ্ট হয়ে উঠত না এ মিলটুকু। আগামী কালের সকালের কোলকাতাকে আমি জানি। জানি, দুপুরের ডালহৌসিকে। আর তা জানি বলেই যেন—বার বার মনে হচ্ছিল আজ—এ কেমন করে সম্ভব? কেমন করে তিনশ' বছরেরও কম সময়ে সম্ভব হলো এ পরিবর্তন? কোন্ ময়দানবের যাদু এই শহর?

আমার সামনেই, মাত্র তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে চার্নক সাহেবের কবর। সুন্দর একখানি সমাধিমন্দির বুকে ধরে আছে তাঁর স্মৃতি। শুধু তাঁর নয়, আত্মীয়-পরিজন বন্ধু এবং আরও জনাকয় উত্তরপথিক একই শয্যায় শায়িত রয়েছেন এখানে। শোনা যায়, কোলকাতার প্রাচীনতম মনুষ্যকীর্তি এটি। এরই সামনে দাঁড়িয়ে মূর্খ ছাত্রের মতো ইতিহাসের এতো দিনের সব পড়া

বেমালুম ভুলে গিয়েই ভাবছিলাম আমি কে,—এই আজব নগরী কার কীর্তি ?

আবার তাকালাম সেণ্ট জন গীর্জার দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট থামের আড়ালে হারিয়ে গেছে সুতানটী গোবিন্দপুরের মাটির সন্তানেরা। শুধু তাদের গুঞ্জনটাই কানে আসছে এখনও। আর আসছে মাঝে মাঝে খুন্তির খুট্ খুট্ শব্দ। ওদের দেখা যায় না।

অথচ আশ্চর্য, নতুন রং লাগানো সমাধিটা কিন্তু এখনও রীতিমত উজ্জ্বল। আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যায় মাঝে মাঝে উঁকি মেরে আছে সেই সাবেকী ইঁট। যেন দাঁত বের করে হাসছে।

তা হাসতে পারেন। ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন লিখে গেছেন: তিনি হাসতেন। চার্নক গলা ফাটিয়ে বীভৎস হাসি হাসতেন। নেটিভদের তাঁর খাবার ঘরের কাছাকাছি বেঁধে পিটিয়ে এসে তবে হাত দিতেন তাঁর ডিনারের থালায়। যেন খেতে খেতে শুনতে পান ওদের গলা-ফাটানো কান্না। হ্যামিলটন তাঁর এ শখের কারণটি খুলে বলেন নি। ওমরে লিখেছেন—নেটিভদের দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে হয়েই এমনি একটা প্রতিশোধস্পৃহা জেগেছিল তাঁর মনে। কথাটা ঠিক হলো কিনা জানিনা, তবে মোগলদের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ যে ভোগ করতে হয়েছে চার্নক সাহেবকে এটা ঠিক। হুগলীতে কোম্পানীর কুঠিয়াল থাকা কালে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল একবার। এমন কি, হুগলীর প্রকাশ্য রাস্তায় এমন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে যা-তা করে অপমানিত করতেও কসুর করেনি এদেশীয় শাসকবর্গ। অবশ্য এসবের কারণও ছিল, চার্নক সাহেবের সনাতন নেটিভবিদ্বেষ। অবশেষে জন্মের মতো হুগলী ছেড়ে দিয়ে তবে নিস্তার পেলেন বেচারা। দলবল নিয়ে চলে এলেন সাতাশ মাইল দক্ষিণে,—এই সুতানটীতে। আশ্রয় স্থায়ী হলো না। উঠে এলেন উলুবেড়েতে। উলুবেড়ে কথাটার

মানে নাকি পেচকের রাজ্য। স্বভাবতই ব্যবসায়ের পক্ষে মোটেই প্রশস্ত স্থান নয়। চার্নক আবার এলেন সুতানটী। কিন্তু মোগল কর্মচারীরা তাঁর ওপর খড়্গহস্ত। তারা এবারও পথে দাঁড় করালেন তাঁকে। আর নয়, বাংলা মুল্লুকে আর থাকা নয়। চার্নক এবার ধরলেন সোজা মাদ্রাজের পথ। ইতিমধ্যে বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁর চেষ্টায় ইংরেজদের মোটামুটি একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেল বাদশা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে। চার্নকের ডাক পড়লো আবার সুতানটীতে। এ ডাকে আশ্বাস ছিল। চার্নক ফিরলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট চূড়ান্তভাবে তাঁর নৌকো ভিড়ল এসে হুগলীর তটে। বাদশা হুকুম দিলেন : শুল্ক চাইনা, তবে বছরে তিন হাজার টাকা সেলামী দেবে। ব্যবসা কর। তৈরী হলো ফ্যাক্টরী। পত্তন হলো কোলকাতার।

মাত্র দু'বছর বাস করেছেন জব চার্নক এখানে। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ম্যালেরিয়া কেড়ে নিয়ে গেলো তাঁকে। দু' বছরে কোলকাতা শহর হয়নি। এমন কি সুতানটীতে দুটো পাকা বাড়ীও করে যেতে পারেন নি তিনি। তবুও কোলকাতা চার্নকের শহর। কারণ কোলকাতা ইংরেজের শহর। ইংরেজের রাজধানী। চার্নক এখানকার মাটিতে প্রথম ইংরেজ পুরুষ। সুতরাং এ নগরীর প্রতিষ্ঠাগৌরব তাঁরই প্রাপ্য।

এ গৌরব নিয়ে বিবাদ করা অসৌজন্য। কোলকাতার জন্ম হলো। ইংরেজের ঔরসে বাংলা দেশের গর্ভে ভ্রূণ দেখা দিল এ শহরের। চার্নক বিদায় নিলেন, বিদায় নিলেন তাঁর জামাতা— চার্লস আয়ার। ক্রমে হ্যামিলটন প্রভৃতি। কিন্তু এগিয়ে চললো কোলকাতা। সারা বাংলাদেশের রক্তে পুষ্ট হয়ে একদিন ভূমিষ্ঠ হলো শিশু-নগরী। নানা সন্দেহ দেখা দিল তাকে ঘিরে। সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রশ্ন মুখর হয়ে উঠলো দেশে বিদেশে। চার্নকের পরবর্তী সাহেবদের অন্তত শতকরা পঞ্চাশজনই নাকচ করে দিয়ে

গেছেন হুগলীর এই তীরটিকে। 'নদীর ধারে এর চেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গা আর নেই।”—কোলকাতার অবস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করে গেছেন হ্যামিলটন। এটকিনসন্ নামে জনৈক কবিও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

*   *   *   *

সত্যিই তো, আজকের আলো-ঝলমল নগরীর অন্ধকার ছাড়া কি সম্বল ছিল তখন আর? অরণ্যের অন্ধকার, দারিদ্রের অন্ধকার, অসভ্যতার অন্ধকার! ম্যালেরিয়া, রক্ত-আমাশয়, বাঘ-ডাকাত এবং নেটিভে মিলে অরণ্যপুরী কোলকাতাকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন সেকালের বিলাতী সিবিলিয়ানরা। কোলকাতার নামে গায়ে জ্বর আসতো পশ্চিমী সিপাহীদের। রুটির লোভে কোলকাতায় আসার চেয়ে দেশে বসে 'মৌহা' খাওয়াও অভিপ্রেত ছিল তাদের কাছে। 'জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা কথা; এই তিন নিয়ে কলিকাতা' —সুতরাং কোলকাতাকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা। ধর্মপরায়ণ শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান বাঙালীর আতঙ্ক ছিল অষ্টদশ শতকের কোলকাতা। কোলকাতার 'বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া বুলবুলির লড়াই দেখিয়া সেতার এস্রাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি ফুল্-আখড়াই হাফ্-আখড়াই প্রভৃতি শুনিয়া,— রাত্রিকালে বারাঙ্গনাদিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটায়।' কোলকাতা বাংলা দেশের লজ্জা। সুতানটী গোবিন্দপুরের ভূতপূর্ব জেলে চাষীরা এখানে পরমানন্দে দাসত্ব করে। ঢাকা ময়মনসিংহ কিংবা মেদিনীপুরের স্বাধীন চাষাভূষার অপমান কোলকাতা; শুধু তাই নয়, বন পরিষ্কার হয়ে হয়ে বিপুল জনবসতি গড়ে উঠলো যেদিন, ঘরে ঘরে জ্বললো গ্যাসের আলো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়ালো শান্তিরক্ষার্থ পুলিস— অচলা হয়ে বসলেন নগরলক্ষ্মী—সেদিনও অবশিষ্ট বাংলাদেশের একটা বৃহৎ অংশের কাছে কোলকাতা অরণ্যের সামিল। এখানে

গঙ্গার ঘাটে ঘাটে শান্তিতে সতীদাহ চলে না, তদুপরি এখানে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে বাঙালী ছোকরারা তর্ক করে। তারা হোটেলে খায়, কোট প্যাণ্ট পরে, ডাক্তারী বিদ্যার নামে মড়া কাটে। তদুপরি নিয়মিত স্কুলে গতায়াত করে। এখানে ধর্ম বাঁচে না, কুল রক্ষা করা চলে না।

'খানাকুলের বামুন একটা করেছে ইস্কুল
জাতের দফা হলো রফা থাকবে নাক' কুল।'

ছেলেরা আর তর্কালঙ্কার মশাইয়ের কাছে ঘেঁষে না, "ফিরিঙ্গীপুঙ্গব শ্রীমদ ডিরোজিও"র পেছনে পেছনে ঘোরে। কোলকাতা অরণ্য নয়তো কি!

তবুও অসামাজিক শহর কোলকাতা অনাদরের শৈশব, অবহেলার কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিল একদিন। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইঙ্গবঙ্গ, রাজা এবং প্রজা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আগলে রইলো যৌবনবতী শহরকে। না থেকে উপায় নেই। কোলকাতা—যাত্নর শহর নয়, কোলকাতা চার্নকের কীর্তিও নয়, কোলকাতা বাংলাদেশের। প্রচলিত রীতি মেনে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী হয়ত আইনসঙ্গত জন্ম এর হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলা-দেশ গর্ভে ধারণ করেছে একে। নিজ রক্ত দিয়ে তিল তিল করে পুষ্টিসাধন করেছে শিশু শহরের। প্রকাশ্যে স্নেহ হয়ত দিতে পারেনি লজ্জিতা মাতা, কিন্তু অস্বীকারও করতে পারেনি রক্তের সম্পর্ক। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হলেও স্বাভাবিক জন্ম এ শহরের। তাই সারা বাংলার চোখের সামনেই প্রকৃতির নিয়মে যৌবন এলো কোলকাতার। অঙ্গে অঙ্গে তার যুগলক্ষণ।

এলো ঊনবিংশ শতক। রেল এলো, কল এলো, ধানভানার কল, কাপড়ের কল, ছাপার কল। বসলো ছাপাখানা, স্কুল, কলেজ। অবশেষে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তদুপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কোলকাতাকে অস্বীকার করার শক্তি আর রইলো না

বাংলাদেশের। পাণিনিচর্চা ছেড়ে ভাটপাড়া-বিক্রমপুরের পণ্ডিত-তনয়েরা মুখস্ত করতে বসলেন—

গড্ ঈশ্বর, লাড্ ঈশ্বর,—কাম মানে এস
ফাদার বাপ, মাদার মা,—সিট মানে বস।

নাকে চশমা ঝুলিয়ে ছাপার হরফে 'সমাচার দর্শন' পড়তে বসলেন বিষ্ণুপুর-চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতিরা। সমাচার চাই, কোলকাতা সমাচার, কোলকাতার সংবাদ। "আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংলণ্ড দেশ হইতে বাষ্পের জাহাজ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে।—এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে…" ইত্যাদি। প্রতিদিন নতুন সংবাদ। নতুন বার্তা। যুগান্তরের বার্তা। অতএব—

ধন্য কলিকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি…

বলে আত্মসমর্পণ করলো বাংলাদেশ, কোলকাতার কাছে। উনিশ শতকের কোলকাতা মশালচী হলো সারা ভারতবর্ষের। এই মশালের উজ্জ্বল আলো পতঙ্গের মতো টেনে এনেছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে জ্ঞানান্বিষ্ট, জীবিকাসন্ধানী মানুষকে। আজও আনছে। কোলকাতা আজও বর্ধিষ্ণু।

এই ক্রমবর্ধিষ্ণু শহরের বিপুল আয়তনে বিকটতর উল্লাসে আজ ক্রমে বিস্মৃত হতে চলেছে গতকল্যের কাহিনী। তথাকথিত ইতিহাসের কথা বলছি না। কোলকাতার নামে তার কমতি নেই। কিন্তু সে ইতিহাস গৌরবের, বিজয়ের। অন্যথায় হাজার হাজার মানুষের স্মৃতি-বিস্মৃতি, ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখের কাহিনী আজ, বলতে গেলে, মাটি চাপা পড়ে আছে আমাদের মনে। অথচ তারাও ভালো বেসেছিল এ শহরকে। এ শহরের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়েছিল তারাও। তাদের সেই বিচিত্র জীবনকথা—

আসল কোলকাতা-কথা। তাদের আজব জীবন, আজব জীবিকা, আজব ধ্যান-ধারণাই এ শহরকে দিয়েছিল আজব চরিত্র।

আজব নগরীর সেই আজব মানুষকেই তাই আমি সন্ধান করেছি কোলকাতার পথে পথে। আজকের কোলকাতার নয়, অষ্টাদশ শতকের কোলকাতার। সেই সন্ধানে স্বভাবতই আমি এড়িয়ে গেছি বড় ঘটনা, এড়িয়ে গেছি বড় মানুষদেরও। আমার কাহিনী তাই ক্লাইভকে বাদ দিয়ে, সিরাজউদ্দৌলাকে পাশ কাটিয়ে। নন্দকুমারের ফাঁসির চেয়ে বেশী টেনেছে আমায় ব্রিজমোহন। বেচারা ২৫৲ টাকা দামের একটা ঘড়ির বদলে দিতে বাধ্য হয়েছিল তার প্রাণ। এমনি তৃতীয় শ্রেণীর সব নায়ক নায়িকা আমার। এমনি আটপৌরে আমার ইতিকথা।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, কাহিনীগুলো ইতিকথা বলেই আজব কথা আমার কাছে। বিশুদ্ধ গল্পকথা হলে এমন আজগুবী গল্প বলার বিন্দুমাত্র সাধ হতো না আমার।

॥ কোলকাতার পিতামহ ॥

আর্মেনিয়ান স্ট্রীট আর আরমানি গীর্জা। কোলকাতার ভূবৃত্তান্তে এদের উল্লেখ আছে। মিথ্যে বলব না, রাস্তাটির না হলেও গীর্জাটির জন্যে কিঞ্চিৎ স্থানও বরাদ্দ আছে কোলকাতার ইতিহাসে। কারণ আরমানি গীর্জা কোলকাতার প্রাচীনতম গীর্জা। প্রথমত গীর্জা, দ্বিতীয়ত বয়ঃপ্রবীণ। সুতরাং এই সৌজন্যটুকু একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু ব্যস্, এখানেই ইতি। অতঃপর কোলকাতার সব আজব কাহিনীর নায়ক ইংরেজ। কোলকাতার ইতিহাস ইংরেজের ইতিকথা। তাদের শৌর্য, বীর্য, বুদ্ধি, মেধা ইত্যাদির কাহিনী। সে কাহিনীতে মুরদের মতো, ফিরিঙ্গীদের মতো আরমেনিয়ানরাও অপাংক্তেয়। অথচ কোলকাতা-কারিগরদের সারি করে বসালে আরমেনিয়ানরা এসে পড়ে একেবারে প্রথম সারিতে।

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি চার্নক সাহেব কোলকাতার জনক। এমন কি গতকাল অবধিও তাই বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আজ এই আরমানি গীর্জার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে মনে হলো— চার্নক কিংবা ইংরেজরা যদি পিতা হন কোলকাতার, তবে আর্মেনিয়ানরা পিতামহ। আমার গাইড আমাকে এনে দাঁড় করালেন একটা কবরের সামনে। আরমানি ভাষায় তার উপরে লেখা কি কতকগুলো হিজিবিজি কথা। ইংরেজী করে বলে গেলেন তিনি ঃ দানশীল সুকিয়া সাহেবের স্ত্রী এখানে কবরস্থ হয়েছেন ১৬৩০ সালের ২১শে জুলাই।

অর্থাৎ জব চার্নকের কোলকাতার মাটিতে পা দেওয়ার ত্রিশ বছর আগে এখানকার মাটিতে দেহরক্ষা করেছেন জনৈকা আরমানি

শিল্পী। তথ্যটা বড় নতুন ঠেকলো আমার কাছে। সুতানটীতে এর আগেও মানুষ ছিল আমি জানি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'বেনিয়ার বালা' চিৎপুর কলিকাতা কালীঘাট হয়ে তবে গিয়েছিলেন পূবমুখো। কিন্তু তাই বলে সুদূর আরমেনিয়ার মানুষ? অবশ্য শুনেছি, ইউরোপীয়ানদের বহু আগে থেকে আরমেনিয়ানদের গতায়াত ছিল এ দেশে। তারা এ দেশে স্থলপথে আফগানিস্থান, পারস্য হয়ে এসে ব্যবসা করছেন অনেক কাল। কিন্তু কোলকাতায়? সুতানটীর মতো গণ্ডগ্রামে?

উইলসন সাহেব লিখেছেন: "কোলকাতার ইতিহাসকে আরও পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার যে চেষ্টা সম্প্রতি নানাজন নানাভাবে করে চলেছেন তা একেবারে বিফল হয় নি।"

সেই প্রচেষ্টার প্রথম ফল: এই কবরটি। জনৈক আরমেনিয়ান ঐতিহাসিক আরমানি গীর্জার কবরখানায় আবিষ্কার করলেন এটি। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে গেল ইংরেজের পিতৃ-গৌরব। এখানেই শেষ হলো না। একটা বা তিনটা কবরের মূলধনে পিতামহর দাবী উপস্থিত করলেন না আর্মেনিয়ানরা। তা হলে হয়ত কিঞ্চিৎ চিতাভস্মের জোরে আমরাও চেষ্টা করতে পারতাম তা। দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে তাঁরা প্রমাণ করলেন, আরমেনিয়ানরা শুধু কোলকাতার প্রথম বিদেশাগত বাসিন্দা নয়, তারাই কোলকাতার আসল স্রষ্টিকর্তা। ইংরেজের হাত দিয়ে তারাই পত্তন করেছে এ শহর। তারাই রক্ষা করেছে এ শহরের ইংরেজকে। তারা না থাকলে কোলকাতা হয় না, তাদের বাদ দিলে কোলকাতার ইংরেজদের চলে না। অথচ ইংরেজরা ইতিহাসে বেমালুম বাদ দিয়ে বসে আছে তাদের। কথাটা ঠিক বুঝতে হলে ইতিহাসটাকেও দেখতে হয় একটু।

১৬৯০ সাল। চার্নক কোলকাতায় নেমেছেন। গাছতলায় বসে হুঁকো খাওয়া চলে, কিন্তু ব্যবসা করতে হলে ফ্যাক্টরী চাই,

গুদোম চাই। আবার এসব বাঁচাতে হলে চাই দুর্গ। কিন্তু দেবে কে? তার জন্যে মোগল বাদশাহদের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু তারা বর্তমানে ইংরেজদের উপর যারপরনাই খাপ্পা। শুল্ক দিয়ে ব্যবসায়ের অনুমতি দিলেও ফ্যাক্টরী বা দুর্গ করার অনুমতি দেবেন কিনা কে জানে! দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে বেচারা চার্নককে তাই তাঁর জীবন কাটিয়ে যেতে হলো তাঁবু কুঁড়েঘর আর নৌকাতেই।

তারপরেও বেশ কিছুদিন চলে গেছে। কোনমতেই গোছগাছ করে বসতে পারছে না ইংরেজরা। মনে তাদের ভয়ানক দুশ্চিন্তা। এমন সময় (১৬৯৬ সালে) বিদ্রোহী হলো শোভা সিং। ওরা ভাবলে বুঝি শাপে বর হলো। জবরদস্ত খাঁ এলেন তাকে দমন করতে। ইংরেজরা স্থির করলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখা যাক। জবরদস্ত খাঁর কাছে যেতে হলে জবরদস্ত লোক চাই। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল না। অবশেষে ইংরেজরা শরণাপন্ন হলো একজন আর্মেনিয়ানের। তাঁর পুরো নাম—খোজা ইসরায়েল সারহেদ। সারহেদ ছিলেন হুগলীর একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং সুরাটের বিখ্যাত ফানুস কালান্দরের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাকার সঙ্গে একবার বিলেত ভ্রমণেরও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। যা হোক, ইংরেজরা সারহেদকে ধরলে। সুতানটী ডাইরীতে ১৬৯৭ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসের বিবরণীতে এই ধরাধরির বিস্তারিত খবর আছে।

ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেবের নাতি আজীম ওসমান এলেন বাংলার সুবেদার হয়ে। আবার ইংরেজরা বসে বসে দরখাস্ত লিখলে। ওসমান সমীপে সে দরখাস্ত বয়ে নিয়ে গেলেন এবারও সারহেদ। আকবরের কাল থেকে দরবারে আর্মেনিয়ানদের খাতির। সারহেদও খাতির পেলেন তাঁর কাছে। বরং অতিরিক্ত হৃদ্যতা

হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে আজীম ওসমানের। তার কারণ সম্পর্কে শোনা যায়—ওসমানের আগেই তাঁর পুত্রের মনোজয় করে ফেলেছিলেন বিচক্ষণ সারহেদ। সারহেদ বিলাসী ওসমানের জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন নানা উপহার, সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর পুত্রের জন্য কিছু খেলনা। ওসমানপুত্র ফারুখ সিওর তখন চৌদ্দ বছরের কিশোর। খেলনা পেয়ে সে মহাখুশী। পিতাও তাই। সারহেদ দিনরাত্রি কিশোরের সঙ্গে খেলনা নিয়ে মত্ত। সে খেলায় যোগ দিলেন ওসমানও। খেলতে খেলতে ওসমান এক সময় মঞ্জুর করে দিলেন তাঁর আর্জি। সেই আর্জি বলে ইংরেজরা অধিকার পেলো তিনখানা গাঁয়ের। সুতানটী, গোবিন্দপুর আর কোলকাতা। এ গাঁ তিনখানা তাঁরা দরকার হলে কিনে নিতে পারেন দেশী জমিদারদের থেকে। ১৬৯৮ খৃঃ ১০ই নভেম্বরে ১,৩০০৲ টাকায় তা কেনা হয়ে গেলো। ইংরেজরা জমিদারী পেলো কোলকাতার। বার্ষিক খাজনা ১,১৯৫৲ টাকা। পত্তন হলো কোলকাতা মহানগরীর। শুরু হলো ইংরেজের অভিযাত্রা। সারহেদ না থাকলে তা হতো কি?

দিন এগিয়ে চললো। কিন্তু বিপদেরও যেন আর শেষ নেই। দিল্লীর বাদশার খাতির পেলেও ইংরেজরা এদিকে ক্রমেই চক্ষুশূল হয়ে উঠল বাংলার নবাব জাফর খাঁর কাছে। জাফর খাঁ তাদের আগেকার যাবতীয় অধিকার নাকচ করে দিতে চান। এর একটা বিহিত বিধান আবশ্যক। স্থির হলো আবার দরবারে লোক পাঠাতে হবে। লোকজনও ঠিক হলো। জন সারমন, খোজা সারহেদ, জন প্রেট এবং এডোয়ার্ড স্টিফেন—এ চারজন যাবেন দিল্লীতে দূত হিসাবে। যেতে যেতে সময় লাগবে, ব্যবস্থাদিও করতে হবে। ইতিমধ্যে যদি কোন নতুন বিপদ এসে যায়!

—'কোন বিপদ আসবে না।' দিল্লী থেকে কোম্পানী

বাহাদুরকে জানালেন আর এক আর্মেনিয়ান। তিনি খোজা মান্নুর। মান্নুর ছিলেন ঔরঙ্গজেবের দুহিতা বাদিসাহা বেগমের অনুচর। তিনি সম্রাটকে বলে কয়ে এক হুকুমনামা জারী করালেন। তাতে তাঁর দেওয়া ফরমানকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হলো সমস্ত সুবাদার এবং বাদশাহের অন্যান্য কর্মচারীদের। তাদেরকে এও বলে দেওয়া হলো, কোলকাতা থেকে সারহেদ এবং অন্যান্য ইংরেজ দূতরা যেন উপহার সমেত নিরাপদে দিল্লী পৌঁছাতে পারেন।

দূতবাহিনী চললো দিল্লী। সারহেদ তাঁদের একজন। পদমর্যাদায় তিনি দ্বিতীয়। ইংরেজ না হওয়া সত্ত্বেও কেন নেওয়া হলো তাঁকে এ দলে, তার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "দরবারে সারহেদের প্রভাবের ফলেই ইতিপুর্বে আমরা নানা খাতির লাভে সমর্থ হয়েছি। সুতরাং তাঁকে দূতবাহিনীর একজন পুরো সদস্য হিসেবেই নেওয়া স্থির হলো।"

কাউন্সিলের মতে খোজার সমর্থনে অন্যান্য কারণগুলো হলো— (১) সারহেদ সম্রাট ফারুখ সিওরের বাল্যবন্ধু (২) তিনি উত্তমরূপে এতদ্দেশীয় ভাষা জানেন এবং তৃতীয়ত তাঁকে যদি দূত-বাহিনীর সদস্য না করে উকিল হিসেবে পাঠানো যায় তা হলে ইংরেজের মর্যাদা সম্রাটের চোখে কমে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কারণ তখন সারহেদকেই বেশী সম্মান দেবেন সম্রাট। সুতরাং সারহেদও কোম্পানীর দূত হয়েই চললেন দিল্লী।

সেই দৌত্যকাহিনী সর্বজনবিদিত। ইংরেজের উদ্দেশ্য বিফল হলো না। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মহামান্য ফারুখ সিওয়ের কাছ থেকে ইংরেজরা লাভ করল বহু-অভিপ্রেত ফরমান। এতে ফারুখ সিওর ইংরেজদের পূর্বেকার সমস্ত অধিকার তো স্বীকার করে নিলেনই, সেই সঙ্গে কোম্পানীকে নতুন করে অধিকার দিলেন হুগলী নদীর দু'পাশে দশ মাইল পর্যন্ত ৩৮ খানা গ্রাম কিনে নেবার। অর্থাৎ

প্রায় গোটা ২৪ পরগণার জমিদারী পেয়ে গেল ইংরেজরা। গড়ে ওঠলো বাংলায় ভবিষ্যৎ ইংরেজ রাজত্বের চিরস্থায়ী ভিত। হু হু করে বেড়ে চললো ইংরেজ-অধীন কোলকাতা। স্টুয়ার্ট লিখেছেন: "দূতবাহিনী ফিরে আসার পর কোলকাতাবাসীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। মোগল রাজত্বের কোন সময়ে যা ছিল না সেই স্বাধীনতা আর নিরাপত্তা দুই-ই পেলেন তাঁরা। ফলে ক্রমে ক্রমেই ধনেজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো কোলকাতা।"

কোলকাতা তথা বাংলার ইতিহাসে এই ফরমান যারপরনাই মূল্যবান জিনিস।

সারমন-দৌত্যের এই সাফল্যের জয়মাল্য চিরকাল ঐতিহাসিকেরা দিয়ে আসছেন ডাঃ হ্যামিলটনের গলায়। হ্যামিলটন ছিলেন ডাক্তার। দূতদের সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবেই তিনি গিয়েছিলেন দিল্লী। কথিত হয়ে থাকে—সেখানে তিনিই নাকি বাদশার ব্যামো আরাম করে পারিতোষিক হিসেবে লাভ করেছিলেন ফরমানটি। সেন্ট জন চার্চে হ্যামিলটনের সমাধিতেও দেখেছি ক্ল্যাসিক্যাল ইংরেজীতে লেখা রয়েছে সে কথা। কিন্তু কোথায়ও দেখা যায়নি সারহেদকে। কিন্তু এটা বলা অনাবশ্যক যে, তাতে গৌণ হয়ে যায় না ঐ দৌত্যে সারহেদের ভূমিকা।

প্রথম ছিল নিরাপত্তার প্রশ্ন। সে প্রশ্ন মিটিয়ে দিয়ে গেলেন সারহেদ জবরদস্ত খাঁর সঙ্গে দরবার করে। তাঁর খাতিরেই কোলকাতার বুকে তৈরী হলো ইংরেজের দুর্গ। ফ্যাক্টরী হলো, দুর্গ হলো। তারপর শোয়া-বসার জায়গা। সারহেদের খাতিরে আজিম ওসমান তাও দিলেন ইংরেজদের। আর এবার বলতে গেলে রাজত্বই এসে গেলো হাতে। সারহেদের আগেকার ভূমিকা এবং দূত-বাহিনীতে তাঁর নিয়োগ থেকেই অনুমান করা যায়—এ ব্যাপারেও তাঁর হাত ছিল। তাই খোজা সারহেদকে আমি বলি—কোলকাতার পিতামহ।

যাহোক কোলকাতার আরমেনিয়ানদের কথা এখানেই শেষ নয়। কারণ কোলকাতার আসল কাহিনীর এখানে শুরু মাত্র। কোলকাতার তখনও কৈশোর চলেছে। ১৭৫৭ সনের কথা। সহসা এলো ঝড়। মহা বিপর্যয়। সিরাজদ্দৌলা আক্রমণ করলেন কোলকাতা। ইংরেজের নবনগরী ভেঙে পড়লো খান খান হয়ে। খড়ের মতো এক ঝটকায় উড়ে গেলো দুর্গ। ড্রেকের নেতৃত্বে প্রাণ-রক্ষার্থে শহরের ইংরেজ নর-নারী আশ্রয় নিলেন ফলতায়। কোলকাতা হলো আলিনগর। ফলতা ইংরেজ-রিফিউজি ক্যাম্প। নবাবের আদেশে বন্ধ হয়ে গেল সেখানকার খাদ্য সরবরাহ। ফলতার বাজারে কেউ পথ মাড়ায় না। না খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর মুখের দিকে এগিয়ে চললো সাহেবরা। তাদের কোন বান্ধব নেই এ বিপদে। তাদের সাহায্য করবার জন্যে তখন বেঁচে নেই খোজা সারহেদ। কিন্তু ছিল অন্য আরমেনিয়ানরা। রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি তাদেরই একজন এগিয়ে গেল কোলকাতা থেকে ফলতার দিকে। দরজায় টোকা পড়লো, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দরজায়:—এই নাও খাদ্য। আনন্দে জড়িয়ে ধরলো তারা এই অপরিচিত বান্ধবকে।

—কে তুমি ?

—আমি খোজা পেট্রাস আরাটুন। কোলকাতার আরমানি ব্যবসায়ী। মুখে মুখে রটে গেল পেট্রাসের কথা। পেট্রাস ওমিচাঁদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করলেন। চিঠি লিখলেন মাণিকচাঁদের কাছে। যোগাযোগ করলেন জগৎশেঠের সঙ্গে। আরব্য উপন্যাসের নায়কের মতো অসমসাহসে তিনি ক্লাইভ আর ওয়াটসন এসে পৌঁছানো অবধি ফলতার উদ্বাস্তুদের বাঁচিয়ে রাখলেন।

এ জন্যে যে-সব অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজ জীবন বিপন্ন করে চলতে হয়েছে তাঁকে, তা রীতিমত রোমাঞ্চকর। পড়তে

পড়তে মনে হয় এ উপকারের মূল্য ইতিহাসের তু'চার ছত্রে শোধবার নয়। তুঃখের বিষয়, ইংরেজরা সেটুকু চেষ্টাও করেনি।

ক্লাইভ, ওয়াটসন এলেন। কোলকাতার পুনরুদ্ধার হলো। কিন্তু পেট্রাসের ছুটি হলো না। অন্তরঙ্গ মিত্র হিসাবে ক্লাইভ ধরে রাখলেন তাঁকে। পেট্রাসের মাধ্যমে গোপনে মীরজাফরের সঙ্গে সলা-পরামর্শ শুরু হলো, সিরাজদ্দৌলাকে সরাবার। পেট্রাস হলেন ক্লাইভের গুপ্তচর। এই ষড়যন্ত্রের পরিণতি সকলের জানা। তারপর যখন ইংরেজদের দরকার হলো মীরজাফরকে সরাবার, পেট্রাস তখনও বন্ধু। অবশেষে মীরকাশেমকে ঘায়েল করার ব্যাপারেও নিযুক্ত হলেন পেট্রাস। তাও সম্পন্ন হলো। সমাধা হলো বঙ্গে 'বিপ্লব'। ব্যস্, এখানে এসেই শেষ হয়ে গেলো পেট্রাসের খাতির।

এবার শুরু হলো পেট্রাসকে নিয়ে দরবার। তু'চারজন ছাড়া সকলেই একবাক্যে রায় দিয়ে বসলেন—লোকটি কখনও ইংরেজের মিত্র নয়, আসলে নবাবের গুপ্তচর। ওকে ফাঁসি দেওয়া হোক্, কয়েদ করা হোক, তাড়িয়ে দেওয়া হোক,—ইত্যাদি ইত্যাদি। অতি তুঃখে পেট্রাস চিঠি লিখলেন কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে। দীর্ঘ চিঠি। কোম্পানির জন্যে তিনি শুরু থেকে কি কি করেছেন, এবং এজন্যে কত বিপদের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তাঁকে তা বিস্তারিত লিখে তিনি উপসংহারে লিখলেন ঃ

"যদিও আপনাদের চরমতম বিপর্যয়ের মুহূর্তে আমি নিজের জীবন বিপদাপন্ন করে এমনভাবে দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়িয়েছি, এবং যদিও বলতে গেলে বর্তমানের এই সুখকর পরিণতির জন্যে আমিই প্রধানত দায়ী তবুও আমার এমনি কপাল যে আপনারা একবার উল্লেখও করলেন না এই হতভাগার কথা।"

এ চিঠির উত্তর আজও মেলেনি। এবং এ চিঠিখানাও নেই কোন ইংরেজের ইতিহাসে। এটি সেই আরমানি গবেষকই বহু কষ্টে আবিষ্কার করেছিলেন।

॥ ফাঁসির ফ্যান্সি ॥

রাস্তাঘাটের নাম বদল কোলকাতার ইতিহাসে বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। রাণী মুদি লেন নাম নিয়েছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, রসপাগল রোড—রসা রোড, প্রিয় খানসামা লেন—টারবুলস্ লেন, ক্লাইভ স্ট্রীট—নেতাজী সুভাষ রোড। এমনি আরও কত!

বলা বাহুল্য এই নাম-বদলে রাস্তার নাম-কৌলীন্য হয়ত কোথায়ও কোথায়ও বৃদ্ধি পায় কিছু কিছু, কিন্তু বেচারা রাস্তার ক্ষতি বৃদ্ধি বিশেষ কিছুই হয় না তাতে। রাস্তা রাস্তাই থেকে যায়—নতুন নামটি নাম-ই।

কিন্তু আমার আজকের পথটি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বেচারা আজ নিজেও ভুলে গেছে তার নামের অর্থ। অথচ একদিন শোনবার মতোই অর্থ ছিল তার।

আচ্ছা যদি বলি—'ফ্যান্সি'—। অনেকেই হয়ত মনে মনে ভাবছেন—চিনি, বেশ চিনি, কোথায় যেন দেখেছি—। দেখেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি বলছি 'ফ্যান্সি' (fancy) মানে কি জানেন? সবাই জানে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রও জানে। সাহেব মেমের নাম যদি না হয়—তবে ফ্যান্সি কথাটার মানে সবাই জানে। যদি বলি—ফ্যান্সি লেন। সবাই হয়ত বলবেন—'আহা, কি সুন্দর নাম! এ নাম লণ্ডন প্যারিতে মানায়—কোলকাতার গলিপথের এ নাম শোভা পায় না।'—তাই না?

কিন্তু যদি বলি—ফ্যান্সি মানে—ফাঁসি। অর্থাৎ গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া, তারপর ক্রমে শ্বাসরোধ এবং অবশেষে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি? তাহলে নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন আপনি। এবং

নিশ্চয়ই তখন এই শ্রুতিমধুর নামটির প্রতি আর বিন্দুমাত্র ফ্যান্সি থাকবে না আপনার। হয়ত বা তাড়াতাড়ি অফিস ফেরার ট্রাম ধরতে গিয়ে কোণাকোণি পথের সন্ধানে আর কোনদিন পা বাড়াবেন না এই গলিতে।

অবশ্য স্বেচ্ছায় কেউ বাড়াতো না। কারণ এখানে পা বাড়ানো মানেই ছিল মৃত্যু। অথচ আমার আপনার মতো অন্য পথও ছিল না বেচারাদের সামনে যে, এ পথ এড়িয়ে চলবে তারা। ফলে তাদের স্ত্রী পুত্র পরিজনের গলা-ফাটানো বিলাপ শেষ পর্যন্ত এসে থেমে যেতো এখানে। জল্লাদের হাতের দঁড়িটি ধীরে ধীরে বাক্‌রোধ করে দিত তাদের চিরদিনের জন্য। হ্যাঁ, এখানেই।—ডালহৌসির এই ফ্যান্সি লেনেই। ফ্যান্সি লেন—তখন রাস্তা নয়, ফা-ন্-সি'র জায়গা, ফাঁসিমঞ্চ।

সে অন্য যুগ। অন্য জগৎ। ফাঁসি তখন ফ্যান্সি। সাহেব সুবার ফ্যান্সি তখন গরীব লোকের ফাঁসি।

অপরাধ? অপরাধ তখন কি, আর কি নয়—বলা কঠিন আজ। বিশেষ করে কোলকাতার ব্যাপার জন্ম থেকেই আজব ব্যাপার। ১৮০০ সালের কথা। ঢেঁড়া পিঠিয়ে বেড়াচ্ছে কোম্পানীর লোক। কি, না ব্রজমোহনের ফাঁসি হবে।—'ব্রজমোহনের ফান্‌সি হব।' অপরাধ শ্রীব্রজমোহন একটা ঘড়ি চুরি করেছেন। মূল্যবান ঘড়ি। দাম ২৫৲ টাকা। সেই অপরাধে ফাঁসি হবে। হরি পাল, প্রসাদ পাল, রাজময় এবং চৈতনেরও ফাঁসি হবে। তাদের অপরাধ রাহাজানি। আর নন্দকুমারের ফাঁসি তো সর্বজনবিদিত!

কোম্পানীর তখন নয়া রাজত্ব। স্বভাবতই কড়া মেজাজ। কথায় কথায় ফাঁসি আর তুড়ম ঠোকা, নয় তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া।

ফাঁসি হবে। ব্ল্যাক টাউনের বাসিন্দারা ভয়ে তটস্থ। কোথায় হবে ফাঁসি? যা নিয়ম। অর্থাৎ প্রকাশ্য স্থানে কোন

চৌ-মাথায়। বহুলোকের সামনে। চারিদিক থেকে পিল পিল করে লোক আসছে। ফাঁসি দেখবে। আজকের ফ্যান্সি লেনে এবং পরের রাস্তা ওয়েলেসলি প্লেসে অনেক বড় বড় গাছ ছিল তখন। জনতা এসে জমায়েত হতো তার তলায়। ফাঁসি হতো সেখানেই! সেই সব গাছের ডালে। লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতো এবং কেউ কেঁদে, কেউ সাহেবদের ন্যায়-পরায়ণতা দেখে ধন্যি, ধন্যি করে ফিরে যেতো যে যার ঘরে। কিন্তু নন্দকুমারের ফাঁসি দেখে সোজা ঘরে ফেরেনি কেউ। ব্রহ্ম-হত্যার পাপ দেখে তো এমনি ফেরা যায় না। গঙ্গাস্নান করে ফিরেছিল কোলকাতার বাসিন্দারা কুলিবাজার থেকে। ফ্যান্সি লেনে ফাঁসি হয়নি তাঁর, হয়েছিল ওখানে।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন—কি কানুনে হতো এসব? উত্তরে বলতে হয়—আজব কানুনে। ইদানীংকাল অবধি যত রকমের আদালতি ব্যাপার শুনেছেন আপনি—সেই প্রাচীন এবং অর্বাচীন সব রকমের বিচারই চলতো তখন কোলকাতা শহরে। তবে কোলকাতার মত করে—কোম্পানীর কায়দায়। শুনলে তাজ্জব মনে হবে বটে—কিন্তু তখনকার কোলকাতা শহরে বিচারের কোন ত্রুটি ছিল না। পিপলস্ কোর্ট, মেয়রস কোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত, নিজামত আদালত, সুপ্রিম কোর্ট—এসব তো ছিলই, তাছাড়া আগে পিছে ছিল আরও রকমারী বিচারশালা। কোর্ট-অফ রিকোয়েস্ট বলে ছিল এক আদালত—যার নাম দিয়েছি আমি পিপল্স কোর্ট। তবে পিপলস্ মানে এই বিংশ শতকের ভাষায় ভাববেন না। জনসাধারণ নয় তারা। জনসাধারণই যদি বিচারক হবে—তবে কোম্পানীর রাজত্ব হয় কি করে! পিপলস্ মানে—সরকার নয়, সরকারের মনোনীত চব্বিশ জন ব্যক্তি। স্বভাবতঃই বিত্তবান ব্যক্তি। এঁরা কোর্ট বসাতেন প্রকাশ্য স্থানে। আজকে যেখানে লালবাজার সেখানে ছিল তাঁদের ধর্মাধিকরণ।

চব্বিশ ব্যক্তি ছাড়া—এক ব্যক্তির বিচারও চলতো তখন। কাজি মুদি ছিলেন এমনি একজন খ্যাতনামা বিচারক। বিবেচনাশীল ব্যক্তি হিসাবে সাহেব মহলে খ্যাতি ছিল তাঁর। সুতরাং দেশীয় লোকেদের মধ্যে জাতিগত কিংবা বিবাহঘটিত বিবাদ নিষ্পত্তির ভার তাঁর উপর অর্পিত হলো।

এসব ছিল নিম্ন আদালত। সাহেবদের প্রথম নিজস্ব আদালত হচ্ছে মেয়র কোর্ট। তার বিচারকদের মধ্যে থাকতেন স্বয়ং মেয়র, সাতজন খাঁটি ইংরাজ এবং বত্রিশজন দেশীয় খ্রীষ্টান। তাদের আবার প্রটেস্ট্যান্ট হওয়া চাই। তার নীচে ছিল—জমিদারের বিচার। জমিদার মানে ইংরেজ সিবিলিয়ান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো অনেক পরের ঘটনা। তাঁকে বিচারকার্যে সাহায্য করতেন ব্ল্যাক-জমিদার।—অর্থাৎ দেশী বড়লোকেরা। এসবের উপরে ছিল—কোর্ট অব আপীল বা গবর্নরের বিচার, তারও উপর কোর্ট অফ কোয়ার্টার সেসন।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভের আগে পর্যন্ত এই ছিল কোলকাতার বিচারধারা। তারপর সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলো ১৭৭৪ সালে। কিন্তু সেটিও যে কেমন মহাধর্মাধিকরণ ছিল—নন্দকুমারের ফাঁসিই তার প্রমাণ।

যাহোক্, নন্দকুমার তবুও সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিলেন। তিনি রাজা লোক। কিন্তু সাধারণ লোকের সে ক্ষমতা কোথায়? তাঁরা ব্ল্যাক জমিদারের নতুন শেখা ল-অ্যাণ্ড-অর্ডারেই ঘায়েল হয়ে বসে পড়তেন। আর উঠতেন একেবারে ফাঁসির গাছে। আপীল আদালত, লাটের আদালত ভাবতেও পারতেন না তাঁরা। আজকের মতো উকিল মোক্তার ছিলেন না। সুতরাং একবার হুকুম হয়ে গেলেই হলো। ওকালতি আরম্ভ হয় বলতে গেলে প্রায় উনিশ শতকে। কিন্তু তখনও কোলকাতার আদালতে মোকদ্দমা করার ভাগ্যবান ছিলেন অতি অল্প ক'জন। মাত্র পনর জন অ্যাটর্নি আর

ছ'জন ব্যারিস্টার ছিলেন তখন। তাঁদের সবাই সাহেব। সুতরাং গরীবের নজরানা জোগান কত কঠিন তখন। যদি জিজ্ঞেস করে কেউ—সাহেব, এটা কি হবে? অমনি ফেলতে হবে এক মোহর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন তো ফেল আরও এক মোহর। তৃতীয় তো আরও এক। যত প্রশ্ন তত মোহর।

সুতরাং সুতানটী গোবিন্দপুর কোলকাতার আসামীরা কোন প্রশ্ন করতো না। এসব প্রশ্নের খরচ জোগানোর চেয়ে তাদের পক্ষে ঢের সহজ ফাঁসি যাওয়া। অতএব মুখ বুজে বোবা হয়ে ঝুলে পড়তো তারা। কত জন ঝুলেছে আমরা জানি না। নন্দকুমার অনেক পরবর্তী কালের, তাছাড়া তিনি রাজকুমার, সুতরাং তাঁর খবরটা পেয়েছি আমরা। কিন্তু পাইনি অগণিত জেলেকুমার, তাঁতীকুমার, চাষীসন্তানের খবর।

আজকের ফ্যান্সি লেনে তা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ডালহৌসি অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন একটি গলি। রাজভবনের অতি কাছাকাছি। কিন্তু নির্জন। এ অঞ্চলে এমন জনহীন পথ কম। কর্মবহুল ওয়েলেসলি প্লেসের সঙ্গে কেমন জানি বেমানান। কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের সঙ্গে তো তুলনাই হয় না। না হওয়াই স্বাভাবিক। অফিস-বাড়ির সব পেছন পড়েছে এর দিকে—সুতরাং নির্জন হবে বৈকি।

কিন্তু এ নির্জনতা যেন একটু ভিন্ন ধরনের। ফ্যান্সি লেনে আর সে গাছ নেই আজ। দু'একটা যা আছে তা নিতান্ত অর্বাচীন। তবে হ্যাঁ, একটি গাছ আজো আছে। গবর্নর হাউসের রাস্তার দিকে ঢুকতে পতিত জায়গাটার পরের বাড়িটায়। কি একটা গাছ যেন জোর করে ভাঙা পুরনো বাড়িটার মাথায় চড়ে বসেছে। একটা চড়ুইয়ের ভারে নুয়ে পড়ে এর ডাল, সুতানটীর জোয়ান মরদদের ভার সইবে কি করে? কিন্তু এর পূর্বপুরুষ হয়ত সইত। তাদের লোপ করতে গিয়েও হয়ত থেকে গেছে এই শিকড়, বংশধর।

দিনে আর না যান না যাবেন ফ্যান্সি লেনে। কিন্তু রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে একবার উঁকি দিয়ে যাবেন—অন্তত এখানে। দেখবেন—কিছু নেই। শুধু মিটি মিটি করে জ্বলছে একটি ঝাপসা আলো। একটা গ্যাস ল্যাম্প।

কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে মনে হয়?—হাইকোর্টের চূড়া দেখা যায় ওদিকে। আপীল করতে চায় গোবিন্দপুর সুতানটীর ব্রজমোহন, হরি পালেরা? নাকি তাকিয়ে আছে এদিকে—গবর্নর হাউসের গেটের দিকে—কালো কোটপরা প্রহরীটির মাথার উপরে যেখানে জ্বলজ্বল করছে সোনালী রংয়ের এক লাইন—'সত্যমেব জয়তে'?

॥ শহরে নৌকাডুবি ॥

শহরের বুকে নৌকাডুবি। ট্রাম-বাস চলে না এ রাস্তা দিয়ে। সুতরাং ট্রাম-বাস অ্যাক্সিডেন্ট নয়। স্বভাবতই রিক্সা ঠেলারও নয়। সুতরাং নৌকাডুবিই হয়েছিল এখানে। আজব নগরীতে সে এক তাজ্জব ব্যাপার!

"এমন আতঙ্কের দৃশ্য আর কোনদিন দেখিনি আমি। এমন কি শুনিনি পর্যন্ত। যে বাড়িটায় আমি আছি, আমার বিশ্বাস সেটা কোলকাতার সবচেয়ে মজবুত বাড়ি। কিন্তু বৃষ্টি আর বাতাসের বেগ এমন তীব্র হয়েছিল সেদিন যে, প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন ছাদটা ভেঙে পড়বে আমাদের মাথায়। এমন ভয়ানক শব্দ হচ্ছিল উপরে যে, পরিবারের লোকজনকে নিয়ে অবশেষে আমাকে নেমে আসতে হলো নীচে। সেখানে আবার আশ্রয় নিয়েছেন বেচারা মিসেস ওয়াস্টেল তাঁর ছেলেপুলে নিয়ে। ঝড়ের তোড়ে তাঁর বাড়ির জানলা-দরজা সব ছিটকে বেরিয়ে গেছে দেওয়ালের গা থেকে। সকাল অবধি আমাদেরও কাটাতে হলো তাঁর সঙ্গে নীচে।

অবশেষে সকাল হলো। শহরটার দিকে তাকালে মনে হয় শত্রুপক্ষ এসে যেন বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে গেছে এর উপর। ....আমাদের সুন্দর ছায়াচ্ছন্ন রাস্তাগুলোর ছ'ধারে একটিও গাছ নেই। সব ছন্নভন্ন। গতকাল যা ছিল, আগামী কুড়ি বছরেও তেমনটি হবে না আর। নদীটি রূপ নিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের। সারা নদী ধ্বংসস্তূপে বোঝাই।"

অনুমান করতে পেরেছেন নিশ্চয়ই এ বিবরণ একালের কোন প্রত্যক্ষদর্শীর নয়। ছ'শ উনিশ বছর আগে এই কোলকাতা

থেকে লেখা একখানা চিঠি এটি। লিখেছিলেন সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য স্যার ফ্রান্সিস রাসেল। যে রাত্রির বর্ণনা দিয়েছেন স্যার ফ্রান্সিস তা কোলকাতার ইতিহাসে ভীষণতম দুর্যোগের রাত্রি। ১৭৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি এবং (মতান্তরে) তৎসহ ভূমিকম্পে কোম্পানির নয়ানগর সেদিন ফিরে এসেছিল আবার শৈশবের দশায়,—চার্নকের কোলকাতায়। সেণ্ট অ্যানের গীর্জা নেই। চিৎপুরে গোবিন্দ মিত্তিরের নবরত্ন গুঁড়িয়ে গেছে। কাঁচা পাকা বাড়ি সব সমান। বিলেতের 'জেণ্টলম্যানস ম্যাগাজিনে'র রিপোর্ট মতে কোলকাতা এবং আশেপাশে মিলে নিহত মানুষের সংখ্যা ত্রিশ হাজার, পশু-পাখী (বাঘ-গণ্ডারসহ !) অসংখ্য এবং ছোট বড় জাহাজ নৌকা ইত্যাদি—কুড়ি হাজার। পাঁচ টনের দু'খানা ইংরেজী জাহাজ নাকি ছিটকে পড়েছিল নদীর বুক থেকে দু'শ ফ্যাদম্ দূরে, এক গ্রামের ভিতরে। চল্লিশ ফুট বেড়ে গিয়েছিল সেদিন হুগলী নদীর জল।

সেদিন নিশ্চয়ই বন্যা হয়েছিল এই অঞ্চলে। চারিদিকে থৈ থৈ জল। ধানক্ষেত ডুবে গেছে। বিরাট বিরাট গাছগুলো সব কোমর জলে দাঁড়িয়ে। আর, কুড়ি হাজার নৌকা জাহাজের অন্তত দু'চারখানা নিশ্চয়ই ডুবেছিল সেদিন এখানে। হ্যাঁ,—এই আজকের ক্রিক্ রো অথবা তার কাছাকাছি কোন জায়গায়। প্রাচীন কোলকাতার ম্যাপ, অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ মানচিত্রেই জায়গাটার নাম দেওয়া আছে—'ডিঙ্গা-ভাঙা'। মৌলালি আর তালতলার কাছাকাছি জায়গাটাকে তাই বলা হতো তখন।

সত্যিই হয়ত:সেদিন মধ্যরাত্রির অন্ধকারে এই প্রায়-নির্জন মাঠ আর বনভূমির মাঝে ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জনে হারিয়ে গিয়েছিল একদল ভয়ার্ত মাঝি-মাল্লার চীৎকার। কেউ শোনেনি, কেউ সাড়া দেয়নি। কারণ আজকের মতো ঘন জনবসতি ছিল না সেদিন এখানে। ভাঙা মাস্তুল আর ছেঁড়া পালের চিহ্ন রেখে ডুবে গিয়েছিল সেই

ডিঙ্গাটি এখানে—এই ক্রিক্ রো'তে। ক্রিক্ রো তখনও রো হয়নি—ক্রিক্-ই! রাস্তা নয়,—নদীই।

—"দুর, কী যে বলেন!" শীতের দুপুরে দু'শ উনিশ বছর পরে ক্রিক্ রো'তে ক্রিকেট খেলছিল কয়টি ছেলে। তাদেরই একজন মন্তব্য করলে আমার কথা শুনে।

—"হ্যাঁ, ডিঙ্গা-ভাঙা অবশ্য শুনেছি আমাদের ছেলে বয়সেও। এ নামের তখন একটা গলিও বোধহয় ছিল ওদিকে। তবে এত বিত্তান্ত তো শুনিনিকো।" ক্রিক্ রো'র এক প্রবীণ বাসিন্দা, যাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে, মোটামুটি বিস্মিত হয়েই বললেন তিনি।

আজকের ক্রিক্ রো এত বৃত্তান্ত জানে না। এমন কি জানে না, ক্রিক্ রো'র অদ্ভুতগড়ন বাড়িগুলোর বর্তমান বাসিন্দারাও।

—"এত উঁচু কেন আপনাদের বাড়ির ভিত্, সিঁড়ি?"

—"কি জানি বাবা, বাড়িওয়ালার মর্জি!" সিঁড়ি বেয়ে বারোটার কলের জল নিয়ে উপরে উঠছিলেন এক ভদ্রমহিলা। উত্তর দিলেন তিনি। দু'শ বছর আগেও এমনি উঠতেন মেয়েরা সিঁড়ি বেয়ে, কলসী কাঁখে। তবে সে কলসীতে থাকতো—কলের নয়, নদীর জল।

কোলকাতার সে এক আশ্চর্য ভূগোল। কোথায় তখন এই ক্রিক্ রো? চাঁদপালঘাট যেখানে—ঠিক তার উত্তর দিকটায় ছিল তখন একটা মাঝারি গোছের নদী। ছোটও নয়, বড়ও নয়, মাঝারি। ঠিক রিভারও নয়, স্ট্রীম্ও নয়—সাহেবরা তাই বলতো ক্রিক্—হুগলী থেকে উঠে হেস্টিংস স্ট্রীটের মাঝ দিয়ে এসে এঁকে-বেঁকে পড়েছিল সেটি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। তারপর ক্রিক্ রো'র মাঝ দিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল ধাপার মাঠে, তখনকার লবণ হ্রদে। চার্চ লেন আর কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের কাছে এপার

ওপার করার জন্যে এর উপর সেতু ছিল দুটো। আজকের মতে ট্রাম-বাস-লরী তখন ছিল না। এই নদীটিই ছিল তখন শহরে মালপত্তর আমদানী রপ্তানীর পথ। অনেক দিন চালু ছিল এই জলপথটি। এমন কি সিরাজদ্দৌলার কোলকাতা আক্রমণকালেও। তবে তখন আধা-আধি মজে গেছে। এই মজা নদীর বুক ভরে তৈরী হয়েছে রাস্তা। সেই স্মৃতির অবশিষ্ট—এই ক্রিক্ রো আর ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

দুপুরের ক্রিক্ রো দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে ঠেকলাম সারকুলার রোডে। আবার ক্লান্ত পায়ে এ রাস্তা দিয়েই উজান বেয়ে পৌঁছলাম এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বসে পড়লাম একটা বেঞ্চিতে। আমার সামনে এলিয়ে পড়ে রয়েছে ক্রিক্ রো। প্রথম বাঁক অবধিই চোখে পড়ে এখানে বসে। মন-পবনের নাও তখন নিয়ে গেছে আমায় অনেক দূরে—সেই অতীতে। কোথায় সেখানে এই ওয়েলিংটন স্কোয়ার, এই ক্রিক্ রো!

পার্কের কোণে বসে বাদাম ভাজছিল একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে। কে বলবে—এ সেই জেলে-বউ নয়? মাছ ভাজছে নৌকোর গলুয়ে বসে। মরদেরা লগী ঠেলছে।—হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে এলো শীতের অলস দুপুরকে কাঁপিয়ে একটা গানের কলি। রেডিওতে মধ্যাহ্নের প্রোগ্রাম! আহা, ভাটিয়ালী হতো যদি একখানা! কল-কল-ছল-ছল-ছলাৎ দাঁড় টেনে চলেছে সওদাগরী পানসী। হাঁ করে তাকিয়ে আছে মেয়েটা দোতলার বারান্দায়।—কি বলছে?

—হ্যাঁগা, কোথা যাবে মাঝি?

কোন নিস্তব্ধ দুপুরে কিংবা ঝড়ের রাত্রে ক্রিক্ রো'র দোতলা একতলা যেখানেই থাকুন, আপনি কান পাতবেন—শুনতে পাবেন তখন এমনি আরো কত প্রশ্ন।

॥ ইন্দের স্মরণে ॥

ইন্দেকে দেখেছেন কেউ?—রোগা-পটকা চেহারা, কাঁদো-কাঁদো মুখ। বারো বছরের ছেলে। গেল বৃহস্পতিবার না বলে কয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। এইটুকুন একরত্তি ছেলে,—কোথায় কোন্ বেঘোরে পড়েছে কে জানে!—তবু দোহাই আপনার, ওকে দেখতে পেলেও কাউকে বলবেন না। না, কাউকে না। ওর জন্য কোন মা অনাহারে থেকে শয্যা নেয়নি, কোন দাদা ফিরে আসার খরচ ধার করে বসে নেই। কেউ ওর জন্যে কাঁদছে না। ওর কেউ নেই। কিছু নেই। শুধু বারো বছরের এক হাড্ডিসার শরীর,—আর একটি কিশোর মন।

তবে হ্যাঁ, আছে একজন। তিনি ইন্দের প্রভু, মালিক। তিনি চীনাবাজারের মিঃ রবার্ট ডানকান। ইন্দে তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। বারো বছরের ছেলে, তবু সাহস দেখেছেন? সাবাস! সাবাস ছেলে! বারো বছরের দু'টি কিশোর চোখ মেলে চীনে-বাজারের কোন বাংলোর জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ইন্দে হয়ত স্বপ্ন দেখতো, মুক্তির স্বপ্ন, খোলা আকাশের স্বপ্ন! সাহেবের জিঞ্জির তাই আর বেঁধে রাখতে পারলো না। ইন্দে স্বাধীন হয়ে গেল। আমাদেরও বহু বহু আগে এই আজব নগরীর কোন দাস-দুর্গ ভেঙে বারো বছরের ইন্দে স্বাধীন হয়ে গেল।

আজব নগরীর সবই আজব। জীবন মানুষ জনতা সব। খবরের কাগজে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ বার্তা তখনও বের হতো। তাতে একদিন বের হলো ক্রুদ্ধ ডানকান সাহেবের দু'ছত্র বিজ্ঞাপন:

"গত বৃহস্পতিবার চীনাবাজারের মিঃ রবার্ট ডানকানের বাড়ি থেকে

ইন্দে নামক বারো বৎসর বয়স্ক একটি ক্রীতদাস নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ তাহার সন্ধান দিতে পারিলে ১টি স্বর্ণ মোহর পুরস্কার দেওয়া হইবে।" ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার এক ইংরেজী কাগজে বেরুলো এই বিজ্ঞাপন। প্রতিদিন বের হতো এমনি মানুষ কেনা-বেচার বিজ্ঞাপন। কিন্তু পলায়ন কদাচিৎ। কে জানে আমাদের ইন্দেই হয়ত এ ব্যাপারে প্রথম। ইন্দে কোলকাতার দাস সমাজের প্রথম মুক্ত পুরুষ। জানি না, স্বর্ণলোভ সম্বরণ করার মত মানুষ ছিল কিনা সেদিনকার কোলকাতায়। আহা, যদি একজন লোকও বুঝতে পারতো ওর কিশোর চোখের স্বপ্নকে। তাহলে ইন্দের উত্তর-পুরুষ আজ হয়ত এই মহানগরীর কোন কেরানী, ব্যবসায়ী বা শিক্ষক কিংবা হয়ত বাংলার কোন অঞ্চলে আজ তারা কৃষক, গৃহস্থ। চিরকালের মতো তার বংশধরদের দাস-কলঙ্ক মোচন করে দিয়ে গেছে ইন্দে। আর যদি এক মোহরের বদলে কেউ তাকে ধরে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে ডানকান সাহেবের কুঠীতে? যদি তুলে দিয়ে থাকে অপেক্ষমান রক্তচক্ষু সাহেবের হাতে?—তবে?—তবে কি হয়েছে ওর ভাগ্যে ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। একে নগদ কড়ি দিয়ে কেনা গোলাম, তার ওপর পলায়নের মতো অপরাধ! প্রটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক যাই হোন, চীনাবাজারের ডানকান কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবেন না তাকে। আহা, ইন্দে যদি সত্যিই ধরা না পড়ে থাকে।

আর যদি ধরা না পড়ে থাকে সেই যুবকটিও—মেমসাহেবের খিদমদ করার চেয়ে পালিয়ে গিয়ে লাঙ্গল ঠেলাও যার কাছে ছিল অধিকতর সম্মানজনক, পরম গৌরবের জীবন। ডানকানের মতো তার মালিকও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কাগজে। অষ্টাদশ শতকের কোলকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিকে। "॥ হারাইয়াছে ॥ মেমসাহেবের সেবাযত্নে নিযুক্ত ২০।২১ বা তার কাছাকাছি বয়সের একটি ক্রীতদাস নিখোঁজ হইয়াছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ছিপছিপে লম্বা

গড়ন, চোয়াল-চওড়া, মুখে বসন্তের দাগ। সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর কেহ তাহাকে কেরাণী কিংবা অন্য কোন পদে বহাল করিবেন না। আর যদি কোন ভদ্রলোক তাহার সন্ধান পান এবং ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই বিজ্ঞাপনদাতার নিকট তাহা জ্ঞাপন করেন তবে তাঁহাকে যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করা হইবে।" দেখছেন, বোধ হয়, ছেলেটির কেরাণী হওয়ার পর্যন্ত সম্ভাবনা ছিল। হয়ত লেখাপড়া জানতো, হয়ত শুধুমাত্র গৌরবর্ণের কারণেই সে সম্ভাবনা ছিল তার। কে জানে, কেরাণী হওয়ার সাধই ওকে টেনে এনেছিল কিনা এমনি দুঃসাহসিক পথে! হয়ত আত্মগোপন করে এ সাধ মিটিয়েছিল বেচারা। হয়ত,—এমনও হতে পারে, 'কোন ভদ্রসন্তানের ক্লেশ স্বীকারের ফলে' চিরকালের মতো মিটে গিয়েছিল তার সব সাধ, সব স্বপ্ন। সমসাময়িক কালের বিবরণ শুনলে তাও যে খুবই সম্ভব এ কথা আপনিও মানবেন। সামান্য অপরাধের জন্যে দাসদের তখন, তখনকার কোলকাতায়, যে সব শাস্তি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল শুনলে বুঝতে পারবেন, কেন ইন্দের জন্যে, এই যুবকটির জন্যে আমার এত আশঙ্কা। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন: সোমত্ত মেয়েদের পর্যন্ত দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে ঝুলিয়ে অন্যান্য দাসদের সামনে পোড়া লোহা দিয়ে গায়ে দাগ কেটে দেওয়া হতো। আর মালিক যদি একটু সদাশয় কিংবা ধর্মভীরু হন তবে—ডিসেম্বরের ভোরে কুয়ো থেকে বিরতি না দিয়ে বালতি বালতি জল ঢালা হতো তার গায়ে। ১৮২৭ সালে মেরিয়া ডেভিস নামে এক ইংরেজ মহিলা তার নাসিবুন নামে এক বাঁদীকে এমনি অমানুষিক অত্যাচার করে প্রভু সোসাইটিতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

বলতে পারেন, কোলকাতার লোকের মনে কি বিন্দুমাত্র ধর্মবোধ ছিল না, ছিল না কি একটুখানি হৃদয়বত্তা? আজ বিংশ শতকের কোলকাতায় বসে এসব কথা বলা বা উত্তর দেওয়া দুই-ই

অবান্তর। সারা সুবা বাংলায়, শুধু বাংলায় কেন, সারা ভারতে দাসপ্রথা তখন রীতিমত চালু প্রথা। আলু পটলের মতো মানুষ কেনা-বেচা তখন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। হিন্দুরা তা করেছেন, মুসলমানেরা করেছেন। ইংরেজরা 'ট্রাডিশান' রক্ষার নামে শুধু চালু রেখেছেন মাত্র প্রথাটি। কার্যসিদ্ধির জন্য এটা তাঁরা ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের সর্বত্র করেছেন। তবে এ দেশে এ ব্যাপারে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে পথিকৃৎ হচ্ছে পর্তুগীজরা। ওদিকে আরাকান, চট্টগ্রাম, ঢাকা,—এদিকে সন্দীপ, হুগলী, বজবজ—সর্বত্র পর্তুগীজ হারমাদ আর বোম্বেটেরা বছরের পর বছর মায়ের কোল, গৃহস্থের সংসার শ্মশান করে বেড়িয়েছে। ১৭৬০ সালে বজবজের কাছাকাছি আক্রাতে তাদের রীতিমত একটা 'দাস-গুদাম' গড়ে ওঠে। পাছে তারা কোলকাতা বন্দর আক্রমণ করে বসে কোনদিন, এ ভয়ে আজকের বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে নদীর ওপর এক শিকল বেড় দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রতিরোধ করার জন্য। মগেরাও ছিল তাদেরই মতো। এরা একবার দক্ষিণ বাংলা থেকে ১৮০০ ছেলে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে চলে যায় আরাকানে। দেখে আরাকান-রাজ মহাখুশী। তিনি বেছে বেছে শিল্পী কারিগর এমনি কিছু লোক কিনে রেখে বাদ-বাকীদের ফিরিয়ে দিলেন—মালিকদের কাছে। বাংলার সন্তানেরা বিক্রি হলো সেখানে প্রকাশ্য বাজারে। দাম—২০ টাকা থেকে ৭০ টাকা। কেউ কিনে নিয়ে লাগালি গৃহস্থালীর কাজে, কেউ ক্ষেতের কাজে। ১৫ সের চাল তাদের মজুরি, খাওয়া পরা হাত-খরচা সব।

ফরাসীরাও তাই। ১৭৯১ সালে এই চন্দননগরে বসে কয়জন ফরাসী ভদ্রলোক প্ল্যান করলেন ভালো করে এই ব্যবসায়ে নামবার জন্যে। তাঁদের সংকল্প—বাংলা থেকে মেয়ে পুরুষ ধরবেন, আর সোজা চালান দেবেন পণ্ডীচেরীতে। একবার এই ব্যাপারে খিদিরপুরের কাছে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গেল ত্রিশজন দাস।

এই লোকসান নিশ্চয়ই পুষিয়ে নিয়েছিলেন—পরবর্তী কালে ফরাসী ব্যবসায়ীরা। মিঃ ফ্লোরিক্স নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক এক বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর দাস-শিকারের। বেচারার মন্দভাগ্য। বহু সাধ্যসাধনা করে তিনি ধরতে পেরেছিলেন মাত্র একজন স্ত্রীলোক আর দুটি শিশুকে। তবে তিনি হাল ছাড়েন নি। আশা প্রকাশ করেছেন: ভবিষ্যতে যদি কোনদিন একটা বড় জাহাজ আর কিছু বেশী লোকজন জোগাড় করতে পারেন তবে—এই সংখ্যা তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারবেন-ই।

কোলকাতার ইন্দের প্রসঙ্গে এসব কাহিনী আনতে হলো নয়ত আধুনিক শিশু-নগরীর বুকে এই পুরনো ব্যবসার প্রচলন-কাহিনীকে বোঝা যাবে না। ইংরেজরা এলো। ফরাসীরা তখনও ব্যবসা গুটোয়নি। পর্তুগীজদের কাজকর্মও চালু। তারা দেখলো, বাঃ এ তো বেশ মজার ব্যবসা! হাঙ্গামা-হুজ্জত নেই, মূলধন চাই না, বুদ্ধিবৃত্তিরও বিশেষ দরকার নেই। বেওয়ারিশ দেশ। কোন মতে ধরে চালান দেওয়া, অথবা অসুবিধে থাকে তো কাছাকাছি বাজারে এনে হাজির করা। নয়া নয়া সিবিলিয়ানরা আসছে। মুঠো মুঠো টাকা, দেশী ব্যবসায়ীদের মেজের নীচে ঘড়া ঘড়া টাকা! ক্রেতার অভাব কি? মসলাপাতি, লবণ, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শুরু করে দিল দাস-ব্যবসা। পাপ-পুণ্য মান-অপমানের কথাই ওঠে না। এ দেশের হিন্দু-মুসলমান নীতিশাস্ত্রে এ ব্যবসা সিদ্ধ। আর কুলীন ফরাসীরা যেখানে নেমেছে, সেখানে ইংরেজের মান অপমান আবার কি? কর্নওয়ালিশ সাহেব বোর্ড অব ডাইরেক্টারদের কাছে তাঁর লিপিতে অক্লেশে লিখে গেলেন: "দাসত্বপ্রথা তুলে দেওয়া সহজ কথা নয়। একে দাসেরা সংখ্যায় অধিক তদুপরি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের আইনমত এ ব্যবসার অধিকার স্বীকৃত।....সুতরাং অধীনের নিবেদন এই"—ইত্যাদি। তিনি এক ফরাসীকে ধরে ৫০০৲ টাকা

জরিমানা করে দিলেন। হেস্টিংস সাহেব আরও করিৎকর্মা। তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি আরও পরিপক্ক। তিনি আইন করলেন—ডাকাতদের বিচার হবে স্বগ্রামে। আর শাস্তি হবে এই—তার পুত্র প্র-পৌত্র বংশানুক্রমে দাস হয়ে থাকবে রাষ্ট্রের, অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির। কোম্পানির আদেশ মতো দেশের 'জনসাধারণে'র সুখ-সুবিধের কথা বিবেচনা করে কাজে লাগানো হবে তাদের। তা ছাড়া তিনি আরও একটা ব্যবস্থা করলেন। তিনি আইন করে দিলেন, অপরাধীদের কয়েদ-বদ্ধ করে বসিয়ে বসিয়ে না খাইয়ে তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হবে। তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হবে দূর-দূরান্তে কোম্পানির অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলে। খরচ-পত্তরের সুবিধে হবে, তার ওপর লাভও হবে কোম্পানির। হেস্টিংস আরও লাভের সন্ধান দিলেন কোম্পানিকে। তিনি ঘোষণা করলেন, দাসদের রেজেষ্ট্রী করে নিতে হবে কোর্ট হাউসে, ৪।০ আনা লাগবে জন প্রতি। জমি, বাড়ি, মোটর, রেডিওর মতো—দাসদেরও। তারাও তো সম্পত্তি, কেনা মাল। সাধু! সাধু! বললেন বোর্ড অব ডাইরেক্টাররা তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি দেখে।

ফলে বিধিসম্মত উপায়ে কোলকাতার ঘরে ঘরে উঠে এলো দাসেরা। সাহেবদের সেলাম করে, খিদমদ করে, মিসি-বাবাদের ফরমাস খাটে। অষ্টাদশ শতকের কোলকাতার শুরু হলো নয়া বিলাস, যার যত দাস তার তত খাতির তার তত নাম-ডাক। স্যার উইলয়াম্ জোন্স তখনকার কোলকাতার এই দাসদের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ—"এই নগরের অনেকের ঘরেই ক্রীতদাস আছে যাদের অতি অল্প মূল্যে কেনা হয়েছে।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ—"সম্ভবত আপনাদের অনেকেই দেখেছেন, কোলকাতার খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে এমনি ছেলে-মেয়েতে ভর্তি কত বিরাট বিরাট নৌকা ভিড়ে নদীতে। অস্বীকার করার উপায় নেই, এদের অধিকাংশকেই তাদের মা-বাবার কাছ

থেকে অপহরণ ক'রে অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে একমুঠো চাউলের পরিবর্তে সংগ্রহ করা হয়েছে।"

আমাদের ইন্দেও হয়ত একদিন এমনি একমুঠো চাউলের বদলে অথবা কারও বিয়ের যৌতুকস্বরূপ বা পিতা-মাতার ঋণের পরিবর্তে কিংবা অপরাধের জরিমানা হিসেবে মায়ের কোল ছেড়ে উঠে এসেছিল কোন ব্যবসায়ীর নৌকায়। তারপর একদিন সেই নৌকাখানা ঠেকেছিল আজব নগরীর ঘাটে। আর সেদিনই হয়ত চীনেবাজারের মিঃ রবার্ট ডানকান্ পাল্কী চড়ে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন স্ট্রাণ্ডে, সেই ঘাটের ধারে। তারপর আজকালকার শৌখিন বাবুদের মতো দেখে-শুনে তাজা ইলিশ কেনার মতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছিলেন নৌকার খোল-ভর্তি নর-সন্তান-গুলোকে। হঠাৎ হয়ত তাঁর চোখ পড়েছিল আর একজোড়া ডাগর ডাগর ভয়ার্ত চোখে। গলায় বাঁধা দড়িটা ধরে টানতেই একটা কম্পমান ক্ষুধার্ত শীর্ণদেহ কিশোর উঠে এসেছিল পাড়ে। অবশেষে চীনেবাজারের কুঠিতে। 'হ্যাল্লো ডিয়ার, দেখো এসে, কি এনেছি তোমার জন্যে!' ছুটে এসেছিলেন মিসেস ডানকান্। তারপর হয়ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেছিলেন—'হাউ নাইস এ গিফ্‌ট্!' ডানকান্ দড়িটা তুলে দিয়েছিলেন গিন্নীর হাতে।

১৭৮০ সালে এক বৃহস্পতিবার ইন্দে সেই দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়লো। অপেক্ষা করে রইলো না, কবে ডানকান্‌দের আত্মায় করুণা জাগবে, কবে দাস-মুক্তির আন্দোলন হবে, আইন হবে। তাহলে কমপক্ষে আরও প্রায় একশ বছর অপেক্ষা করতে হতো ওকে। আরও দুই পুরুষ দাস হয়েই থাকতে হতো ওর সন্তানদের। ইন্দে তা হতে দেয়নি। দাস-মুক্তির আইনের পথ চেয়ে না থেকে ইন্দে নিজের পায়ে মুক্তির পথ মাড়িয়েছে। ইন্দে কোলকাতার প্রথম মুক্ত-পুরুষ।

॥ রোটি আউর বেটি ॥

মার্ক্স্ নাকি বলতেন—মানুষের ইতিহাসের পনের আনাই রুটি নিয়ে কামড়া-কামড়ির কাহিনী। মাখন-রুটি, মাংস-রুটি—আর শুক্‌নো খট্‌খটে রোটির দ্বন্দ্ব। কোলকাতার ইতিহাসও বোধ হয় এর ব্যতিক্রম নয়। ভেবে দেখুন কথাটা। রুটির সঙ্গে দু'টুকরো মাংস জুটবে বলেই না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে ছুটে এসেছে ইংরেজরা। ফরাসী পর্তুগীজ ওলান্দাজরা। রুটি-মাংসের জন্যে মাংস খাওয়া-খাওয়ি করেছে এ ওর। দালাল-বেনেরা রুটি-মাংসের চেয়ে মাংস-পোলাওয় অভ্যস্ত বেশী,—নয়ত ফুলকো লুচি। টক-ঝাল-মিষ্টি সহযোগে নিয়মিত ছ'গণ্ডা লুচি খাওয়ার লোভে কথ্য অকথ্য সম্ভাব্য সকল পথে সাহেবদের পিছু ছুটেছে তারা। আর এদের পিছু পিছু ছুটেছে এদেশের গরীব মানুষেরা—ইন্দে আর নাসিবুনের বাপ-মায়েরা। শুধু এক টুকরো রুটি এক মুঠো ছাতু অথবা এক থালা পান্তা। পাল্কী বইতে অক্লেশে তারা বেহারা হয়েছে, আলো জ্বালতে মশালচী হয়েছে, হুঁকো বইতে হয়েছে—হুঁকো-বরদার। যা হুকুম তাই—রাজা বুঝিনে, নবাব বুঝিনে—শুধু এক টুকরো রুটি!

তা হলেই বুঝতে পারছেন—এমন রুটি-ময়, নানা আকারের নানা স্বাদের রুটি-কণ্টকিত ইতিহাস যে নগরীর, পলাশীর মাঠে অথবা ফলতার আবর্জনাস্তূপে তার ইতিহাস সন্ধান বৃথা। আজব নগরীর যথার্থ ইতিহাস জানতে হলে ঢুকতে হবে আমাদের তার আসল কর্মকাণ্ডের স্থানে। ঢুকতে হবে—হেঁসেলে। হেঁসেল মানে রসুইখানা মাত্র নয়—অন্তঃপুর। স্বভাবতই অন্তঃপুরচারিণীদের

কথা বাদ দিয়ে ভাবা যায় না তার কথা। বিশেষ করে, রুটি তৈরি যখন স্পর্শাতীত ঘটনা ছিল না তখন। মাটির মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে মোটা মোটা রূপোর বাজু পরা যে কালো হাতগুলো পিদিমের আলোয় আটা মাখতো তাদের কাহিনী আমরা জানি। কারণ এরা আজও ইতিহাস নয়। জানি, ঝাড় লণ্ঠনের নীচে দাঁড়িয়ে তাম্বুলরঞ্জিত মুখে অতিক্লেশে যাঁরা ঝি-ঠাকুরকে বলে দিতেন মেজোকর্তার লুচিতে ময়ানের পরিমাণ—কম-বেশি তাদের কেচ্ছাও। কিন্তু সে তুলনায় জানিনে—এই বিরাট দেশটাকে হাতের চেটোয় নিয়ে যারা ছোট ছেলের বলের মতো লোফালুফি করেছে যদৃচ্ছ, তাদের অন্তঃপুরের কাহিনী। উনুনে বসে রুটি না সেঁকলেও সেঁকা রুটিতে তারা বিলক্ষণ মাখন মাখিয়েছে। আধুনিক আইন মাফিক বা পশ্চিমী কন্‌ভেনশান অনুযায়ী কোলকাতার ইতিহাসের আধা-আধি তাদের প্রাপ্য না হলেও উচিত মতো কমপক্ষে ন' আনা সাত আনা যে হবে সেই ভাগ, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। সেই দায়ভাগ চুকিয়ে দেওয়ার বাসনাতেই আজকের এই প্রবন্ধ। রোটির কথায় বেটির কাহিনী অবতারণা।

ফ্রয়েড নাকি বলতেন—ক্লিওপেট্রার নাকটা আর সিকি ইঞ্চি উঁচু হলে পৃথিবীর ইতিহাসটা অন্য রকম হতো! আমাদের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য—কোলকাতার ইতিহাসে এমনি নাসিকার আবির্ভাব ঘটেনি। যে দু'একজন ইতিহাস গড়ার রাজমিস্ত্রী না হলেও ক্রমে ক্রমে জোগানদার হয়ে উঠেছিলেন—সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁরাও কোলকাতার পাকা বাসিন্দা হননি। পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা জরিমানা গুণে দিয়ে ফিলিপ ফ্রন্সিস্ বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছেন কোলকাতার ক্লিওপেট্রাকে। নয়ত মাদাম গ্রাণ্ড কি করতেন কে জানে! তাঁর পরবর্তী জীবন-কাহিনীর কথা ভাবলেই মনে হয় অনেক কিছুই সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। অন্ততঃ আর

দু'চারটে লাট-বেলাটের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া তো বটেই। দেশে ফিরে তিনি বিয়ে করেছিলেন—নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র-সচিব মঁসিয়ে তালরের'কে। তারপর ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর চলে যান ইংলণ্ডে। শোনা যায় ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত 'প্রীত' হয়েছিলেন।

কোলকাতার সৌভাগ্য এই প্রাসাদপুরীকে চিরকালের জন্য ভালো লাগেনি লোলা মনটেজের। নয়ত লোলা নাকি যা চেয়েছে এই পৃথিবীতে তাই পেয়েছে দু'হাত ভরে। কে জানে লোলার লালসা কোলকাতাকে মুক্তি দিত কিনা! সামান্য মেয়ে। মিঃ জেম্‌সের বিবাহিতা স্ত্রী। মিস্ এমিলি ইডেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সিমলায়। ইডেন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেছেন: চমৎকার মেয়ে, সব সময় আনন্দ-উৎফুল্ল নিষ্কলঙ্ক মন: দেখতেও চমৎকার। স্টার-ই বটে। অচিরেই মিসেস জেমস্ হয়ে গেল উদীয়মান তারকা—লোলা মনটেজ। লোলা অভিনয় করে, নাচে,—কিন্তু কোলকাতা বেশীদিন রাখতে পারলো না তাকে। লোলা কোলকাতা ছেড়ে চলে গেল সিক্‌র্‌রা নেভাডার এক পল্লীতে। সেখান থেকে সানফ্রান্সিস্‌কো। তখন তার নাম মিসেস পেট্রিক হাল্। খবরের কাগজের রিপোর্টার মিঃ হালের স্ত্রী। চার চারটি পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী হয়েছে লোলা একটি জীবনে। আর মিস্ট্রেস?—অগণিত মানবের। সে তালিকায় নাম আছে—একাধিক বিখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পীর। ব্যাভেরিয়ায় রীতিমত একটা বিপ্লব ঘটে গেল লোলাকে কেন্দ্র করে। রাজা প্রথম লুডুইগ সিংহাসন ত্যাগ করলেন এই কোলকাতার মেয়েটির জন্য। পয়সাওয়ালা এক তরুণ ইংরেজ মদ খেয়ে খেয়ে হত্যা করে ফেললো নিজেকে। ডুয়েলে প্রাণ দিল আর দু'জন তরুণ। মাঝদরিয়া থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল অন্য এক হতভাগ্য প্রণয়ী। কোলকাতার লোলা তার সারাটি জীবন ইউরোপ

আমেরিকার খবরের কাগজে জুড়ে রইল। এশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকা তিন ভূখণ্ডের নায়িকা কোলকাতার লোলা মনটেজ।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন—যদি এমনি আরও গুটিকয়েক নক্ষত্রের উদয় হতো সুতানটী গোবিন্দপুরের আকাশে তবে কোলকাতার ইতিহাসের আজ কি চেহারা হতো কে জানে! যা হোক, মাদাম গ্রাণ্ড বা লোলা মনটেজরা সংখ্যায় কম, তাছাড়া তাদের কাহিনী লেখবার মানুষের অভাব নেই। লোলাকে নিয়ে গেল বছরও তিনশ পৃষ্ঠার জীবনী তথা সুখপাঠ্য উপন্যাস বেরিয়েছে মার্কিন মুলুকে, The Woman in Black : by Helen Holdredge. হু-হু কাটতি সে বইয়ের। লোলা আজও নায়িকা!

যারা নায়িকা নয়, ফুটফুটে তারার মতো যারা ফুটে ওঠেনি ইতিহাসের পাতায়, যাদের নোনাধরা কবরে বাসি ফুলও পড়েনি কোনদিন—কোলকাতার আজব জীবনে নারী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পরিচয়ই ছিল না যাদের, আমার কাহিনী তাদের নিয়ে।

কি নাম জানি না, কাদের কন্যা তাও জানি না। কোম্পানী পাঠিয়েছে। বিলেত থেকে এক জাহাজ ভর্তি করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভেট পাঠিয়েছে তাদের রুটিসন্ধানী তরুণদের। এক জাহাজ মেয়েমানুষ। ১৬৭০ সালের কথা। জাহাজখানা ভিড়ল এসে মাদ্রাজের উপকূলে। ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে সাধারণ পল্টন—দুর্গ খালি করে সবাই ঘাটে ছুটলো। হৈ হৈ করে সকলকে দুর্গের ভেতরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো। একটা কাতর শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল লৌহকপাট। তারপর ভেতরে কি যে হলো কেউ জানে না। ক' বছর পর খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এক জাহাজ মেয়ের মধ্যে জীবিত আছে—মাত্র দু'জন। জীবিত আছে কোম্পানীর সেবাদাসী হয়ে। বেঁচে থাকার জন্য তারা কোম্পানী থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায়।

একশ বছর পরের ইতিহাসেও দেখি তাই। ঘাটতির অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে স্ত্রীলোকের দিকে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তখন ইংরেজ মহিলা মাত্র ৭২ জন। তাদের মধ্যে ১০ জন বিধবা আর ৭ জন অবিবাহিত। কোলকাতার অবস্থাও মাদ্রাজের মতোই। অষ্টাদশ শতকের শেষে গোটা প্রেসিডেন্সীতে ইংরেজ পুরুষ ছিল সাড়ে চার হাজার, আর মহিলা মাত্র আড়াই শ'। স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে উঠলো কোম্পানীর ছোকরা পল্টনরা। আমরা সারা দেশের জন্যে রুটির লড়াই করছি এই বিদেশ বিভূঁয়ে—আর আমাদের রুটি পাকাতে হবে নিজের হাতে? নালিশ গেল বিলেতে, কর্তৃপক্ষের কাছে। ১৬৮৮ সাল। তারা আর এক জাহাজ পাঠালেন। সঙ্গে আদেশ দিয়ে দিলেন: এক বছর দেখো। এর মধ্যে যদি বিয়ে সাদী করে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা না করে নেয়, তবে কোম্পানী থেকে তাদের পছন্দমত এক প্রস্ত পোষাক দিয়ে যে-কোন কাজে লাগিয়ে দিও। এক বাগিচার কাজ ছাড়া। কিন্তু খবরদার ইংরেজ ছাড়া ওরা অন্য কাউকে যেন বিয়ে না করে। স্বভাবতই এ জাহাজেরও বিলি বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আবার অর্ডার গেল বিলেতে। কিন্তু জাহাজ আর এলো না। কর্তৃপক্ষ লিখলেন: আর পারিনে বাছাধনেরা। যা খরচপত্তর। বহু সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারাও আসতে রাজী! কিন্তু স্ব-খরচায় কেউ নয়। তাই আমরা বলি কি—ওখানেই দেখে শুনে পাত্রী সন্ধান কর না কেন। ক্যাপ্টেনদের বললেন—ছেলে ছোকরাদের যত রকমে সম্ভব উৎসাহিত কর,—যেন দেশীয় মেয়েদেরই ওরা বিয়ে করে।

তা কি আর বলতে হয়! স্বয়ং চার্নক সাহেব থেকে শুরু করে বহু সাহেব রীতিমত ঘরকন্না করছেন এদেশের স্ত্রীলোকদের নিয়ে প্রকাশ্যভাবে। শ্বেতচর্মের গর্ব বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত করেনি তাঁদের। এত বড় সাহেব মার্টিন যাঁর অর্থে কোলকাতা আর লক্ষ্ণৌর লা মার্টিন বিদ্যালয়—তিনি কি করলেন শুনি?—লক্ষ্ণৌ

থেকে চিঠি লিখেছেন বিলেতী বন্ধুর কাছে : 'এদেশে আছি বটে, কিন্তু কি জানো, মন টেঁকে না। এই কৃষ্ণকায়গুলো এমন—।' বলেই একপ্রস্ত যদৃচ্ছ গালাগালি। গালাগালি শেষ হতে না হতেই সাহেবের মনে পড়ে গেল নিজ অন্দরের কথা। বললেন, 'ওঃ থুড়ি, বলতে ভুলেই গেছি। কৃষ্ণাঙ্গদের কথা বললাম বটে; কিন্তু এর মধ্যে তুমি আমার বাড়ীর মেয়েটিকে ধোরো না। ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ওদের দলে পড়ে না। জানো তো, ওর গায়ের রঙ আমার চেয়েও ফর্সা।'

শুধু মার্টিন সাহেব কেন? হায়দ্রাবাদের এক রেসিডেন্ট সাহেব হয়ে গেল—হামাৎজঙ্গ। কোম্পানীর সেনাবাহিনীর বক্সি ছিল এক মুসলমান বৃদ্ধ। সাহেব বিয়ে করে বসল তার নাতনী খির-উন্নিসাকে।

মুসলমান হয়ে গেলেন কর্নেল উইলিয়াম গ্রাণ্ডার। ভদ্রলোক ছিলেন ইংরেজ সরকারের চাকুরে। চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন হোলকারের বাহিনীতে। সহসা কার্যোপলক্ষে একদিন চোখে পড়ল—কাম্বের পদচ্যুত নবাব-দুহিতাকে। একদিন, দু'দিন। তৃতীয় দিনে নিজেই প্রস্তাব দিলেন নবাবের কাছে। নবাব বললেন—মুসলমান হতে হবে। সাহেব বললেন—'এ তো অতি সহজ প্রস্তাব। এত সহজেই রাজী হবেন তো ভাবিনি।' মুসলমান হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর এই রোমান্সের কাহিনীও স্থান পেয়েছে ইংরেজী সাহিত্যে। কিন্তু এরকম ঘটনা বেশী নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করতে চাইলেই কন্যাদান করবে কে? তাছাড়া রোমান্স করার ক্ষমতাও সবার সমান নয়। বিশেষ করে নবাব-নন্দিনী, আমীর-ওমরাহ কন্যারা যে কি চক্ষে ইংরেজ পুরুষদের দেখতো তাও অজ্ঞাত ছিল না তাদের কাছে।

সুতরাং বিবাহ সমস্যা দেখা দিল কোলকাতার তথা ভারতের ইংরেজ সমাজে। ১৭৭২ সালের সেণ্ট জন চার্চের বিয়ে-রেজেস্ট্রীর

খাতাখানার ছু'তিনখানা পাতা উল্টে যান। দেখবেন প্রথম পাতায় মোট বিয়ে আছে ন'টি। তার মধ্যে ছু'টির পাত্রী পর্তুগীজ কিংবা এতদ্দেশীয়। বাকী সাতজনের পাঁচজন বিধবা। বিধবাদের মধ্যে একজন আছেন মেরী গ্রাণ্ট। ভদ্রমহিলার ওটা পঞ্চম পরিণয়। প্রথম বার বিয়ে করেছিলেন একজন ফরাসী ভাগ্যসন্ধানীকে, দ্বিতীয় বার—একজন নৌ-চালক, তৃতীয়টি মেজর এবং চতুর্থটি ক্যাপ্টেন। সর্বশেষটি জনৈক সিবিলিয়ান। ভদ্রমহিলার পদোন্নতির ধাপগুলো লক্ষণীয়।

এবার আসুন এর পরের পাতায়। এ পাতায় বিয়ে আছে মোট ১৯টি। তার মধ্যে ৯টি অসবর্ণ বিবাহ—অর্থাৎ পাত্রীরা এদেশের বামুন-কায়েত কিংবা সেখ-সৈয়দের কন্যা। অবশিষ্ট দশ জন পাত্রীর—চারজন বিধবা। তার মধ্যে একজন বিধবার আবার এটি তৃতীয় পক্ষ। পাত্রপক্ষের অবস্থাও একই রকম। এই দশ জন পাত্রীর নামে নামে বর আছে মাত্র ন' জন! একজন একই পাতায় নাম উঠিয়েছে ছু'বার। বাকী যারা তাদের মধ্যে তিনজন-ই আবার দ্বিতীয় পক্ষ। তাহলেই দেখুন, সব মিলিয়ে হিসেবটা দাঁড়ায় এমনি: একদিকে পাত্রী ১০ জন, আর বর ১৪ জন। অন্যদিকে ৯ জন পুরুষের ১২ জন স্ত্রী।

আচ্ছা, তার পরের পাতাখানাও দেখুন। এ পাতায় বিয়ে আছে পনেরটি। তার মধ্যে মাত্র ছ'জন কনে কুমারী। এখানে এক-জন স্বনামধন্য ক্যাপ্টেনের নাম পাওয়া যাচ্ছে—ক্যাঃ থেলওয়েল। চার চারবার বিয়ে করেছেন ভদ্রলোক। তারপর আর এক পাতায় দেখুন—২৩টি বিয়ের মধ্যে ৪টি অসবর্ণ, মাত্র ৫টির কনে কুমারী, বাদবাকী সব বিধবা। মিসেস্ মেরী সেফার্ড নামে এক মহিলার নাম আছে এ পাতায়। ছয় ছয়বার প্রজাপতি ভর করেছিলেন তাঁকে। ষষ্ঠতম স্বামী যিনি—অর্থাৎ মিঃ সেফার্ডের ওটা চতুর্থতম

পরিণয়। ১৭৪২ সালের কোলকাতার কথা, আজ হলিউড শুনলেও বোধহয় ভিরমী খাবে বিস্ময়ে।

যাহোক, উপরের বিবরণ থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোলকাতার পাত্রপক্ষের অবস্থা। এ অবস্থায় আমরা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা যা করে থাকি, সিবিলিয়ান, মিলিটারী সাহেবরা তাই করতেন নিশ্চয়। নেটিব অ্যাস্ট্রোলজার-পামিস্টদের কাছে ছুটোছুটি করতেন আর হপ্তায় হপ্তায় বিজ্ঞাপন দিতেন কাগজে। আর হয়ত বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেন রাইটার্স বিল্ডিংস কিংবা ফোর্ট উইলিয়ামের খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে। ১৮০৮ সালে রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে এক মিঃ অটল বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন ক্যালকাটা গেজেটে—

A young man of genteel connexions and pleasing appearance, being desired of providing himself with an amiable partner and agreeable companion for life takes this opportunity to solicit the fairhand of a young and beaulifu lady.

তারপর নিজের গুণগ্রামের দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে মিঃ অটল শেষে রোমান্সের স্পর্শ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন বিজ্ঞাপনে—A line to Mr. Atall........will meet with every possible attention and the greatest secrecy will not only be observed but Mr. Atall will have the pleasure of giving due encouragement to their favour.

রাজকর্মচারী ওরফে তৎকালের প্রায়-রাজপুত্র অটলের এই কাতর আবেদনে সাড়া দেওয়ার মতো রাজকন্যার অভাব ছিল না হয়ত, কিন্তু তারা সব সাগরপারে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে। সোনারপুরী কোলকাতার নামে সবার মন উদ্ধু

উড়্। কিন্তু দৈত্যি দানোয় পথ ভরা। সুতরাং এদিকে কোলকাতা মরুভূমি, অন্যদিকে বিলেতে কন্যারণ্য! করিৎকর্মা ছেলেরা সব বাইরে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা মহাভাবিত। হবু জামাইয়ের বিষয়-আশয় ধনদৌলতের স্বপ্নে তারাও বিভোর। কোম্পানীর খাতায় নাম ওঠা মাত্র ধরে করে কিশোরী কন্যাকে তুলে দেন সিপাহীর হাতে। শুভাকাঙ্ক্ষী পাড়াপড়শীরা ছুটে এসে বলেন:—একি করেন, মিঃ অমুক—

—কেন? ঠিক-ই তো করেছি। কোম্পানীর চাক্‌রে—

—আসছে হপ্তায় যে ওদের জাহাজ ছাড়বে!

—তা ছাড়ুক, মাসে মাসে স্ত্রীর অ্যালাউন্সটা তো পাওয়া যাবে এখানে বসেই।

—তা ছাড়া, বিদেশ-বিভুঁই, লর্ড না করুন,—বলা তো যায় না—যদি একটা কিছু—

—তা হোক না, কতো আর বয়েস মেয়ের! তা ছাড়া, ছ'মাস তো কোম্পানী থেকেই খোরপোষ পাবে তখন—। জানেন তো: Three hundred, dead or alive!

গল্প নয়। ইতিহাস। আমাকে এ কাহিনীটি একটুও নড়চড় করতে হয়নি। বস্তুতঃ এমনি তখন ইংলণ্ডের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতাদের আর্থিক এবং মানসিক অবস্থা। একমাত্র ভরসা তাদের গঙ্গার তীর। এই কোলকাতা তখন তাদের একমাত্র আশ্বাস। কর্নেল রিচমণ্ড ওয়েবের মতো গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁর দুই কন্যাকে শুধু পাত্রস্থ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে এলেন কোলকাতায়। কনিষ্ঠা সারা ওয়েবের বিয়ে হলো পাটনায় পিটার মুরের সঙ্গে। জ্যেষ্ঠা এমেলিয়ার হলো সিলেটখ্যাত থ্যাকারের সঙ্গে। তারই সন্তান—বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেকফেস্ থ্যাকারে!

দু'চারটি এমনি উৎকৃষ্ট বৈবাহিক সম্পর্কের সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতায় মেয়ে পাঠানোর হিড়িক পড়ে গেল ওদেশে।

সেখানকার মেয়েরা বর ধরতে এলো কোলকাতায়। ক্লাইভের এক কাজিন (বাংলা করলুম না, সম্পর্কনির্ণয় বোধ হয় আরও কঠিন হয়ে উঠতো তাতে।)—মিস্ শেলী ক্লাইভ পর্যন্ত এক চিঠিতে জনৈক বান্ধবকে লিখছেন—"I fear the Colonel (Clive) will not bring me the Eastern Prince till it is too late ; the bushel of diamonds runs strangely in my head." তারপর আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন—'আহা, কাজিন না হয়ে যদি সহোদর বোন হতাম আমি কর্নেলের !' তাঁর এই চিঠিটিকে নিয়ে আর এক কবি দীর্ঘ কাব্যকাহিনীই লিখে ফেলেছিলেন। আমি কবি নই, তাই ভাবানুবাদ দিচ্ছি, এবং গদ্যেই দিতে হচ্ছে তা। সমসাময়িক কালের ইঙ্গ-ললনাদের এমন নিখুঁত চিত্র দুর্লভ। কবিতাটির সারমর্ম হচ্ছে ঃ

"আমি ভারত যাত্রার জন্যে তৈরি হয়েছি। সিটন এবং রামসে আমায় তুলে দিতে এসেছে। বুল বলছে—আমার ভাবনার কোন কারণ নেই। বৃটিশ আদলের একটা নিম্নতম প্রিমিয়াম নাকি ওদেশে আছেই। এমনকি এরা বলে আমার চেহারার জন্যেও ভাবনা মিথ্যে। বোম্বাইয়ের তাম্রবর্ণ সুন্দরীদের মধ্যে আমার এই আটপৌরে মুখখানাই নাকি সবচেয়ে সন্তুষ্ট করবে ওদের।....হাজার মানুষের ভীড়েও যারা হারিয়ে থাকে এখানে, মাদ্রাজ নেমেই নাকি তারা হয়ে দাঁড়ায় ভেনাস। সুতরাং বিদায়, আমি যাচ্ছি, আমি নাবুবিনা হতে চলেছি। ইত্যাদি—।" তারপর আছে দুপুরে তিনি কি করবেন, সন্ধ্যায় কি কর্তব্য হবে, কত লোক তাঁর হুকুম তামিল করবে, কত লোক সেবা করবে, কি অফুরন্ত ধনরত্নের অধিকারী হবেন তিনি। হীরার স্তূপ হয়ে যাবে, মুক্তার মালার পর মালা। রূপার টি-সেট, বন্ধুর বাড়ি যাতায়াতের জন্য বেহারা সমেত পাল্কী, সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়ার জন্য জুড়ি গাড়ি।

বস্তুতঃ প্রায় প্রতিটি ইংরেজ তরুণীর ছিল এই এক স্বপ্ন, একমাত্র সাধনা। মা বাবা পরম যত্নে পুষে যেতেন তাঁদের মনের এই সাধ। শোনা যায়, তৎকালীন এদেশীয় ইংরেজ পিতামাতার কর্তব্য ছিল—পাঁচ বছর বয়স হলে যেখানেই থাকুন না কেন তাঁরা, কন্যাকে পাঠিয়ে দিতে হবে 'হোমে'। সেখানে ব্রাইটন বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হবে মেয়েটি। বড় হবে—মাসি পিসির কাছে ভারতবর্ষের নীল আকাশ, রাজপুত্র হীরে মাণিক্যের গল্প শুনে। পনর বছর বয়সে পিসীকে আর বলতে হবে না। নিজেই ছটফট শুরু করবে জাহাজে ওঠার জন্যে। অবশেষে সত্যিই একদিন নোঙর করবে কোলকাতায়। বহু প্রসারিত হাত একসঙ্গে টেনে নেবে কাছে।

দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত অতি অল্প জনের ভাগ্যেই জুটতো কর্নেল, ক্যাপ্টেন। সৈন্য দলের সবাই আর ক্যাপ্টেন হবে কি করে? ফলে অবশেষে তাকে ঘর পাততে হতো কোন দূর হিল্ স্টেশনের ছাউনীর নীচে সাব-অলটার্নের সঙ্গে নতুবা আবার ফিরে যেতে হতো দেশে শূন্য হৃদয়ে শূন্য মনে একমাথা দুঃস্বপ্ন আর দুর্ভাগ্য বয়ে।

আশ্চর্য, তবুও আসতো। বছর বছর এই কোলকাতায় প্রতি মরসুমে এই সব স্বপ্নে-পাওয়া মেয়েদের জাহাজ ভিড়তো গঙ্গার ঘাটে। তারপর মেলা বসতো অশ্বত্থতলায়। মাল্টায় এই কন্যাবোঝাই নৌকো জাহাজকে বলা হোত—'জেলে নৌকো'। ঘাট থেকে কোনমতে পা একবার তোল ডাঙায়, তারপর জাল ফেল, আর ধর। যত খুশী, যেমন খুশী। রুই কাতলা চিংড়ি পুঁটি সব ভিড় করে আছে এখানে। মাদ্রাজে নাকি লটারীও হতো এদের নিয়ে। কোলকাতায় তা হয়নি। তবে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে—এই মেয়েদের ভিড়ে যে কোন মেয়ের হাত ধরে যে কেউ নাকি বলতে পারতো—Lady, will you walk? অনেকে গট্ গট্ করে উঠে আসতো ঘরে, বাংলোয়। অনেকে আবার খেলা

করতো দক্ষ শিকারীর মতো ;—মাসের পর মাস, বছরেরর পর বছর। কিন্তু প্রশ্ন, যার সন্ধানে এই এত দূর ধাওয়া, সেই 'শিবের মতো স্বামী, কুবেরের মতো ধন',—শেষ পর্যন্ত মিলতো ক'জনের!

এ প্রশ্ন কেউ কাউকে কোনদিন করে নি। শুধু একটি মেয়ে এ প্রশ্ন করেছিল নিজেকে। আর সে প্রশ্নের উত্তরটি সে শুনিয়ে গেছে কোন এক মাসীর মাধ্যমে। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে কোলকাতাগামী মাসীকে সে একখানা চিঠি লিখেছিল। খোলামনের চিঠি ;— গোপন ইতিহাসের একখানা খোলা পাতা। কান্নায় ভেজা, ক্লান্তিতে অবসন্ন। সে চিঠির দীর্ঘ কাহিনী এখানে অবান্তর। দু'চারটে নির্বাচিত লাইন মাত্র তুলে দিচ্ছি। এই সব হতভাগ্য মেয়েদের মনের কথা বোঝার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট হবে আজকের পাঠকের কাছে।

মাসীকে সাবধান করে দিয়ে মেয়েটি বলছে ঃ এসো না মাসী, তুমি এসো না—কিছুতেই এসো না। যে ভুল আমি করেছি, প্রতি বছর আমার মতো অনেক মেয়ে যে ভুল করে থাকে তুমি সে ভুলে পা দিও না। তার চেয়ে বরং জীবনভর একা থেকে যাও। তোমার শ্রম, তোমার বিদ্যেয় যা রোজগার করতে পার তাই খেতে থাক—কিন্তু তবুও এদিকে এসো না। তা হলে আমার মতো অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে হবে তোমাকেও সারা জীবন। সত্য বটে, আজ আমি বিবাহিতা। যে বস্তুটির সন্ধানে আমি পাড়ি জমিয়েছিলাম দূর কোলকাতায় সেই স্বামীলাভ আমার ঘটেছে। অর্থও জুটেছে অনেক। সম্ভবতঃ আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশী। কিন্তু তার বদলে চিরকালের মতো হারিয়েছি আমি আমার সুখ, আমার মনের শান্তি। কেন জান? আমার স্বামী আমায় গ্রহণ করেছে তার প্রয়োজনবস্তু হিসেবে, সাথী হিসেবে নয়। এমন ব্যবহার করে যেন পাল্কী বয় যে বেয়ারাগুলো আমিও যেন তাদের মতোই তার কেনা বাঁদী! সুতরাং বুঝতেই পারছো! এখানে স্ত্রীর

মানসিক শান্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব একমাত্র স্বামীর বিয়োগে। অবাক হচ্ছো? কিন্তু মাসী, এই-ই সত্য আজকের ভারতবর্ষে।

এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আজব নগরীর প্রথম জীবনে ইংরেজ মেয়েরা এমনি করেই এক হয়ে গিয়েছিল রুটির সঙ্গে; আজব নগরীর আজবতম সমাজে রোটি আর বেটি এক। দুই-ই খাদ্য!

এত কথা বলা হয়ে গেল; কিন্তু এক তরফের হলো মাত্র। আলো-ঝলমল চৌরঙ্গী আর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের সংবাদ! ব্ল্যাক টাউনের সমাচার কি? যে কালের কাহিনী বললাম এখানে—ব্ল্যাক টাউন তখনও অন্ধকারে। সতীদাহ বন্ধ হয়েছে ১৮২৯ সালে। ১৮২৮ সালেও কোলকাতায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে ৩০৮টি মেয়েকে। বিদ্যাসাগর সদরে করেছেন রিপোর্ট 'বিধবাদের হবে বিয়ে—' এ ছড়াটিও আরও অনেক পরের। সুতরাং সেণ্ট জন চার্চে যখন ঘণ্টা বাজিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিয়ে হচ্ছে বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলার, গঙ্গার ঘাটে তখন প্রবল হরি-সঙ্কীর্তনের মধ্যে সানন্দে দাহ করা হচ্ছে সদ্য-বিধবা কোন কিশোরী কিংবা তরুণীকে। সতীদাহ!

সতীদাহ কোলকাতায় তখন প্রায় প্রতি দিনের ঘটনা। সারা ব্ল্যাক টাউন চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চলেছে বাবু-বিলাস, গুরুর-প্রসাদী, কৌলীন্য-রক্ষা। সতীর আর্তনাদ, বিধবার কান্না, আর বারবনিতার কাতর আহ্বানে—অষ্টাদশ শতকের কোলকাতা প্রেতপুরী! পা লজ্জায় জড়িয়ে আসে সেদিকে বাড়াতে।

আশ্চর্য! কোলকাতায় অনেক বীরের স্মৃতি আছে; পদাধিকার

মেয়ের নামে প্রকাশ্য স্থানে একটি লাইনও। মূর্তি তো দূরের কথা। কবরখানায় কবরখানায় ঘুরে বেরিয়েছি। বেগম জনসনের স্মৃতিস্তম্ভ আছে সেণ্ট জন চার্চের কবরখানায়। পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় আছেন—এলিজাবেথ জেনি বারওয়েল ওরফে মিস্ সেণ্ডারসন। আছেন মিস্ অ্যানিও। কিন্তু এঁরা কোলকাতার ক'জন? বেগম জনসন মাদ্রাজ দুর্গের অধিপতি ক্রুকের কন্যা, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লিভারপুলের ঠাকুমা। সুতরাং তাঁর সমাধি গৌরবের কারণ বোঝা যায়। স্বয়ং লর্ড মিণ্টো ছ'ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর শেষকৃত্যে। যতবড় সুন্দরীই হোন না মিস্ সেণ্ডারসন, বারওয়েল-গৃহিণী হওয়ার সুযোগ না হলে কবরখানার গাইড যে এতো সহজে সেটা বার করতে পারতো না কবরের অরণ্য থেকে, সে কথা আমি নিশ্চিত জানি। লেডি অ্যানিও তাই বরং পদগৌরবে তিনি আরও উচ্চতর স্থানের দাবীদার।—রাজা ২য় চার্লসের নাতির নাতিনী। সুতরাং কবরের ম্যাপে তাঁদের সমাধি তারকা-চিহ্নিত হবেই তো।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে গেছি। অনেক ছবি, অনেক দলিল, অনেক মূর্তির যাদুখানা সেটি। কিন্তু কোথাও চোখে পড়লো না মাসীর কাছে লেখা সেই মেয়েটির চিঠিটি; অন্ততঃ একখানা প্রতিলিপি। চোখে পড়লো না—শিল্পী টিলি কিট্সের আঁকা সেই 'জেণ্টু' মেয়ের ছবিটি:

"A Gentoo woman taking leave of her friends··· before mounting her husband's funeral pyre."

॥ 'রাইটার' ॥

—রাইটার মানে!

নিজেকে যত ট্যালেন্‌টেউ্‌ই ভাবুন আপনি, নিশ্চিত জানবেন এর পর আর উত্তরের অপেক্ষা করবেন না প্রত্যাশিত ভাবী শ্বশুর মশা'য়। প্রাক্‌-সম্বন্ধ যুগে রসিকতায় যদি নৈতিক লজ্জা অনুভব না করেন, তবে মুচকি হেসে জবাব দিন,—'লেখক,—তবে ডেসপ্যাস লেখক।' দেখবেন তিনিও হাসতে জানেন। এক গাল হেসে তক্ষুণি জবাব দেবেন,—'বাবাজী, তবে আর শুভকার্যে বিলম্ব কেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতিহাস বদলায়। কিন্তু ডেসপ্যাস-রাইটার, লেজার-রাইটারদের প্রজাপতি-ভাগ্য বৃহস্পতি অনড়। অনুরূপ অপরিবর্তিত বিশুদ্ধ রাইটারদের কপালে শনির আসনটি। শুনেছি দেশভেদে রুচি-ভেদ ঘটে, কিন্তু এ ব্যাপারে দেখি টেম্‌স আর গঙ্গাতীরের ভদ্র-সন্তানেরা, জেন্টলম্যান আর জেন্টুরা এক। অষ্টাদশ আর বিংশ শতক অভিন্ন। হিংসের কথা নয়, প্রসঙ্গ কথা হিসেবেই উল্লেখ করলাম ব্যাপারটি। বাঙালীর গমপেষার চেয়ে লেজার-পেষায় কেন বেশি রুচি তার ঐতিহাসিক সূত্রটি আমার মনে হয় এখানেই।

যাক্‌ সে কথা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন 'রাইটার' মানে কি।—কেরানী।—সেরেফ কেরানী। লোয়ার ডিভিসন, না আপার ডিভিসন—জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু পদ্য কিংবা নভেল লেখেন তা দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না। অবশ্য এমন কথা বলছি না যে, কেরানীদের মধ্যে সাহিত্যিক হয় না বা হতে পারে না। নিশ্চয়ই হতে পারে। লর্ড কার্জন, লর্ড ডালহৌসি

থেকে শুরু করে বহু সেক্রেটারী (সম্প্রতি দেখতে পেলাম একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীও) তা হয়ে দেখিয়েছেন। সুতরাং প্রশ্ন সেখানে নয়। হস্তগুণে ডেসপাচ অবশ্যই সাহিত্য হতে পারে, তবে আমাদের কপালগুণে সেটি কম হয়। নয়ত দেখতেন প্রতিদিন বহু রাইটার ফটাফট মারা পড়তেন রাইটার্স বিল্ডিংসে। লর্ড কার্জনকে খাতির করা হয়েছে বলেই ভাববেন না জনগণের (!) পয়সা দিয়ে রামপ্রসাদ পোষার শখ সরকার বাহাদুরের আছে। মনে রাখবেন কার্জন সাহেব লর্ড, আর রাইটার কেরানী। বঙ্গ-সমাজে যাদের পরিচয়—সপ্তদশ শতকে সরকার, অষ্টাদশ শতকে মুৎসুদ্দি, উনবিংশ শতকে কেরানী, বিংশ শতকে করণিক। রাইটার করণিক-শ্রেষ্ঠ বা বড়বাবুও নয়, করণিক-কুলপতি বা সেক্রেটারী আণ্ডার সেক্রেটারীও নয়। রাইটার কেরানী এবং লোয়ার ডিভিসন কেরানী।

এদের আবার জীবনকথা কি? সে তো মনে হয় রামায়ণ-মহাভারতের চেয়েও প্রাচীন কথা। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের বাদ দিলে সংক্ষেপে দাঁড়ায়ঃ ঘুম থেকে উঠে পাউডার মিল্কের চা তারপর মাসের প্রথম আটদিন হলে থলি হাতে বাজার গমন, নয়ত পাড়ার মুদির দোকান থেকেই প্রত্যাবর্তন। থলিটা বারান্দায় ফেলে রেখে পাড়ার 'ইভিনিং ইন প্যারিস রেস্তোরাঁ'য় ক্ষণেক আড্ডা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বহুদর্শী আলোচনা। অবশ্য—স্ট্রিক্ট্‌লি পাড়াগত। তৎপর স্নান। অবশেষে আপিস। কিছু কাজ, কিছু ফাঁকি। কিছু আত্ম-চিন্তা, কিছু পরচর্চা। তারপর আবার বাড়ি। বয়স কমতি থাকলে—খেলার মাঠ কিংবা লাইব্রেরি-কাম-তাসঘর (ক্লাব নয়) হয়ে। বয়স সন্ধ্যের দিকে হলে—অতঃপর ভোজন এবং শয়ন। উৎসাহী হলে,—দু'চারটে ভাবী রাইটাকে তালিম দেওয়া। এর পরও নিশ্চয়ই জীবন আছে রাইটারের। এর ফাঁকে ফাঁকেও ঠিক জীবন

নয়,—জীবনের মতো বস্তু আছে। সিনেমায় লাইন দেয়, কবিতা পড়ে, লেখে, মিছিল করে, মিছিল গড়ে, ভাঙে। কিন্তু সে জীবন রাইটার জীবনের পরিশিষ্ট মাত্র। ইম্‌পরটেন্ট অধ্যায়গুলো তার অন্যত্র। সেগুলোর কথঞ্চিৎ সন্ধান রাখে রাইটার-ঘরণী আর অবশিষ্ট পাড়ার মুদি।

মুদি আর কেরানী কোলকাতার আদিকালের দোস্ত। আজব নগরীর ইতিহাসে এদের এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শুরু হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। সুতরাং রাইটারের কথায় তাদের বাদ দেওয়া সঙ্গত হবে না। বরং রাইটার-কাহিনীতে যাওয়ার আগে তাদের কথাটাই সেরে নেওয়া ভাল। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের তাই পরামর্শ।

মুদির কথায় প্রথমেই মনে পড়ে স্বনামধন্য স্বর্গত চন্দ্রনাথ পাল মশাইয়ের কথা। আজও তাঁর স্মৃতিকে বুকে ধরে রয়েছে চাঁদপাল ঘাট। চাঁদপাল ঘাট—তখনকার দিনে গেটওয়ে টু ক্যালকাটা। কোম্পানীর জাহাজ ভিড়ত এখানে। সিবিলিয়ান মিলিটারী সায়েবরা এখানে আসার পথে যাওয়ার পথে জমায়েত হোত। চন্দ্রনাথ পাল ওরফে চাঁদ পালের অঙ্গনে। কোলকাতার বাল্যজীবনে হেন রাইটার বোধ হয় নেই যে, তাঁর দাওয়ায় বসে সিগারেট না ফুঁকেছে। ভুল হলো,—হুঁকো না টেনেছে। এমন মনে করার কারণ নেই যে, তারা চিরকালই নগদ খেয়েছে। তাহোলে রাইটার-প্রধানেরা ওঁর নামে একটা আস্ত ঘাট নাও রাখতে পারতেন।

তারপর ধরুন কান্ত মুদির কথা। কোলকাতার ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস যতদিন আছেন ততদিন কান্ত মুদিও আছেন। গোটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর কাছে নুনের ঋণে দায়বদ্ধ। লজ্জার মাথা খেয়ে, মান-সম্ভ্রম কোটের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হেস্টিংস তাঁকে শুধু 'অহেতুক' অপমান থেকে রক্ষা করেছেন তাই নয়,—তাঁকে তিনি ব্ল্যাক-টাউনের সমাজপতি করে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর ওয়ারেণ্ট তাঁকে ধরতে পারে না, কোম্পানীর আইনে তাঁর বিচার চলে না। তিনি স্বয়ং—জস্টিস্। ব্ল্যাক-টাউনের তিনি বিচারক। কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্ত মুদির এই বিশেষ খাতির সম্পর্কে ব্ল্যাক-টাউনের 'নিন্দুকেরা' ইতিহাসে একটি গল্প জুড়ে দিয়ে বসে আছে। সেটি প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য—ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এমন কথা বলেন নি। কাহিনীটি এই : একদিন ভোরবেলা নন্দী মশাই শয্যা ত্যাগ করেই দেখেন স্বয়ং কোম্পানী বাহাদুরের প্রধান সরকার তাঁর দাওয়ায় উপবিষ্ট। কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আদিবাস কাশিম-বাজার। হঠাৎ কাশিমবাজারে হেস্টিংস সাহেবকে এমন অবস্থায় দেখে তিনি মহাসন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—হুজুর, আপনি এখানে!

—তোমাদের সুবাদার তাড়া করেছে। কথা বলারও অবসর নেই হেস্টিংসের। তিনি ঘরে ঢুকে পড়লেন।

—হুজুর কি আমাদের নবাব বাহাদুরের কথা বলছেন?—কান্ত ভয় পেয়ে জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ, সেরাজউদ্দৌলা, দ্যাট্ সু-বা-ডা-র! (ইংরেজেরা সিরাজকে নবাব বলতো না)

কান্ত অভয় দিলেন—কোম্পানীর খাতির যা পেয়েছি, এর পর আপনার কোন ভাবনা নেই হুজুর।—কিন্তু ভাবনা হোল ক্ষুধার্ত লাটবাহাদুরকে খেতে দেন কি!

মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়
হেস্টিংসকে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তাভাত, আর চিংড়ি মাছ
কাঁচালঙ্কা, বড়ি-পোড়া,—কাছে কলাগাছ।
কাটিয়া আনিল শীঘ্র কান্ত কলাপাত
বিরাজ করিল তাহে পচা পান্তাভাত।
পেটের জ্বালায় হায় হেস্টিংস তখন
চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় করেন ভোজন।

হেস্টিংস কান্তর ভবনে ডিনার খেলেন। প্রাণ বাঁচল। কোম্পানীও হেস্টিংসের মতো মহাবলীকে পেয়ে রক্ষা পেল। মনে রাখবেন হেস্টিংসও আদিতে রাইটার। 'অনারএবল্ স্যারস'—বলে নিজের গুণগ্রামের ফিরিস্তি দিয়ে তাঁকেও একদিন দরখাস্ত করেই চাকরী জোগাড় করতে হয়েছে।

তারপর আরও অনেকে দরখাস্ত করেছে। চাকুরী পেয়েছে। কান্তরাও তাদের খাতির করে আসছে ঐতিহ্যানুযায়ী। আজও করে। কান্ত মুদিরা না থাকলে পান্তর অভাবে বহু ক্ষুদে-হেস্টিংস বোধ হয়ম রা যেত এগলিতে ওগলিতে।—রাইটাররাও নিমকহারাম নয়। তারাও মুদিদের খাতির করে। তৈলের নামে চর্বি কেনে, ময়দার নামে পাথরের গুঁড়ো,—তবুও পুলিসে যায় না—এ সৌহার্দ্য দীর্ঘজীবী হোক!

মুদি-দোকান থেকে এবার আসা যাক রাইটার-আলয়ে। রাইটার্স বিল্ডিংসে। রাইটার্স বিল্ডিংস তখন রাইটারদের নিবাস-স্থান,—সেক্রেটারিয়েট বা মহাকরণ নয়। এটা হয়েছে অনেক পরে। তার আগে তরুণ সিবিলিয়ানদের বাসভূমি অথবা বিচরণভূমিরূপে রাইটার্স বিল্ডিংসয়ের অর্ধ শতক কেটে গেছে। সিবিলিয়ানরা আসে। জাহাজ থেকে নেমেই বাড়ি চায়।—বাংলো বাড়ি। কোম্পানী দেখলো এ তো মহামুশকিল। তারা লালদীঘির এধারের তাদের এই খাস জমিটাকে পাট্টা দিয়ে দিল জনৈক টমাস লিয়নকে। ১৭৭৬ সালের ১৮ই নভেম্বর লিয়ন হাতে পেলেন জমিটা। তৈরী হলো রাইটার্স বিল্ডিংস। রাইটারদের বাসভূমি। কোম্পানী হাঁফ ছাড়লো। বাড়িভাড়া, পাল্কীভাড়া, খাওয়া খরচা, এটা ওটা করে মাসে মাসে কম অ্যালাউন্স লুটেছে ছোকরাগুলো! এবার সব রহিত। নিয়ম হয়ে গেলো—যাদের মাসিক মাইনে তিন শ' টাকার কম তাদের এখানে থাকতে হবে। চাকর-বাকর এটা-সেটার নামে আগে তারা যা পেতো এবার থেকে সে খাতে তারা পাবে মাসে সাকুল্যে একশ' টাকা।

তথাস্তু—বলে নব্য রাইটাররা এসে ঢুকলো রাইটার্স বিল্ডিংসের কোঠায়। কোঠায় মানে—আধুনিক ওয়ান-রুম ফ্ল্যাটে নয়। এক একখানা ফ্ল্যাট এক একখানা বাড়ি। সুতরাং আপত্তি কি। রাইটার নাচে, গায়, কাপিখানা করে, পাত্রীর সন্ধান করে, বিজ্ঞাপন দেয়, শিষ দেয়। কেউ কেউ বাগানবাড়িও রাখে। নরক গুলজার লালদীঘির পাড়ে। এদের বিলাসিতার বহর দেখে কোম্পানীও বিচলিত হয়ে উঠলো। কড়া হুকুম হলো—(১) একজন রাইটার চাকর রাখতে পারবে দু'জন মাত্র। একজন তার ফরমাস খাটবে, অন্যজন বাইরে গেলে সঙ্গে থাকবে। আর তাকে একজন মাত্র বাবুর্চি অনুমোদন করা হবে। (২) কোম্পানীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন রাইটারের বাড়ি কিংবা বাগানবাড়ি রাখা চলবে না (৩) রাইটাররা সাধারণ সিধে-সাদা পোষাক ছাড়া মহার্ঘ পোষাক পরতে পারবে না—ইত্যাদি।

রাইটাররা কিন্তু এজন্যে মোটেই ভাবিত হলো না। তারা মিটিংও বসালো না, ধর্মঘটের নোটিশও দিল না। এমন তো নয় যে, লোয়ার ডিভিসান হয়েই জন্মেছি, লোয়ার ডিভিসান হয়েই বিগত হতে হবে। আজ আছি আণ্ডার রাইটার, কালই হবো রাইটার। তারপর ফ্যাক্টার, তারপর জুনিয়ার মার্চেন্ট, তারপর সিনিয়র মার্চেন্ট, তারপর যা খুশী। ক'দিনের মামলা! বারো চোদ্দ বছর চাকরী হলেই ঢের। লিফ্‌ট তখন লিফ্‌টই—সিঁড়ি নয়। হু-হু করে করে ওপরে ওঠে। সুতরাং রাইটার অপেক্ষা করে রইলো। পরের বছরই মাইনে গেল বেড়ে—তিন শ'র ওপরে হোল। সঙ্গে সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসকে ফাঁকা করে চলে এলো বাড়িতে। বাড়িতে মানে সাহেবপাড়ার কোন সুরম্য প্রাসাদে।

এবার আসুন তার বাংলোয়। দেখলেই বুঝবেন বাড়িখানা যথাসম্ভব যাতে ঠাণ্ডা থাকে তেমনিভাবে তৈরি। দূর থেকেই

দেখবেন রাইটার বসে আছে। মানে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। একখানা পা তার এলায়িত দামী মোড়ার উপর। 'ওরিএন্ট্যাল অ্যানুয়েল', ১৮৩৫, লিখছেন : দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখবেন একটি লোক এসে সেলাম করে দাঁড়িয়েছে। উনি সরকার। —হুজুর, কি আদেশ ?

পিছনে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে হুঁকোবরদার। ছিলিম বদল করবে। পাখাওয়ালা অন্য পাশে দাঁড়িয়ে যোগ্য সাইজের তালিপত্রে ধীরে ধীরে হাওয়া করছে। পেয়াদা কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে—কোথাও কোন আদেশ বহন করে যেতে হবে কিনা তাই জানতে। বাড়িময় ভৃত্য-বাবুর্চি। যেদিকেই তাকান দেখবেন ভৃত্যের মেলা। প্রতি জানলায় মানুষ, প্রতি দরজায় মানুষ।

তারপর পোষাক বদল.। ত্রিশ প্রস্থ পোষাক তখনকার স্বাভাবিক রীতি। বহুজনের সহায়তায় বহু ঘণ্টা ব্যয়ে রাইটার পোষাক পরলেন। পাল্কী চড়লেন। বেহারা ছাড়াও আগে পিছে মানুষ। তাঁর ভৃত্যের দল। চার ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা আফিস। টিফিন বাড়িতেই। তার ফর্দ নিয়ে আর আধুনিক রাইটারদের ক্ষুধার্ত উদরকে স্মৃতি-কাতর করতে চাই না।

বিকেলে—বই পড়া, তাস খেলা, ঘোড়ায় চড়া কিংবা ভ্রমণ। শেষোক্তটি হোলে—ব্ল্যাক টাউনের বৌ-ঝিরা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো দরজার ফাঁক দিয়ে। দীর্ঘ মিছিল চলেছে রাইটারের অগ্র-পশ্চাতে।

একালের রাইটাররা স্বভাবতই এর পর জানতে চাইতে পারেন, এই সব নবাবদের মাইনে-পত্তর কি রকম ছিল! তার চেয়ে বরং শুনুন খরচপত্র কেমন হতো তার কথা। মাসে ৫০৲ টাকা বাড়ি-ভাড়া দিয়ে শুধু খাওয়া থাকা বাবদ একজন রাইটারের মাসিক খরচ ছিল কতো জানেন? ৩০০০৲ টাকা। তারও অধিকাংশই

অকৃতদার। আর বিবাহিত হলেও মা-ষষ্ঠীর পুজো বড় একটা প্রচলিত ছিল না তখনকার ও-পাড়ায়। বলা বাহুল্য, বুঝতেই পারছেন, মাইনে যাই হোক তা দিয়ে চাকর-বাকরের রীতিমত একটা সেক্রেটারিয়েট পোষা সম্ভব হতো না। অবশ্য উপরের দিকে মাইনের পরিমাণটিও একেবারে নগণ্য ছিল না। আর উপরে উঠাও যে খুব কষ্টসাধ্য ছিল না সে কথা তো আগেই বলেছি। সবচেয়ে নীচু থেকে সবচেয়ে উঁচুতে ওঠা করিৎকর্মাদের পক্ষে মাত্র ক'বছরের ব্যাপার। মিঃ কোচর্যানে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর চাকরী নিয়ে এলেন। পদ—রাইটার। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্যাক্টার। '৭৮-এ কোম্পানীর জুনিয়র মার্চেণ্ট; '৮০-তে সিনিয়র মার্চেণ্ট। বাস্, চাকরী হয়ে গেলো। এর পর তিনি হলেন—পুরো ব্যবসায়ী। সৈন্যবাহিনীতে মদ সরবরাহ করা হলো তাঁর কাজ। ১৮০৮ সালে দেশে ফিরলেন ভদ্রলোক। ট্যাঁকে করে ঘরে নিয়ে গেলেন ৪০,০০০ হাজার পাউণ্ড।

এ রকম টাকা অনেকের পকেটেই থাকতো। চাকুরী গত উন্নতি-অবনতির সঙ্গে তার যোগ ছিল অতি সামান্য। প্রশ্ন: তবে হতো কি করে? ট্যুইসনি কিংবা ইন্সিওরের দালালী করে নয়—ব্যবসা করে। থ্যাকারের ঠাকুর্দা মশাই এমনি প্রাইভেট বিজনেসের দায়ে পড়েছিলেন একবার। ভদ্রলোকের বদলি হওয়ার সম্ভাবনা দেখে নিজের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে। সে তালিকা দেখলে—হিজ হাইনেস মহারাজা অব অমুকও বসে পড়বেন!

বলা বাহুল্য, রাইটারদের এই সৌভাগ্যসংবাদ সাগরতীরেও অবিদিত রইলো না। এদ্দিন কেরানীগিরি ছিল মধ্যবিত্ত সন্তানদের একচেটিয়া। এবার বোর্ড অব ডিরেক্টারদের দরজায় দরখাস্ত হাতে লাইন দিয়ে বড়ঘরের ছেলেরাও দাঁড়াল। ব্যারন-লর্ড-পুত্ররাও। এখনকার কোলকাতার মত রাইটারী সু-দুর্লভ

হয়ে উঠলো ইংলণ্ডেও। কারণ রাইটার আর মশামারা-কেরানী নয় —রাইটার তখন তাদের কাছে বাদশা।

সুতরাং—চলো ক্যালকাটা।

—কিন্তু যোগ্যতা? যোগ্যতা নং ১ হচ্ছে দেহবর্ণ উত্তম শ্বেত কিনা। এর পরের যোগ্যতা সেই সনাতন বস্তুটি—উৎকৃষ্ট ব্যাকিং আছে কিনা! কমপিটিটিভ এক্সামিনেশন চালু হয় ১৮৫৫ সালে। সুতরাং মামা-মেসোর বলই তখনও শ্রেষ্ঠ বলম্। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর তদ্বির করে মিসেস্ সিডনের ছেলেকে চাকরী যোগাড় করে দিলেন একটা। মিসেস্ সিডন্ ইংলণ্ডের অভিনেত্রী-শ্রেষ্ঠা, তাঁর ছেলে—এ পরিচয়ে হলো না। জর্জ জন সিডনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হলো স্বয়ং রাজাবাহাদুরকে। ১৮৩৩ সালের হিসেবমত এদেশে রাইটার হিসেবে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের গোত্রানুযায়ী ধরলে দেখা যায়—৩ জন মাত্র মধ্যবিত্ত সন্তান। বাদবাকীদের মধ্যে—২১ জন যাজক-পুত্র, ৪৬ জন উত্তরাধিকারীসূত্রে রাইটার অর্থাৎ রাইটার-পুত্র, ৭৮ জন কোম্পানীর সৈন্যবিভাগীয় হেন-তেনদের সন্তান, ১৪৬ জন ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্কার-তনয় ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়। এ দেশে ৯টি ব্যারন-পুত্র চাকরী করে গেছেন রাইটার হিসেবে। রাইটার হিসেবেই কলম পিষে গেছেন ১১টি এম. পি.র সন্তান! এণ্ড্রু রামসে ছিলেন অষ্টম আর্ল'অব ডালহৌসির পঞ্চম পুত্র। তিনিও চাকরীতে যোগ দিয়েছিলেন রাইটার হিসেবে। এমন কি তখনকার কালে। পার্লামেন্টের সদস্যপদের চেয়ে কোলকাতার রাইটারীও অভিপ্রেত ছিল ইংলণ্ডের অভিজাত মহলে। এমনি দু'চারটে ঘটনাও আছে কোলকাতার রাইটার-পুরাণে।

বলা বাহুল্য, অর্থের দিক থেকে কিংবা ব্যবসাবুদ্ধির বিচারে সেটা মূর্খতা হতো না। বিশেষ করে পার্লামেন্টের সিট যখন পয়সা খরচ করতে পারলে দুর্লভ নয়। হাউস অব কমন্স থেকে রাইটাররা তাই সোজা চলে আসতো কোল্‌কাতায় কিংবা মাদ্রাজে।

তারপর ক'বছর চাকরী করে আবার উঠে বসতো দেশমুখী জাহাজে। সঙ্গে থাকতো অর্থ, প্রতিপত্তি, অভিজ্ঞতা—এবং স্বভাবতই আভিজাত্যও। ম্যাকেলে এখানকার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যপদ গ্রহণ করে (১৮৩৩) বোনকে লিখেছিলেন—'দেখ, বছরে মাইনে পাই দশ হাজার পাউণ্ড। পাঁচ হাজার খরচ করলে বাদশার মতন থাকতে পারি এখানে। সুতরাং বুঝতেই পারছো আর পাঁচ হাজার পকেটে থাকবে। যদি ছ'বছর কাজ করি তবেই তো হয়ে গেল। আমি আশা করি ইংলণ্ডে যখন ফিরব আমি, তখন আমার বয়স হবে ৩৯ বছর, এবং পকেটে থাকবে দশ হাজার পাউণ্ড। এর চেয়ে বেশি অর্থ কোনদিন কি প্রত্যাশা করতে পারি আমি ?'

ম্যাকেলের মতো বড় চাকুরে না হলেও ফেরার সময় অধিকাংশের পকেটে থাকতো—প্রত্যাশার চেয়েও বেশী অর্থ। বলতে গেলে অস্বাভাবিক ধন-দৌলত। মানুষগুলোর পক্ষেও তাই সম্ভব হতো না স্বাভাবিক থাকা।

এই হঠাৎ-বড়মানুষগুলো, ইণ্ডিয়া-ফেরত রাইটারগুলোকে ওদেশে বলা হতো তখন—নবাব (Nabob)। আজ হরিপদ কেরানী আকবর বাদশা হওয়ার স্বপ্ন দেখে না, দেখলেও রগড়ে রগড়ে চোখ ধুয়ে ফেলে—কিন্তু সেদিন মিঃ অমুক লর্ড তমুক হওয়া নিয়ে মোটেই ভাবতেন না। ভাবতেন, অন্যতর বিষয় নিয়ে। Nabob in England বইয়ে তাঁদের অনেক কাহিনী আছে। তার একটি :—

"রিচার্ড স্মিথ একজন নবাব। ভারত থেকে ফিরে এসে সে একখানা বাগান-বাড়ির মালিক হয়েছে বার্কসায়ারে। তার গুটিকয় রেসের ঘোড়া আছে। নিজে সে জকি ক্লাবের সভ্য। জুয়াড়ী হিসাবে সে সারা শহরের আলোচ্য বস্তু। এমন দিনও গেছে যেদিন ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড হেরে গিয়েও সে পরম

বীরত্বে হেসেছে। একদিন সেণ্ট জেমস স্ট্রীটের এক হোটেলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে সটান শুয়ে পড়লো স্মিথ। উদ্দেশ্য ক্ষণিক বিশ্রাম। শোবার আগে বাট্‌লারকে বলে দিল—'দেখ, অন্তত হাজার তিন পাউণ্ড নিয়ে যদি কেউ একহাত খেলতে আসে তো কাল সকালে ডেকে দিও। নয়ত ডাকাডাকি করো না বাপু।' বুঝতেই পারছেন তাহলে এই নবাবটি কেমন বাহাদুর ছিলেন। এর পর রিচার্ড স্মিথের নজর পড়ল পার্লামেণ্টের দিকে। এতো তো হলো। নবাব জীবনের যা কাম্য সবই পেলাম দু'হাত ভরে। প্রভাব-প্রতিপত্তি, রেসের ঘোড়া, বাগানবাড়ি, মেয়েমানুষ সব। এটুকু আর অপূর্ণ রাখি কেন? বিশেষ করে কাঞ্চনমূল্যে যখন পাওয়া যায়। রিচার্ড স্মিথ হাত বাড়ালেন হাউস অব কমন্সের দিকে। মুঠো মুঠো রক্তমাখা টাকা সে হাতে। হেস্টিংসও তাই করেছিলেন। তাঁর এজেণ্ট বা সাগরেদ মেজর স্কটের জন্যে তিনিও একবার (১৭৮৪) সিট্ কিনেছিলেন একখানা। হাউস অব কমন্সের সিট। দাম—৪ হাজার পাউণ্ড।

রিচার্ড স্মিথও পেলেন। কিন্তু পুরনো অভ্যেস কাল হয়ে দাঁড়াল। ভারতবর্ষের যত্রতত্র হাত চালাতে দিলেই স্বদেশেও তা চালাতে হবে নাকি? ঘরে ইংরেজের সততা গঙ্গাতীরের সতীদের মতো। তারা হাত চেপে ধরলো স্মিথের। পরের বছরই করাপ্‌সানের দায়ে আসনচ্যুত হলেন বেচারা। শুধু তাই নয়, নগদ জরিমানা হয়ে গেল ৬৬৬ পাউণ্ড। তদুপরি ছ'মাসের কারাদণ্ড।

এসব গোলমাল, তারপর আছে পাওনাদারের আক্রমণ। ইংলণ্ডের মুদিরা তো আর ভারতবর্ষের মতো নয়। ওরা এসব ব্যাপারে একটু জোরে কথা বলে। পাঁচজনকে শুনিয়েই। বাধ্য হয়ে পলায়ন করলেন স্মিথ। কোথায়, কেউ জানা দরকার মনে করলো না এর পর। শেষ পর্যন্ত স্মিথের কি হলো? লেখক বললেন, স্মিথ পুনর্মূষিক হলেন।

অষ্টাদশ শতকের রাইটারের এই মোটামুটি জীবন। তবে এক কুলের জীবন। মুৎসুদ্দিদের জীবন ভিন্ন। একালের কেরানী-বাবুদের ভিন্নতর। নাই হলেন তাঁরা রিচার্ড স্মিথ। তবুও তো সান্ত্বনা একযুগে তাঁদেরই স্ব-গোত্র কোন এক হ্যারিপড কিং জর্জ হয়েছিল বার্কসায়ারে। ছিদাম মুদি লেনের হরিপদরা পুরুষানুক্রমে স্বপ্নই দেখে গেলো শুধু এই যা দুঃখ। তার চেয়েও বড় দুঃখ স্বপ্ন দেখার অধিকারটুকুও আজ নেই হরিপদর। সেই যে যুদ্ধের পর বেকার হয়েছিল, তারপর হরিপদ আর কেরানী হতে পারলো না আজও। হরিপদ আজও বেকার।

NGN
Rej

॥ চীনে পাড়ায় গৃহযুদ্ধ ॥

বেন্টিক স্ট্রীটের লিংফু কিংবা ছাতাওয়ালা গলির লিংচিকে আমি কদাপি ঝগড়া করতে দেখিনি, তা যুদ্ধ তো অনেক পরের কথা। এমন কি লিং-গিন্নি এবং মুকসেদ আলীর বেটির মধ্যে কলপাড়ে সামান্যতম বিতণ্ডাও আমার চোখে পড়েনি। কোলে-পিঠে গুটি তিনচার ছেলেমেয়েসহ কাঠের বালতি হাতে মিসেস লিংকে আমি বরাবর এক পাশে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখে আসছি। শুধু কলপাড়েই বা বলি কেন, এদের সঙ্গে ট্রামে-বাসেও আমার দেখা হয়, কিন্তু কোনদিন কথা হয় না। আমি তো সহযাত্রী মাত্র। এমন কি কণ্ডাক্টরের সঙ্গেও তাদের আমি বাক্যালাপ করতে দেখিনি। গুনে পয়সা দেয়, টিকিট নেয়। এমনভাবে পয়সাটি দেয় যে, আর খুচরো ফেরত নিতে হয় না। নিতে গেলেই পাছে কথা বলতে হয় এবং কথা বললে যদি বাক-বিনিময় এবং ক্রমে বাক-যুদ্ধ হয়, সেই আশঙ্কাতেই বোধ হয় এরা কোলকাতার ট্রামে মৌনযাত্রী। সুতরাং এহেন চীনেম্যানেরা গৃহযুদ্ধ করছে কোলকাতায়, এমন কথা মন কি সহসা মানতে রাজী হয়?

আমার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে বন্ধু বললেন—তাহোলে তো দেখি মহাচীনের গোটা ইতিহাসটাকেই আপনি বলতে চাইছেন মিথ্যে। আজকের চীনের নয়া শাসনটাকে আমেরিকানরা ভুয়ো বললেও তারাও কিন্তু আপনার মতো চীন-জাপান যুদ্ধটাকে মিথ্যে বলেনি; কিংবা অস্বীকার করেনি চীনের দীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধটাকে। ট্রামবাসে ঝগড়া করে না বলে—চীনারা যে লড়াইয়ে পরাঙ্মুখ এমন কথা নিউইয়র্কে বললে শুনতে পেতেন কি উত্তর দেয় ইস্টার্ণ ফ্রন্ট-ফেরত ছোকরারা। আসল কথা দরকারমত চীনারা

লড়াই করেছে এবং দরকার হোলে এখনও যে তারা অপরাগ নয়, সে কথাও তো তারা গোপন রাখেনি। নয় কি ?

বন্ধু ইতিহাসের ছাত্র। সুতরাং তার সঙ্গে ইতিহাসগত তর্ক তোলা বৃথা। তাছাড়া কোরিয়া সংবাদ কিংবা চীনা রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তৃতা-বিবৃতিও তো আমার অজানা থাকার কথা নয়। তবুও তর্ক তুলে বলি—সে না হয় হয়েছে। স্বদেশে কত কি-ই তো হয়। তাই বলে এই দূর বিদেশে—। ঘটনাটা ক্যান্টনে হোলে কথা ছিল না, এই বাংলা দেশে কিনা, তাই একটু সন্দেহ হচ্ছে ভাই।

আর এই বাংলা দেশে বলেই ডাটা (data) হিসেবে ঘটনাটা এতো মূল্যবান ঠেকছে আমার কাছে। গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন তিনি—জানেন তো ইতিহাসের গতি বাঁধা অছে সহস্র সূত্রে,—এ বিলিয়নস্ অব থ্রেডে। (এখানে বলে রাখা ভাল, আমার এই বন্ধুটি ইতিহাসের বামদর্শী পাঠক) এই আজকের চীনের যা পরিণতি দেখছেন তার সঙ্গে সামান্য হোলেও যোগ আছে কোলকাতার। কোলকাতার এই ঘটনাটি হচ্ছে তার একটি সূত্র, ইতিহাসের একটি খসা পাতা,—এ লস্ট ডাটা।

ক্ষীণ আপত্তি তুলে বললাম—খাস চীনকে আবার জড়াচ্ছেন কেন, এ তো সম্পুর্ণ কোলকাতার ঘটনা !

—কোন ঘটনাই সম্পূর্ণ কোলকাতার নয়, এটি তো নয়ই। এটি হচ্ছে চীনা জনগণের স্বাধীনতা-লড়াইয়ের তথা চীনা শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটি প্রাথমিক অধ্যায় এবং আলবৎ তাই।—বিশেষ জোরের সঙ্গেই সিদ্ধান্তে এলেন তিনি।

শ্রেণী-সংগ্রাম ! বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতে সঙ্ঘর্ষ !—সত্যি বলতে কি, এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি। খাস চীনের কথা জানিনে, কিন্তু কোলকাতার চীনাদের মধ্যে শ্রেণী আছে—এ কথা মেনে নেওয়া বড় কঠিন আমার পক্ষে। পরিচিত চীনাকেই আমি চিনে বার করতে পারিনে অন্যদের থেকে, বুর্জোয়া-

প্রলেতারিয়েত বাছা তো দূরের কথা। আমার কাছে চীনা মানে একটি 'জাতি'। এমন জাতি, যার চেহারা এক, পোষাক এক এবং ব্যবসা এক। সকলেরই সেই গোলগাল মুখ, মিটমিটে চোখ, সোনা-বাঁধানো দাঁত আর মুখ-লেপা হাসি। পার্ক স্ট্রীটের এয়ার কণ্ডিশানড্ রেস্তোরাঁ থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন কিংবা যিনি বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ফুটপাতে মোড়া পেতে 'আস্থন' 'আস্থন' বলে ডাকাডাকি করছেন—উভয়ে অভিন্ন বলেই আমার ধারণা। তারপর দেখুন ব্যবসার দিক। সকলের ব্যবসাই এক—বাণিজ্য। হয় জুতো সেলাই, নয় কাপড় ধোলাই অথবা রেস্টুরেণ্ট কিংবা আফিংয়ের চোরা কারবার। যখন যেটা ধরে একসঙ্গে ধরে, যখন ছাড়ে একসঙ্গে ছাড়ে। দাঁতের ব্যবসা ছেড়ে দিল সবাই একসঙ্গে। আজ কাপড় কাচার ব্যবসা ধরেছে তাও একসঙ্গে। এমন আঁট-সাঁট এদের জাতীয়তা। সত্যি বলতে কি, জাতীয়তার বিচারে এরা একটু কনজারভেটিভও বটে। এই কোলকাতার জল-হাওয়ায় আর্য-অনার্য, মোগল-দ্রাবিড়, ঈঙ্গ-বঙ্গ মিশে গুলে একাকার হয়ে গেল; কিন্তু চীনারা দেখুন আজও সেই চীনাই রয়ে গেল। তু'শো বছরের কোলকাতা-প্রবাস ওদের, অথচ সেই কাঠি দিয়েই খায়, তুলি দিয়ে লেখে, আলাদা কাগজ বার করে, স্কুল চালায়। চীন-ভারত মৈত্রীও করে, কিন্তু ভারতীয় নিয়ে ঘর করে না। আমরা দেখুন, ক্রমেই নিচ্ছি আর নিচ্ছি। জুতোর কাট, ঘুড়ির ছাঁট, এবং সর্বশেষ চীনে কোটে। উত্তরে ওরা কি করছে? শুধু সেই মিটমিট করে পুরনো হাসিই হাসছে। সুতরাং এমন সর্বৈব সংগঠিত জাতিতে গৃহযুদ্ধ তথা শ্রেণী-সংগ্রাম আমি অন্তত কল্পনা করতে নারাজ।

কিন্তু বন্ধুও নাছোড়বান্দা। তিনিও কিছুতেই এই ঘটনাটি ভুলে যেতে রাজী নন। এমন কি আমি এটি এড়িয়ে যাই তাও তিনি চান না। তারই চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও

ঘটনাটি বলতে হচ্ছে আমায়। এর সত্যতার দায় আমার,—অর্থাৎ ইতিহাসের। আর সিদ্ধান্তের দায়িত্ব পাঠকের। ১৭৮১ সালের কথা। ৫ই নভেম্বর তারিখে সহসা গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর পরিষদের নামে সারা কোলকাতা শহরে এক ঘোষণা প্রচারিত হোল। তার মর্মার্থ :

"মহামান্য গভর্নর জেনারেল এবং তাঁহার পরিষদ সমীপে আছু নামক জনৈক চীনাম্যানের অভিযোগক্রমে প্রকাশ এতদ্‌শহরস্থ দুষ্টবুদ্ধি চীনাগণ তার অধীনস্থ চীনা শ্রমিকদের নানাভাবে প্ররোচিত করিয়া ভাগাইয়া আনিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।...কোম্পানী বাহাদুর উক্ত চীনাম্যান এবং তৎস্থাপিত চীনা উপনগরীটিকে উৎসাহিত এবং পৃষ্ঠপোষণার্থে সর্ববিধ সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকা বিধায় এতদ্দ্বারা এই মর্মে সর্বসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যদি কেহ আছুর অধীনস্থ লোকেদের ভাগাইয়া আনে কিংবা তথায় কোন বিশৃঙ্খলার কারণ ঘটায় তবে তাহাদের সমুচিত শাস্তি বিধান করা হইবে। এতদ্‌প্রসঙ্গে ইহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, যদি কেহ আছুর অধীনস্থ লোকেদের আশ্রয় প্রদান করে কিংবা কোন কর্মে নিযুক্ত করে তবে তাহারাও যথাযোগ্য শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য থাকিবে। ইত্যাদি।"

এখন, কে এই আছু যার সাহায্যে স্বয়ং কোম্পানী বাহাদুর এগিয়ে এলেন কিংবা কি তার অভিযোগ, তা আমাদের একটু জানা দরকার।

আছু,—ওরফে টং আছু খাস চীনদেশের লোক। ভারতবর্ষ ছাড়া বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী সব দেশেই আছে, চীনদেশেও ছিল। আছু তাদেরই একজন। উনবিংশ শতকে ভাগ্যান্বেষীদের কাছে সব চাইতে সম্ভাবনাপূর্ণ দেশ ছিল—ভারতবর্ষ। এতদিন পশ্চিম থেকেই আসতো সবাই, আছু এল পূর্ব থেকে। চীন থেকে ভাগ্যান্বেষী আছু এলো ভারতবর্ষে,—কোলকাতায়। কোলকাতায়

তখন কোম্পানীর রাজত্বের পুরো মরসুম। পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গেছে। আলীনগরের স্বপ্নও শেষ। হেস্টিংস তোড়জোড় করে শাসনযন্ত্র চালু করার কাজে ব্যস্ত। এমন সময় আছু এলো। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কোনমতে কিছু হীরে জহরত নিয়ে দেশে ফেরা।

কিন্তু আর ঘরে ফেরা হলো না। বাংলাদেশকে পছন্দ হয়ে গেল আছুর! সাত-পাঁচ ভেবে দরখাস্ত করলো সে হেস্টিংস সায়েবের কাছে কিঞ্চিৎ জমি প্রার্থনা করে। বাংলাদেশের জমি, হেস্টিংসের তো আর পিতৃধন নয়। তিনি দরাজ হাতে তক্ষুণি দিয়ে দিলেন ৫৬০ বিঘা ফসলী জমি। খবর পেয়ে ছুটে এলেন বর্ধমান-রাজ।—প্রভু, এ জমিটুকু এই আজ্ঞাধীনের।

—ও, তাই নাকি। আচ্ছা, দেখবো।

হেস্টিংস ডেকে পাঠালেন আছুকে।—তোমাকে খাজনা দিতে হবে।

—কত?

—বছরে ৪৫৲ টাকা।

সানন্দে রাজী হয়ে গেল আছু। ৫৬০ বিঘা উর্বর জমির খাজনা বছরে ৪৫৲ টাকা! গররাজী হওয়ার কী আছে!

আছু উঠে এলো সে জমিতে। বজবজে। ঠিক বজবজে নয়, বজবজের ছ' মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সে জমি। চাষ হলো। আছুই উৎসাহ করে নিজ তত্ত্বাবধানে চাষ করালো জমিটা। তারপর বসালো কল—চিনির কারখানা।

কারখানা চালাতে লোক চাই। সস্তা লোক। আছু চলে গেল দেশে। ফিরে এলো এক জাহাজ চীনাম্যান নিয়ে।

—ও, বুঝেছি। বলে উঠলেন বন্ধু, ফিউড্যাল লর্ড, স্লেভ নিয়ে এসেছে।

আমি বললাম, ঠিক তা নয়। কেনা লোক নয়, চুক্তিবদ্ধ

শ্রমিক। চুক্তিমত নির্দিষ্ট কাল থাকতে হবে তার অধীনে। যাহোক, ক্রমে বজবজে এদের নিয়ে গড়ে উঠলো একটি চীনা-উপনিবেশ। আজকের কোলকাতার চীনেপাড়ার চেয়েও জমজমাট চীনাপল্লী। প্রতিষ্ঠাতা আছুর নামে নাম হলো তার—আছিপুর। আজও আছিপুর বলেই পরিচিত সেই গ্রামটি।

দিন চলে। একদিকে জমি অন্যদিকে কারখানা। ধীরে ধীরে আছু গণমান্য ধনপতি হয়ে উঠলো। কিন্তু সহসা দেখা দিল আর এক বিপদ। এতদিন কোলকাতায় চীনা বলতে ছিল—আছু একা। এবার দলে দলে শুরু হলো চীনাদের কোলকাতা অভিযান। আসা-যাওয়ার পথে কোলকাতা পড়লেই দু'চারজন করে চীনাম্যান নেবে থেকে যায় শহরে। তারাও ভাগ্যান্বেষী। কিন্তু সকলের ভাগ্য তো আর আছুর মতো নয়। ফলে হলো বিভ্রাট। তারা শুরু করলো আছুর উপর উৎপাত।—কেন? আছুর মতে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—'হিংসে'।

—'হ্যাভ এবং হ্যাভ-নটসদের মধ্যে সংঘর্ষের এটাকেই কারণ বলে বটে—বুর্জোয়া ইতিহাস।' আবার মন্তব্য করলেন বন্ধু।

যাহোক, আছু উপায়ান্তর না দেখে দরখাস্ত পাঠাল হেষ্টিংস সমীপে:

"মহামান্য গভর্নর বাহাদুর এবং অন্যান্য মহোদয়গণ,

আপনাদের উৎসাহক্রমে আমি বজবজের সন্নিকটস্থ অঞ্চলে যে ভূমিখণ্ডটুকু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং যাহা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আমি এ যাবৎ আবাদ করিয়া আসিতেছিলাম—সেই প্রসঙ্গে আমি পুনরায় আপনাদের বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার মনে হইতেছে, আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমার পক্ষে অধনীস্থ লোকজনকে আর কর্মে নিযুক্ত রাখা সম্ভবপর হইবে না। আপনাদের ইহা অবিদিত নাই, এই শ্রমিকদের আমি যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং এজন্য আমার অর্থব্যয়ও কম

হয় নাই। যাহা হউক, বর্তমানে আমার অভিযোগের লক্ষ্য হইতেছে কলিকাতাস্থ চীনা-সমাজ। এই সব চীনারা চীনা জাহাজসমূহ হইতে অবতরণপূর্বক বর্তমানে জীবিকাহীন ভবঘুরেরূপে অত্র শহরে অবস্থান করিতেছে। উহারাই হিংসা পরবশ হইয়া বর্তমানে আমার কার্যে নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা নানাভাবে আমার লোকেদের কর্মত্যাগে প্ররোচিত করিতেছে," ইত্যাদি ইত্যাদি।

—শুধু হিংসাবশে কোলকাতার চীনারা বজবজে গিয়ে গোলমাল করেছে, এ কথা কি মানতে হবে? প্রশ্ন করলেন বন্ধু।

—আগেই বলেছি মানা-না-মানা আপনাদের অভিরুচি। আমি শুধু এটুকু জানি—অতঃপর কোম্পানী আছুর সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

—আর অমনি মিটে গেল গোলমাল?

—তা জানা যায়নি। তবে যতদূর পর্যন্ত জানা গেছে তাতে দেখা যায়, এর তু'বছরের মধ্যেই ১৭৮৩ সালে আছু বজবজেই দেহরক্ষা করে। তারপরেও কিছুকাল অবশ্য যথারীতি চলেছিল তার আছিপুরের কারখানা। তার ওয়ারিশগণ অথবা কোলকাতার ভ্যাগাবণ্ডরা, কে তা চালিয়েছিল, তাও জানা যায়নি। ১৮০৪ সালের ১৫ই নভেম্বর বের হলো এক বিজ্ঞাপন:

"আছুর যাবতীয় ভূসম্পত্তি মায় চিনিকল এবং বাসগৃহসমূহ সমস্তই বিক্রি হবে।"

বিক্রি হয়েও গেল সব। কল-কারখানা, বাড়ি-জমি সব। কিন্তু লোকগুলো? আমার মনে হয়, তারাই আজকের কোলকাতার চীনা-সমাজের এক অংশ। আছিপুর ভেঙে গেলে চলে এলো তারা কোলকাতায়। এক সঙ্গে বসবাস শুরু করলো সেই ভবঘুরেদের সঙ্গে। পত্তন হলো কোলকাতার চীনা নগরীর। আছু তার বজবজ-বাসী জনক।

—আর আছিপুর ?

—অছিপুরে আজও আছে টং আছুর কবর : আর তারই প্রতিষ্ঠিত একটি চীনা-মন্দির। সে মন্দির বড় পবিত্র কোলকাতার চীনাদের কাছে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে তারা পূজো দিতে যায় সেখানে। আছিপুর তাদের তীর্থ-ভূমি। কোলকাতার চীনা-নগরীর পিতৃবাস। যে কোন চীনা সশ্রদ্ধায় মাতা নত করে আছিপুরের মাটিতে।

—কেন ? আছু যদি শত্রুই হবে তাদের, তবে দেড়শ' বছর ধরে কেন চলতে দেবে তারা এই প্রথা !

—দ্যাট ইজ ইস্টার্ন মিষ্টিসিজম—আরও গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন ইতিহাসের বন্ধু।

আমি বললাম, তা নয়, কৃতজ্ঞতা। উদ্যোগী পথপ্রদর্শকের প্রতি পরবর্তী অভিযাত্রীদের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা। আচ্ছা, সে না হয় বাদই দিচ্ছি। আপনার আমার কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হয় সেই ফিউড্যাল আছুর প্রতি।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললাম আমি।

কেন ? কেন ?—সবিস্ময়ে পেয়ালা থেকে মুখ তুললেন বন্ধু।

—ইতিহাস বলে : এই টং আছুই সর্বপ্রথম চা আমদানী করে এ দেশে।

॥ ঐতিহাসিক ভূত ॥

মহামান্য হেস্টিংস বাহাদুরের স্বনামধন্য ভূতটি যে এখনও বহাল তবিয়তে বর্তমান—এ সংবাদ পেলাম এসে আলীপুরে। আলীপুর হেস্টিংস হাউসে। শোনা যায়, এককালে এই প্রেতাত্মাটি তার পদমর্যাদা অনুযায়ী দেশে-বিদেশে যোগ্য খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। ফলে, কোলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ প্রেতাত্মা সমাজে তার প্রতিষ্ঠাও ছিল অনন্যসাধারণ,—লাটতুল্য। জীবিত বঙ্গ-সন্তানেরা অবশ্য এটা ধরেই নিয়েছিলেন যে, দুটো গীর্জে গড়ায় চাঁদা দিলেই নন্দকুমারের মতো ব্রহ্মহত্যার পাপ স্খালন হবে না। ব্রহ্মদৈত্য না হোক, নিদেন পক্ষে একটা যেমন-তেমন ভূত হোয়েও হেস্টিংসকে থেকে যেতে হবে এ দেশে। এমন কি বার্ক-সেরিডনের বক্তৃতার পর ইংরেজদের মনেও হেস্টিংসের আত্মার ভবিষ্যৎ শান্তি সম্পর্কে রীতিমত আশঙ্কা ছিল। তাই পরবর্তী কালে লর্ড কার্জনের মতো জাঁদরেল পুরুষও হেস্টিংস হাউসে বাস করতে গিয়ে জনশ্রুতিকে আস্কারা দিয়েছেন, আগ্রহভরে শুনেছেন প্রত্যক্ষদর্শী দ্বারপালদের বিবরণ। শুধু তাই নয়, বুদ্ধিবাদী (!) ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত এই পরলোকবাসী মাননীয় আত্মাটির নামে দু'চার ছত্র পিণ্ডদানে ইতস্ততঃ করেননি। বরং ইতিহাসের সূত্র ধরে এর একটা কার্যকারণ-সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় তাঁরা প্রাণপাত করেছেন। কটন সাহেব তাঁর কোলকাতার ইতিহাসে লিখেছেন: (জনশ্রুতি মতে) দুপুর রাতে বাড়ির সংলগ্ন বনপথকে মথিত করে একখানা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে থামে হেস্টিংস হাউসের গাড়ী-বারান্দায়। খটাং করে দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামেন হেস্টিংস। অর্থাৎ মহামান্য ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের ভূত,

—তাঁর পবিত্র প্রেতাত্মা। তারপর শুরু হয় ছুটাছুটি। একবার এদিক, একবার ওদিক। এই ঘর, ওঘর। হেস্টিংস উন্মাদের মতো হাতড়ে ফেরেন একটা বাক্স। একটা কালো কাঠের বাক্স। তার মধ্যে নাকি আছে তাঁর সর্বস্ব, তাঁর প্রাণ-ভোমরা।

ঐতিহাসিক অমনি এগিয়ে এলেন যুক্তি নিয়েঃ হতে পারে। অসম্ভব নয়। খুবই সম্ভব হেস্টিংসের পক্ষে ঐ বাক্সটার সন্ধান করা। Gleigয়ের লেখা হেস্টিংসের জীবনীতে দেখুন, অমুক পৃষ্ঠায় এই হারানো রত্নের জন্যে আক্ষেপ করে হেস্টিংসের লেখা একখানা চিঠি কোট করা আছে। শুধু তাই নয়; আরও প্রাণপাত করে ঐতিহাসিক আবার আবিষ্কার করলেনঃ ১৭৮৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরের ক্যালকাটা গেজেটের হারান-প্রাপ্তি কলমে এই মর্মে একখানা বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন—জি. জি. অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল। তাঁর একটি কাঠের হাতবাক্স হারিয়ে গেছে। ঐ বাক্সে ছিল অমূল্য ধন। কি ধন?—না, খানকয় দলিল আর দুটো মিনিয়েচার ছবি।

কিসের দলিল? কার ছবি?

আজকের হেস্টিংস হাউসের মেয়ে বোর্ডাররা মনে মনে যথেষ্ট ভয় রেখেও মুচকি হাসে; এ ওর দিকে আড়চোখে তাকায়। একজন বলে—আমরা কি জানি ছাই?—এই মেয়েটিকে নাকি 'বিট্রে' করেছিলেন হেস্টিংস।

ভূতটি তাহোলে পেত্নী,—অর্থাৎ নারী ভূত?—জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম আমার নিকট-পরিচিত একটি মেয়েকে।

যে মেয়েরা দেখেছে তারা তো তাই বলে। উত্তর দিলেন তিনি।

—আর দারোয়ানেরা কি বলে শুনি?—মাঝে পড়ে জিজ্ঞাসা করে বসলেন আমার স্ত্রী।

—ওরা অবশ্য ভূতটিকে সাহেব বলেই বলে থাকে।

ব্যাস্, আর বলতে হবে না।—হেসে বললেন স্ত্রী। তারপর

বিমূঢ় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর পরও কি তোমার বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা হলো না? তা হোলে আর হতে হবে না। আমি আজই লিখে দিচ্ছি মাকে—ওকে ওখান থেকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্যে।' ইত্যাদি।

এমনি সব আমার ভূত। হেস্টিংস থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ডাঃ জে. জি. ভস্ কেউ ধোপে টেঁকে না। নিজের বুদ্ধি ঘায়েল হলেও স্ত্রীর বুদ্ধির আলোকে দিব্যি জট খুলে যায়, পাকা লিখিয়ের নোট বইয়ের মতো অল্পেই ব্যাখ্যা হয়ে যায়। অবশ্য দ্রষ্টব্য: ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ঐ ঐতিহাসিক ভূতটিও প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় ওখানে একটি মেয়েদের হোস্টেল (Ellerton Home) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর।

মিথ্যে বলব না, ভূতদের আমি যথেষ্ট সমীহ করি, কিন্তু তবুও মনে মনে কেমন জানি একটা আক্ষেপ থেকে গেল—স্বচক্ষে তেনাদের কারুর দর্শন পেলাম না বলে। অর্থাৎ ক্ষিদে আছে কিন্তু খাবার ইচ্ছে নেই—ইতিহাসের ভূত ঘেঁটে ঘেঁটে এমনি আমার মানসিক অবস্থা। কত ভূতকাহিনী পড়লাম—পান্তভূত, জ্যান্ত ভূত, পেত্নী, ব্রহ্মদৈত্য, কবন্ধ, কেউ বাদ নেই। রাষ্ট্রনায়কের ভূত, সমাজ-নায়িকার ভূত, শিল্পীর ভূত, দেশী ভূত, বিদেশী ভূত—কিন্তু সব ছাপার হরফে। মা বলতেন—'খাঁ-খাঁ দুপুর, উষা-ভোর আর তিন সন্ধ্যা এই হচ্ছে ওদের আনাগোনার সময়। এ সময়ে এ বয়সে মাঠে-ঘাটে একা একা যেতে নেই, দাওয়ায় চুল মেলে শুয়ে থাকতে নেই—ইত্যাদি।' বলতেন অবশ্য দিদিকে কিন্তু উপলক্ষে আমিও যে না ছিলাম তাও বলতে পারি না। তাই আজব নগরী দেখতে একা-একাই ঘুরতাম, বিশেষ করে ঐ নিষিদ্ধ কালগুলোই ছিল আমার ঘুরবার সময় এবং ঘুরতাম মাঠে ঘাটে নয়,—কবরখানায় কবরখানায়!—কিন্তু মিথ্যা। কোথাও পেলাম না ধর্মতলা স্ট্রীটে অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক নিহত মিসেস কুপারের প্রেতাত্মাকে

পেলাম না সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মিঃ শেক্সপিয়রের মৃত পিতাকে। হেস্টিংস সহ গোটা কাউন্সিল নাকি এক সঙ্গে দেখেছিলেন এই ভদ্রলোকের প্রেতাত্মাকে। শোনা যায়, হেস্টিংসের আদেশে কাউন্সিলের খাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে সে ভূত-দর্শনের কাহিনী।

যাক, অবশেষে স্থির করলাম বৃহস্পতিবারের ছুপুরে ঘুরতে হবে। ছু'সপ্তাহ পরেই বুঝতে পারলাম আমার ভুল হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার নয়, কোলকাতার ইতিহাসে প্রেত-সিদ্ধ বার হচ্ছে শনিবার। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই আমায় জানালেন এ কথা। নিখুঁত তালিকা তৈরী করে রেখেছেন তাঁরা কোলকাতার ইতিহাসে শনিবারের কৃতিত্ব সম্পর্কে। তাতে দেখা যায়, নন্দকুমার অভিযুক্ত হন—শনিবারে, তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় শনিবারে, ফাঁসি হয় শনিবারে। ক্লেভারিং এবং মনসনের মৃত্যু—শনিবারে এবং ভাদ্র মাসের শনিবারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতোটা খেয়াল ছিল না সেদিন। একটা সদ্য সন্ধান-পাওয়া কবরের সন্ধানে ঢুকেছি সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানায়। ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। চারিদিক নিস্তব্ধ। কা-কা করে এক ঝাঁক কাক একরাশ ঢিলের মত পড়লো এসে দূরের গাছটায়। পরমুহূর্তেই এক সঙ্গে আর্তনাদ করে আবার ছিটকে পড়ল আকাশের গায়ে। গাছটা যেন বিছুটি হয়ে উঠেছে ওদের কাছে। কেন জানিনে সাহসা ছম্‌ছম্ করে উঠলো গা-টা। মনে পড়লো আজ শনিবার। আরও মনে পড়লো মাসটা ভাদ্র এবং সময়টা তিন-সন্ধ্যা। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা আমার সামর্থ্যের বাইরে। পাছে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত 'দর্শন' আজ ঘটে যায়—সেই আশঙ্কাতে পা বাড়ালাম বড় পথটির দিকে। কিন্তু একি ?

সাদায় কালোতে মেশানো কি একটা বস্তুপিণ্ড যেন নড়েচড়ে উঠলো সেই গাছটার পাশেই, বাঁ-হাতি বড় কবরটার গা ঘেঁষে।

ভালো করে দেখতে না দেখতে একরাশ শুকনো পাতা মাড়িয়ে বেরিয়ে এলো সেই দীর্ঘকায় পুরুষমূর্তি। হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে। পাশ কাটাতে গিয়েও হোঁচট খেলাম। কোন মতে গলায় জোর এনে বললাম—আপ্—

—জী, ইখানেই থাকি। পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল সেই সশরীরী অশরীরী। কত লম্বা হবে তার দেহটি বলতে পারবো না। উপরের দিকে তাকানোর মতো সাহস অবশিষ্ট ছিল না আমার কলজেতে। অনাবৃত রুক্ষ সরু পা দু'খানার গায়ে লোমগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বললাম—এখানে মানে?

—হ-ই কব্বরখানায়!—একটা বিড়ি হবে?

বার করে দিলাম একটা সিগারেট। কালো একখানা জোব্বার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা নোংরা কর্কশ হাত। অস্পষ্ট অন্ধকারেও সে-হাতের চেটোখানাকে মনে হলো আমার অত্যন্ত ফ্যাকাশে, গাঁটগুলো বেশি মোটা। লোকটা হাতে রাখল সিগারেট। ধরাল না।

—তোমায় ইদিকে মাঝে মধ্যি দেখি। আবার কথা বললো সেই কণ্ঠ। পায়ের তলায় যেন শিকড় গজিয়ে গেছে আমার। জুতো ফুঁড়ে এই কঙ্করাস্তীর্ণ রাস্তা ফুঁড়ে সে শিকড় যেন নেমে গেছে পাতালে। কারা টানাটানি করছে নীচে থেকে, সহস্র সহস্র কবরের নীচে থেকে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত হাত। তবুও বললাম—হ্যাঁ, আসতে হয় মাঝে মাঝে।

—তা আলবৎ আসবা। লেখাপড়ার কাম যখন—আসতি তো হবেই। সহসা একটু থেমে বললো—কব্বর লিয়া, এত লিখন, তা মুইগো কথা লেখ না কেনে?

সেরেছে! এ তো দেখি সবই জানে। অলক্ষ্যে থেকে নিশ্চয়ই নিয়মিতভাবে দেখেছে আমার আনাগোনা, ফোটো তোলা—সব।

আর গোপন করা ঠিক নয়। বললাম—এবার নিশ্চয়ই লিখব আপনাদের নিয়ে।

—আর লিখে কি অইব! মুইগো নসিব ফতে হইয়া গেছেন লবাবের সাথে। আশ্বাসের পরিবর্তে রীতিমত আক্ষেপ ওর নাকি-নাকি কণ্ঠস্বরে। প্রমাদ গুনলাম আমি। তবুও বললাম—কোন্ নবাব?

—ক্যা? ঝাঁজিয়ে উঠলো সেই অজ্ঞাতলোকের পুরুষ—মুর্শিদাবাদের লবাববাড়ির নাতিগো। লবাব কইলকাত্তায় আইলেন আমরাও আইলাম। আমার বাপজানের বাপ, নানা ছিলেন বড় ফৌজি! বাপও কম না। বাপ্ বাপ্, কি লড়াই! সাহেব মেমসাইব—দুইটা পলাইল ফলতামুখী। আমাগো ডেরা পড়ল লালদীঘির কোণে।

বলার শক্তি তখন আর নেই আমার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি! সে বলে গেল—ডেরা তোমার হোগলার। তাও মন্দ কি! কিন্তু খোদাতাল্লা নারাজ। কয় রোজ বাদেই ফিন্ ফিরি আইলো সায়েব-সুবারা। নানা গাইব হইয়ে গেলান। বাপজান তখন নাবালক। তারপর কে কি অইল—খোদাতলাই জানে। মুই এখন ইখানে।

—কেন? তোমাদের বাড়ি?

—মুইগো ফিন্ ঘরবাড়ি!—বিদঘুটে হেসে উঠলো লোকটা।—ক্যান, কাগজে পড়নি? সায়েবরাইতো লিখেছিল—লাটের ল্যেইগ্যা মুইগো বাড়ি লিয়া লিছে।

—তাই নাকি? এবার ভয়ের স্থান অধিকার করেছে আমার বিস্ময়। কবে, কোন্ কাগজে বেরিয়েছে সে কথা!

মনে মনে বিড় বিড় করে কি যেন হিসেব করলো সে। তারপর বললো—দু'কুড়ি এক বছর। কি কাগজে কে জানে হুনছি সাহেবদের কাগ্জেই।

বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। ও পেছনে আমি সামনে কিংবা পাশাপাশি। সহসা

ক্যাঁচ্ করে একটা আর্তনাদ হলো সামনের রেলিংটায়। পেছনে তাকিয়ে দেখি, কেউ নেই। আমার সামনে পড়ে আছে চিরকালের সেই আধাখোলা কবরখানার ভাঙা গেটটি আর পার্ক স্ট্রীট। ছুটে এক লাফে পা দিলাম রাস্তায়। পেছন ফিরে তাকালাম না একবারের জন্যও। মা বলতেন, 'যদি কখনও মনে হয়, 'কেউ' আছে সঙ্গে, পেছন তাকাতে নেই তখন।'

পেহনে আর তাকাইনি। কিন্তু তখনও মনে ছিল আমার নাকী সুরের সেই হিসেবটি—'ছ'কুড়ি এক বছর। ইংরেজি কাগজ।' অনুমান করলাম কাগজটি স্টেট্সম্যান হতে পারে। প্রেতাত্মাদের হিসেবে ভুল হয় না। তাই নিয়ে বসলাম ছ'কুড়ি এক বছর আগেকার জরাজীর্ণ স্টেট্সম্যান কাগজের ফাইল। ওকে যাচাই করতে হবে আমার। হতেও পারেতো নেহাত চোখের ভুল কিংবা মনের ভ্রান্তি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি—দিনের পর দিন ১৯১৫ সালের স্টেট্ম্যানের পাতা, কিন্তু কোথাও নেই ওর বাড়ির কথা, ওর বাপজান কিংবা নানার কথা। নিরাশ হয়ে উঠেছি। সুউচ্চ ফাইল ক্রমে ক্ষীণতনু হয়ে আসছে। আর ক'মাসের কাগজপত্র দেখতে বাকী। কে জানতো সেদিন প্রশস্ত দিনের আলোতে পাখার নীচে বসে সজ্ঞানে আবার ঘামতে হবে আমায়! ১৯১৫ সনের ২৭শে অক্টোবর তারিখের স্টেট্সম্যানের বিবর্ণ পাতায় প্রতিটি কথা অতি স্পষ্টভাবে দিব্যি পড়া যায় আজও ঃ

কোলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটের পুরনো রয়েল এক্সচেঞ্জের ভিত খুঁড়তে গিয়ে সম্প্রতি একটি কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। জিনিসগুলো হচ্ছে ছখানা কুয়ো। গভীরতায় ওগুলো প্রায় কুড়ি ফুট। অনুমান করা হচ্ছে এগুলো প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো। এই স্থানটিতে এককালে একটি বস্তী ছিল। পরে অবশ্য এখানকার বাড়িটিতে যথাক্রমে হেস্টিংস এবং ক্লাইভ বাস করে গেছেন।

অতঃপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ভাদ্রমাসের শনিবারের সন্ধ্যায় ওই অলৌকিক মনুষ্যদেহীটিকে কে কিংবা কি এর পর জানতে বাকী থাকার কথা নয় আমার। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে আজও তা রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে আমার কাছে। এমন কি আমার গিন্নিও এ ব্যাপারে নির্বাক।

তারপর বেশ ক'দিন পরের কথা। একটা দরকারী কাজে ওপথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। কাজের মনেই যাচ্ছিলাম। স্বভাব-বশতঃই একবার এমনি তাকালাম কবরখানাটির দিকে। গেটের গোড়ায়—এককালের কবর-অফিসের বারান্দায় একটা শ্বেতপাথরের টুকরোতে লঙ্কা বাটছিল একটা লোক উপুড় হয়ে। বোধ হয় কবরখানার দারোয়ানদের কেউ। খসে যাওয়া কোন কবর-ফলককে বাটনা-বাটার উপকরণ করে নিয়েছে। সহসা এক হাতে জোব্বার হাতা টেনে উপরে তুলে দিলে লোকটি। আশ্চর্য, সেই শীর্ণ ফ্যাকাশে হাত, মোটা মোটা কুঁচির মতো লোম—অনেকটা সেদিনের সেই লোকটির মতো। সেদিন ওর মুখের দিকে আমি তাকাইনি—আজও, দিনের বেলাতেও সাহস হলো না এর মুখের দিকে তাকাবার। এক লাফে ছুটে গিয়ে উঠলাম—ওদিকের ফুটপাথে। তারপর একেবারে সোজা গন্তব্যস্থানে।

তবে কি সে আদৌ প্রেতাত্মা ছিল না? না কি—সেই প্রেতাত্মাই আজ আবার আমায় ধরতে চেয়েছিল এমনি মিথ্যা বাটনা-বাটার ভান করে? এমনও তো হতে পারে, যাকে আমি দেখেছিলাম সে বাস্তবিকই ছিল প্রেতাত্মা, আর আজ যাকে দেখলাম—সে মানুষ। হয়তো সেই অশরীরীরই কোন নিকট আত্মীয়, হয়তো তার ছেলে কিংবা নাতি। বাপ-ঠাকুরদার জমিতে লাটের বাড়ির জায়গা দিয়ে আজ এই সব খুদে লাটদের কবর পাহারা দেয়, তাদের পরিত্যক্ত কবরে সংসার করে, কবর-ফলককে লঙ্কা বাটে।

॥ মূর্তি চোর ॥

উড স্ট্রীট। আজকের পাঁচমিশালী চৌরঙ্গী এলাকা নয়, তৎকালীন বিশুদ্ধ সাহেবপাড়া। ঝকঝকে তকতকে বিরাট বিরাট বাড়ী। ছায়াচ্ছন্ন আঙ্গিনা, সুন্দর সাজানো-গোছানো বাগান। তখনও সূর্য ওঠেনি। মাত্র কাক-ডাকা ভোর উড স্ট্রীটে। ঘোড়-সওয়ার, পদাতিক, ফিটন, টমটম, ল্যাণ্ডো কিছুই বের হয়নি এখনও রাস্তায়। এমন কি বাড়ির খিদমদগার সরকার পাইক দারোয়ানদের নিত্যকর্মের সময় পর্যন্ত হয়নি এখনও। আগে-পাছে যতদূর দেখা যায়, তেজীয়ান ঘোড়ার মতো ছিমছাম বাড়িগুলো তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

তা ঝিমুক, ইচ্ছে হয় যত বেশী ঘুমোক। গামছা কাঁধে গাড়ু হাতে নিঃশব্দে পথে নামলেন একজন। বাড়ির দ্বারবান নয়, স্বয়ং মালিক। স্বভাবতই ইউরোপীয়ান,—সাহেব। উড স্ট্রীটের কোন এক বাড়ি থেকে গামছা কাঁধে কোলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে পা বাড়ালেন একজন সাহেব। গুন গুন করতে করতে হন হন করে চলেছেন তিনি। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। নেটিভ হলে বলা যেত বৃদ্ধ,—কিন্তু তাঁর হাঁটার ভঙ্গী দেখে বড়জোর বলা চলে—বর্ষীয়ান কিংবা প্রবীণ। সাহেবের মুখে—বিরামহীন গুন গুন। কান পাতলে শোনা যাবে, এ দেশের জল-হাওয়ার বিরুদ্ধে ককনীতে গালাগালি নয়, এমন কি নয় গতকল্য রাত্রির অপেরার কোন গানের ভগ্নাংশ—গঙ্গা-স্তব করছেন তিনি। শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত স্তব।

গঙ্গা-স্তব করতে করতে আপনমনে চলেছেন সাহেব। এ পাড়ার চৌহদ্দি ছাড়াতে না ছাড়াতেই সহসা দু'দিক থেকে তাঁকে

ঘিরে ধরল এক ঝাঁক মানুষ। যেন সারারাত্রি অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল ওরা। চারদিক থেকে এগিয়ে এলো অসংখ্য কালো কালো শীর্ণ হাত।

—সাহেব বকশিশ! সাহেব গুড মর্নিং! সাহেব বকশিশ!!

আশ্চর্য ধমকে উঠলো না সাহেব, তেড়ে গেলো না গাড্ডু হাতে। স্মিতহাস্যে হাতে হাতে দিয়ে গেলো পয়সা। একে পিঠে চাপড়ে, তাকে ধমক দিয়ে, ও ছেলেটার কানটা একটু হাল্কা হাতে মলে দিয়ে—'গুড মর্নিং' বলতে বলতেই সহসা হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলো সোজা গঙ্গার দিকে। যাঃ বড্ড দেরী হয়ে গেলো বোধহয় আজ।

ভিখারীর দল তখন পয়সা গুনছে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে চৌরঙ্গী-পাড়ার অন্য সাহেব-মেমরা তামাসা দেখছিল এতক্ষণ। সাহেব চোখের আড়াল হতেই এক সঙ্গে 'তোবা তোবা' করে উঠলো সবাই। প্রতিদিনই তাই করে তারা। মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট খাস সাহেবদের প্রতিক্ষণের লজ্জা।

'Quite a character'—মন্তব্য করেছেন তৎকালীন প্রধান সেনাপতির স্ত্রী লেডি ন্যুজেণ্ট। "An Idol Stealer"—লিখেছেন জনৈক ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী। অবশ্য সেই সঙ্গে এও বলেছেন—মতটা তাঁর ব্যক্তিগত নয়, ভারতবর্ষের লোকেরা প্রকাশ্যেই তা বলে থাকে স্টুয়ার্টকে।

ভারতবর্ষের লোকেরা কিছু মনে করলে বলে না, গোপনে যদিই বা বলে কাউকে তবুও কদাপি কাগজে কলমে লেখে না—তাই আজ দেড়শ' বছর পর তারা কি বলতো না বলতো প্রমাণ করা দুষ্কর। তবে স্টুয়ার্টের মৃত্যুর পর কোলকাতার ইণ্ডিয়ান গেজেটে তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাসূচক মন্তব্য লেখা হয়েছিল।

যাক সে কথা। মিশনারীরাই তাঁকে অবশ্য আখ্যা দিয়েছেন—

'মূর্তি-চোর'। অবশ্য 'চোর' ঠিক নয়।—এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকাতে লিখেছেন ডাঃ এল. ডি. বার্নেট ঃ "তবে এটা ঠিক, ভারতীয় রীতি-পদ্ধতি এবং মূর্তি ইত্যাদির প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ বশতঃ তিনি কুখ্যাত ছিলেন।···বিশেষ করে পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি যে অশোভন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তাই তাঁর এই বদনামের কারণ।"

—"বদনাম কি আর বলতে! মুখ রক্ষা দায় হয়ে উঠেছে এখন"—ভুবনেশ্বর থেকে লিখেছেন লেঃ কিটো। কতকগুলো ইন্‌স্ক্রিপ্‌শান সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। কিছুদিন যেতেই তিনি লিখলেন ঃ "মন্দিরের পুরোহিতেরা যারপরনাই দুর্ব্যবহার শুরু করেছে আমার সঙ্গে। তারা বলে এর আগে এমনি এসব দেখতে আসার নাম করে তথাকথিত প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনেক জিনিস গায়েব করে ফেলেছে ওদের। সম্প্রতি তারা আমায় আনন্দ বাসুদেবের মন্দিরের দুখানা ইন্‌স্ক্রিপশানের শূন্য জায়গাগুলো দেখিয়ে বলেছে, জনৈক কর্নেল সাহেব নাকি সেগুলো সরিয়ে ফেলেছেন।"

কিটোর চিঠি পেয়ে খোঁজ পড়ল। এশিয়াটিক সোসাইটিকে যাঁরা নানা জায়গা থেকে নানা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে উপহার দিয়েছেন তার মধ্য থেকে বের হলো আনন্দ বাসুদেব মন্দিরের অপহৃত লিপি। দাতার নাম ঃ জেনারেল চার্লস্ স্টুয়ার্ট।

প্রিন্সেপ তখন এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তা। তাঁর আদেশে জিনিসগুলো তৎক্ষণাৎ ফেরত গেলো যথাস্থানে। হাতে-নাতে ধরা পড়ার জন্য স্টুয়ার্ট তখন বেঁচে নেই। সুতরাং তাঁর বক্তব্যও জানবার সুযোগ হলো না আমাদের।

ফলে মিশনারীরা যথারীতি 'মূর্তি-চোর'-ই সাব্যস্ত করলেন তাঁকে। যাঁরা অপেক্ষাকৃত উদার তাঁরা বললেন ঃ চোর বলা ঠিক নয়! ধরুন, তাঁর কোন মূর্তি পছন্দ হয় গেল অথচ তাঁর কেনবার

মতো পয়সা নেই। সেক্ষেত্রে তিনি জোর করেই কেড়ে আনতেন তা। অর্থাৎ চোর নয়, ডাকাত। যারা আরও যুক্তিবান আরও মুক্ত-দৃষ্টি তাঁরা বলেন—থাক থাক, বিগত মানুষকে নিয়ে এত ঘেঁটে আর কি লাভ। স্যার ইভান কটন লিখেছেনঃ এ তো সবাই জানে এদেশে দীর্ঘকাল থাকলে মাথা ঠিক থাকে না। Prolonged residence in India sometimes resulted in eccentricity. জানেন না, ছত্রিশ বছর এদেশে বাস করার পর হুগলীর জন হোম ১৫,১০০৲ টাকা রেখে গিয়েছিলেন চাকরদের হাতে তাঁর প্রিয় "খুশী খাঁ"র ভরণ-পোষণের জন্য। "খুশী খাঁ" ছিল সাহেবের খচ্চরটির নাম। কেমন করে তার খাবার তৈরী করতে হবে, কি ভাবে তা পরিবেশন করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর উইলে। শুধু এঁর কথাই বা বলি কেন? লক্ষ্ণৌর লেঃ কঃ চার্লস ডেনটি—তিনিও তো তাই। সহসা একদিন বলে বসলেন—কুছ খায়েগা নেহি। নেহী তো নেহী। জোর করেও এক টুকরো রুটি-মাখন দেওয়া গেল না তাঁর মুখে। না খেয়ে তিলে তিলে মরলেন বেচারা। সুতরাং স্টুয়ার্টের আর দোষ কি? বেচারা কতদিন ছিল এদেশে তাও ভাবতে হয় কিনা!

অর্থাৎ মিশনারীদের প্রমাণে স্টুয়ার্ট, মূর্তি-চোর, আর ইভান কটনের যুক্তিতে স্টুয়ার্ট উন্মাদ। হয় চোর না হয় উন্মাদ। কিংবা চোর এবং উন্মাদ উভয়ই।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই ভারতবর্ষে এত লোভনীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও স্টুয়ার্ট সাহেব পাথরের মূর্তি কিংবা তালপাতার পুথিকেই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য স্থির করলেন কেন? আমরা জানি গায়ে সোনার অলঙ্কার না থাকলেও পাথরের মূর্তিতেও পয়সা হয়। কিন্তু পয়সার জন্যে স্টুয়ার্ট তা করেন নি। তিনি তো দান করেছিলেন। তবে?

দ্বিতীয়ত, স্টুয়ার্টও লক্ষ্ণৌর সেই সাহেবের মতো উন্মাদ হতে

পারেন একথা সত্য। তেমনি এও অসত্য নয় যে, স্টুয়ার্ট উন্মাদরূপে এদেশে আসেননি। তা'হলে তাঁর চাকরি হত না। চাকরি হলেও পদোন্নতি হত না। তাই স্টুয়ার্ট সাহেব যথার্থ ই উন্মাদ কিনা সে কথা বিচার করার আগে আমাদের শোনা দরকার 'সুস্থ' স্টুয়ার্টের জীবন-কাহিনী।

ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন সৈনিক। কোম্পানীর ফৌজের একজন পদস্থ অফিসার। মেজর জেনারেল। সাগরে সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি দীর্ঘকাল। তারপর ওখান থেকে আসেন বহরমপুরে (উড়িষ্যা) এবং অবশেষে কোলকাতা। শোনা যায়, সাগরে থাকা কালে তিনি বিয়ে করেন একটি হিন্দু মেয়েকে এবং ওখানে একখানা হিন্দু মন্দির গড়েন নিজ অর্থে। বহরমপুরে স্টুয়ার্ট সম্পর্কে শোনা যায়,—তিনি নিত্য নিয়মিত মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেন, নিজে গঙ্গা পূজা করেন।

এরপর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে উঠে এলেন তিনি কোলকাতায়। উড্ স্ট্রীটে। কোলকাতায় স্টুয়ার্টকে আমরা আগেই দেখেছি। রোজ পায়ে হেঁটে তিনি যান গঙ্গার ঘাটে! গঙ্গাস্নান করেন। তারপর বাড়ি ফিরে এসে ঢোকেন তাঁর মিউজিয়মে।

মিউজিয়ম মানে—স্টুয়ার্টের গোটা বাড়িটাই তখন মিউজিয়ম। ভারতীয় ছবি, মূর্তি, পুঁথি-পত্র, ঢাল-তলোয়ার, পোষাক-অলঙ্কার কোন কিছুর কমতি নেই সেখানে। মাঝে মাঝে কৌতূহলী দর্শকেরা আসে। স্টুয়ার্ট নিজে ঘুরে ঘুরে তাদের সব দেখান। কোন্‌টা কত মূল্যবান এবং কেন, কোন্‌টির কি বৈশিষ্ট্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে তা বুঝিয়ে দেন। দর্শকেরা তাঁর কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসে। তবে স্টুয়ার্টের সংগ্রহের চেয়ে স্টুয়ার্টকেই দেখতে আসে। স্টুয়ার্ট তা বোঝেন না, বোঝা দরকার মনে করেন না। নিজে যদি বাড়ি না থাকেন চাকর-বাকরদের কড়া হুকুম দিয়ে যান—দর্শকেরা যাতে ফিরে না যায়!

কিন্তু এ একদিক মাত্র। শুধু মিউজিয়ম গড়লেই লোক উন্মাদ হয় না। সংস্কৃত বললেও না। তা হলে জোন্স, উইলসন সাহেবদেরও পাগল বলতো সাধারণ ইংরেজরা। স্টুয়ার্টের 'উন্মাদ' অপবাদের ছিল অন্য কারণ। স্টুয়ার্ট ছিলেন—হিন্দু। গঙ্গাস্নান করতেন কিংবা মন্দিরে পূজা দিতেন বলে নয় (সময় গতিকে অনেক সাহেবই তা দিয়েছেন), হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছেন বলেও নয় (কারণ তাতে সাহেবদের অরুচি ছিল বলে শোনা যায়নি), স্টুয়ার্টের অপরাধ ছিল—তিনি বাস্তবিকই হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ তিনি এমন উৎসাহভরে এদেশের ভাষা রীতিনীতি চর্চা করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি তিনি এমন সহানুভূতিশীল ছিলেন যে, সবাই তাঁকে 'হিন্দু স্টুয়ার্ট' বলে ডাকত।

অর্থাৎ হিন্দু ধর্মকে, হিন্দুস্থানের মানুষকে জানতে গিয়ে, তাদের ভালবেসে ফেলেছিলেন স্টুয়ার্ট। তাদের সংস্কার, কুসংস্কার ভাল-মন্দ কিছুকেই বাদ দিয়ে ছিল না তাঁর এই ভালবাসা। তাই নেটিভদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে চলতেন তিনি, গলাগলি ঢলাঢলি করতেন, দাতব্য করে বেড়াতেন।

কাজটি তথাকথিত সুস্থদের পক্ষে ভাবাও সম্ভব হতো না তাই স্টুয়ার্ট ছিলেন তাদের কাছে অসুস্থ-উন্মাদ। এমনকি নেটিভরাও হয়তো বলতো তাঁকে—পাগলা সাহেব। কারণ পাগল ছাড়া কার পক্ষে সম্ভব, সাহেব হয়েও এবম্বিধ জীবন?

তাই স্টুয়ার্ট যেদিন বিগত হলেন (৩১ মার্চ, ১৮২৮) সেদিন চৌরঙ্গী পাড়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও, গলা ফাটিয়ে কেঁদেছিল কোলকাতার এক শ্রেণীর মানুষ। তারা নেটিভ। কোলকাতার দরিদ্র মানুষের তিনিই ছিলেন একমাত্র চৌরঙ্গীবাসী বান্ধব। প্রতিদিন শত শত লোক খেতে পেত তাঁর অর্থে। পাগলা সাহেবের বিয়োগে তাই তারা কেঁদেছিল। সেই কান্নার রেশ আজও পাওয়া

যায় ইণ্ডিয়া গেজেটের (৭ই এপ্রিল, ১৮২৮) পাতায়। জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক তাতে লিখেছেন—"এদেশের জনসাধারণের কাছে স্টুয়ার্ট ছিলেন জনপ্রিয় মানুষ। 'জনপ্রিয়' বললে কম বলা হলো। এদেশের মানুষ ভালোবাসতো তাঁকে। কারণ দরিদ্রের প্রতি দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। আমরা শুনেছি বছরের পর বছর প্রতি দিন একশ' দরিদ্রকে খাইয়েছেন তিনি নিজের খরচে।"

সোনার দেশ লুটতে এসে—পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করে ?

যা হোক, স্ব-জাতির ব্যঙ্গ এবং নেটিভের ভালোবাসার মধ্যে বৃদ্ধ স্টুয়ার্ট চলে গেলেন। ইচ্ছে ছিল তাঁর স্বদেশের মাটিতে মরবার। কিন্তু এদেশ ধরে রাখলো তাঁকে। হয়ত বিস্মৃত হয়ে যেতেন একদিন। এদেশ এবং ওদেশ ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় একদিন হয়ত বাস্তবিক ভুলে যেত তাঁর কথা। কিন্তু তা হলো না। ঘটনাচক্রে এমন হলো, শুধু এদেশ নয়, ইংলণ্ডও ভুলতে পারলো না তাঁকে। কারণ ইংরেজের রাজভাণ্ডারে না হলেও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে স্টুয়ার্ট রেখে গেছেন—একরাশ অমূল্য সম্পদ। এ খবরটাও জানিয়েছেন একজন নেটিভ। স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ। ১৯৩৪ সালের কথা। পণ্ডিতপ্রবর চন্দ মশাই লণ্ডনে গেছেন অ্যানথ্রপলজিক্যাল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য। ওখানে থাকাকালে বৃটিশ মিউজিয়মে কতকগুলো ভাস্কর্য-নিদর্শন ঘাঁটতে গিয়ে তিনি পুনরাবিষ্কার করলেন স্টুয়ার্টকে।

সংগ্রহটি পরিচিত 'ব্রীজ কালেকশান' নামে। কিন্তু ক্যাটালগ ঘাঁটতে বের হলো এর আদি মালিক টি. ডব্লউ. ব্রিজ নন, মেজর স্টুয়ার্ট। ১৮৩০ সালে নীলামে বিক্রি হয়েছে এগুলো। বহরমপুরে থাকাকালে (১৮২৩) স্টুয়ার্ট নিজেও এই সংগ্রহটির কথা উল্লেখ

করে গেছেন তাঁর উইলে। তিনি উইলে বলে গিয়েছিলেন—তাঁর পুরাতত্ত্বের সংগ্রহটি যেন ৩০,০০০৲ টাকা ইন্সিওর করে লণ্ডনে পাঠানো হয়। তা ছাড়া আরও লিখেছেন: 'লণ্ডনের বণ্ড স্ট্রীটের, মিঃ জন নামক পুস্তক-বিক্রেতার কাছে আমার একখানা বিরাট পুঁথির লাইব্রেরী এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় পুরাবস্তুর সংগ্রহ রয়েছে। দরকার হলে সেগুলো যেন বিক্রি করা হয়।'

বই-পত্রগুলোর ভাগ্যে কি হয়েছিল জানা যায় নি। মিঃ ব্রিজ কিনেছিলেন ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলো। ১৮৭২ সালে ব্রিজের কন্যারা আবার নীলামে তোলেন এই সংগ্রহ। খরিদ্দার এলেন মাত্র একজন। বিক্রি করলেন না তাঁরা। দান করেছিলেন পিতার নামে বৃটিশ মিউজিয়মকে। স্টুয়ার্টের মিউজিয়ম এখন বৃটিশ মিউজিয়মের সম্পদ। তার নাম "ব্রিজ কালেকশান"।

ব্রিজ সাহেব অর্থের বিনিময়ে কিনেছিলেন স্টুয়ার্টের সম্পত্তি, সুতরাং এতে আপত্তির কিছু নেই। অবশ্য স্টুয়ার্ট এগুলো হাত করেছিলেন—অর্থ, চাতুর্য, শক্তি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে। কিন্তু কেন? তিনি আমাদের চিনবেন এবং ওদের কাছে চেনাবেন বলে?

সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানায় স্টুয়ার্টের সমাধিটির সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথাটিই বার বার মনে হচ্ছিল আমার। স্টুয়ার্ট বোধ হয় তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে ভারতবর্ষকে চেনাতে চেয়েছিলেন তাঁর স্ব-জাতির কাছে। তাঁর জীবনের মতোই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা সমাধি-মন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে এখানে। হিন্দু মন্দিরের গড়ন। হিন্দু দেবদেবী, পৃথ্বীদেবী, মকরবাহিনী গঙ্গার অলঙ্করণ। এগুলোও নাকি তাঁর চৌরঙ্গী মিউজিয়মের ধন। তাঁরই আদেশে স্থান পেয়েছে এখানে। জীবনের সত্যটাকে মরার পরও যাতে মিথ্যে করে না দিতে পারে

তারই জন্য বোধ হয় তাঁর এতো চেষ্টা। কিন্তু যে চোর চুরি করা ধনেও এমন সদম্ভ ঘোষণা রেখে যেতে পারে প্রকাশ্যে—সে কি চোর না ডাকাত!

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ সন্তান হিসেবে স্টুয়ার্ট যে সাহসের পরিচয় দিয়ে গেছেন এই কোলকাতায়, তাতে তাঁকে 'ডাকাত' বললেও বোধ হয় কম বলা হয়ে গেল।

॥ দুই বীরের গল্প ॥

তখনও অন্ধকার কাটেনি। মাত্র সাড়ে চারটা। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ফ্রান্সিস। কি জানি কি হবে। সঙ্গী ওয়াটসনও নির্বাক, হয়ত বা বিমূঢ়ও। এই দূর বিদেশে বিভূঁয়ে কি করতে চলেছেন তাঁরা!

কা-কা করে কাক ডাকছে। পূর্বদিকে ফরসা হয়ে উঠেছে। ঝাপসা দেখা যাচ্ছে এতো কাছের আলীপুর ব্রিজ। ফ্রান্সিস পায়চারি করছেন। হয়ত ভাবছেন, কেন এমন হলো? কেন এ পথে পা বাড়াতে হলো তাঁকে? পরক্ষণেই অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন রক্ত আবার চাড়া দিয়ে উঠলো মাথায়। না, যেমন করে হোক, শেষ ঘটাতে হবে এর। এখনও কানে বাজছে কথাগুলো।

—I must now assume a plainer style and louder tone. I judge his public conduct by my experience of his private, which I have to be void of truth and honour.

—Yes, I too—দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন ফ্রান্সিস। তারপর তাকালেন রাস্তার দিকে। কেউ নেই, কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। আগস্টের এই ভোরে কার দরকার পথে বেরুবার? ওয়াটসন চুপ করেই ছিলেন এতক্ষণ। ওয়ান, টু, থ্রি বলে লম্বা পা ফেলে ফেলে সহসা এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।—ফোরটিন্।—বাস, থাম। আর যেতে হবে না। চেঁচিয়ে উঠলো ফ্রান্সিস। চোদ্দ পা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অ্যাডাম আর ফক্স। বিদেশ বলেই কি আর নয়া কানুন হবে?

ওয়াটসন থামলেন। খট্ খট্ করে পাতলা অন্ধকারকে চিরে

থামলো এসে একখানা গাড়ি। বড় রাস্তার ওপরে। লাফ দিয়ে নামলেন—একজন। তারপর আরও একজন। ফ্রান্সিস বললেন—এতো দেরী, ছ'টা যে বাজে।

ছ'টা নয়, সাড়ে পাঁচটা—ঘড়ি দেখে উত্তর দিল পিয়ার্স। ওয়াটসনের মতো সেও এসেছে সঙ্গী হয়ে। আজকের নাটকের সে দর্শক।

—দূর, এ কি জায়গা পছন্দ করেছ! অন্ধকার, চারদিকে ঝোপ-ঝাড়। তার চেয়ে বরং চল ওদিকটায়। বড় রাস্তার ধারে। কিন্তু—। আবার থামলেন বক্তা;—কিন্তু লোকজন যদি এসে পড়ে। নেটিভদের তিনি গণ্য করেন না। ওরা মুখে কাপড় গুঁজে হাসলো কি কাঁদলো—তা নিয়ে তিনি ভাবেন না। কিন্তু ইউরোপীয়ান, খাঁটি বৃটন! যদি এসে পড়ে কেউ! বিশেষতঃ আগস্টের এমনি সকাল তাদের ঘোড়া চড়ার সময়। তাই আর একটু সরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু ভালো শুকনো জমিই স্থির হলো। আবার মাপা হলো দূরত্ব! ওয়াটসন আর পিয়ার্স নির্দিষ্ট করে দিলেন দু'জনের ব্যবধানটুকু।

'চোদ্দ পা। চোদ্দ পা-ই রীতি'—ওয়াটসন বললেন। বেশী দূর হয়ে যায় নাকি? তার চেয়ে বরং—যাক সে—। তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন দু'জন। দু'জন মানে ওয়ারেন হেস্টিংস আর ফিলিপ ফ্রান্সিস। ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল আর তাঁর পরিষদের অন্যতম প্রধান সদস্য! মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন দু'জন আলীপুর ব্রিজের ওপারেই—রাস্তার ধারে। সেদিন ১৭৮০ সালের ১৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার। সঙ্গী দুইজনের দুই সহকারী—ওয়াটসন আর পিয়ার্স। আর সাক্ষী দু'টো গাছ। অশ্বত্থ বৃক্ষ। দু'জনের হাতেই পিস্তল। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডুয়েল হচ্ছে গভর্ণর জেনারেল আর তাঁর পরিষদ-সদস্যের মধ্যে। দ্বৈরথ। ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক সব সমস্যার যথাযথ মীমাংসার একমাত্র বীরত্বপূর্ণ

পন্থা। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে অনেক হয়েছে। এমন কি হয়েছে দূর কলোনীতে—এই কোলকাতায়ও বছর পাঁচেক আগে। বজবজের পথে। কন্যার পাণিপ্রার্থী বারওয়েলের সঙ্গে এমনি করেই লড়েছিলেন ক্লেভারিং। থাক্ সে কথা।

পিস্তল লক্ষ্য করলেন দু'জন। কিন্তু ফ্রান্সিসের পিস্তল নির্বাক। উদ্ধত হাত নামিয়ে নিলেন হেস্টিংস। বললেন—আবার গুলি ভরে নাও। বীরত্বে কোন ফাঁক রাখতে চান না তিনি। বিশেষতঃ দু'জন সাক্ষী দেওয়ার মতো মানুষ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে পাশেই।

ওয়াটসন ঠিক করে দিলেন ফ্রান্সিসের পিস্তল। আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দু'জন। পিয়ার্স বলে গেলেনঃ রেডি,—ওয়ান—টু—থ্রি। একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো দু'টো পিস্তল। অনেক দিনের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী বেলভেডিয়ারে প্রতিহত হয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে অবশেষে শব্দটা মিলিয়ে গেল ভোরের ধূসর আকাশে।

——I—am—killed,—am killed—বলে মাটিতে পড়ে গেলেন ফ্রান্সিস। ওয়াটসন ছুটে গিয়েছেন। Good God, I hope not—বলে ছুটে এলেন হেস্টিংস। ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে একফালি কাপড় নিয়ে এলেন পিয়ার্স। আহত ফিলিপ ফ্রান্সিসকে বয়ে নিয়ে আসা হলো—বেলভেডিয়ারে।

বাড়ি ফিরে এসেই হেস্টিংস চিঠি লিখতে বসলেন স্ত্রীকে। স্ত্রী তখন চিনসুরায়। ডাচ গভর্ণরের অতিথি। হেস্টিংস লিখে গেলেনঃ

প্রিয়তম মার্লিন,

স্যার জন ডে-কে (তখনকার অ্যাডভোকেট জেনারেল) অনুরোধ করেছি তিনি যেন তোমাকে জানান—আজ সকালে মিঃ ফ্রান্সিসের সঙ্গে একহাত হয়ে গেছে আমার। বুকের একপাশে গুলি লেগেছে।...আমার মনে হয় তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়। সে এখন বেলভেডিয়ারে। ডাঃ ক্যাম্বেল চিকিৎসক এবং ফ্রান্সিস

এই নামের অন্য একজন দু'জনেই তার কাছে আছেন। আমি অক্ষত এবং সুস্থ আছি। ইত্যাদি।···

বিচারপতি ইম্পেও স্বদেশে চিঠি লিখলেন একখানা। তারপর সব চুপচাপ। আবার সেই পরিষদ, সেই হেস্টিংস।

এক মাসের মধ্যে ভালো হয়ে উঠলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। সেপ্টেম্বরের ১১ই তারিখে পরাজয়ের সব ধুলো ঝেড়ে ফেলে আবার কাউন্সিলে এসে হাজির হলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন সভাপতি স্বয়ং হেস্টিংস। প্রত্যভিবাদন জানালেন ফ্রান্সিস। ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন—Great civility between Hastings and me.

অবশ্য এ সমস্তই মৌখিক সম্প্রীতি, সাধারণ সৌজন্য বিনিময়। দু'জনের আদি সম্পর্ক রয়ে গেল অপরিবর্তিতই। ডিসেম্বর মাসে চিরকালের জন্য জাহাজে চাপলেন ফ্রান্সিস। ভারতবর্ষের ইতিহাস ইচ্ছামত দু'হাতে দুমড়ে মুচড়ে গড়লেন—একা হেস্টিংস। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ন্যায়-নীতির অতীত দুর্ধর্ষ শাসক হেস্টিংস। সেই হেস্টিংসের হাজার পাতার জীবনীতে ১৭৮০ সালের ১৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবারের সেই উত্তেজনাপূর্ণ ভোর কতখানি, কে জানে?

হয়ত অনেকখানি। কিন্তু আজকের আলীপুরের বাসিন্দারা তার সংবাদ রাখে না। নেহাত এই ব্যক্তিগত ঘটনার সংবাদ রাখার কথাও নয় আজকের কোলকাতার মানুষের। তাই দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো, ক্রমে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যাও। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলাম না ডাঃ বাডস্ট্রীডের নির্দেশিত সেই লড়াই-ক্ষেত্রটি। বাডস্ট্রীড লিখেছেন—৫নং আলীপুর রোডের উত্তর সীমানার কাছাকাছি সেই স্মৃতির সাক্ষী। বীরত্বেরও হতে পারে, লজ্জারও হতে পারে। বেলভেডিয়ার আলীপুর রোড সব চেনা, কিন্তু পাঁচ নম্বর? খুঁজে পেলাম বটে, কিন্তু মনে হলো না লড়াই করার মতো স্থান। চারিদিকে রাস্তা—অগণিত গাড়ি, বাস, রিক্সা,

মানুষ। তাছাড়া কোথায় সেই গাছ? আলীপুরের কুটিরবাসী মানুষ হয়তো সেই কলঙ্কচিহ্ন দু'টোকে ছাই করে দিয়েছে।

অগত্যা তাই ডাঃ বাডস্ট্রিডকে ছেড়ে শ্মরণ নিতে হলো কর্পোরেশানের গাইডকে।—ডুয়েল অ্যাভিন্যু। স্টানডেল রোড দিয়ে বেলভেডিয়ারমুখী পা চালালেই দু' পা পরেই হাওয়া-অফিসের পাশ দিয়ে চলে গেছে একটি রাস্তা। ছায়াচ্ছন্ন পরিষ্কার তক্‌তকে পথ, অ্যাভিন্যু। হয়ত বা এই সেই স্থান। হয়ত বা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সোয়া দু'শ বছর আগে এখানেই শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুটি সভ্য রাজপুরুষ। গাছপালা অবশ্যই আছে—কিন্তু সে গাছ এরা নয়। সুতরাং সাক্ষীর প্রশ্ন ওঠে না। হোক বা না হোক, জায়গাটা যে এর কাছাকাছি ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটু এদিক কিংবা সেদিক। এই যা। মনে মনে পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়ালাম রাস্তায়। ইতিহাস ভুলে গেলেও, মানুষের স্মৃতি নির্বাক হয়ে গেলেও, এই এক ফালি পথ আজও দাঁড়িয়ে আছে ভোরের লজ্জাকে ছায়ায় ঢেকে। একটি নিঃসঙ্গ পথ। একান্ত নির্জনে, একান্ত অধোবদনে। হেস্টিংস বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন মনে মনে। তিনি যে বিজয়ী ছিলেন!

বেচারা ফ্রান্সিস! এই দ্বৈরথ সংগ্রামের কাহিনী না জানলেও ইতিহাসের পাঠক জানেন—অপঘাতে মৃত্যু হওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস। রাজনৈতিক মতামতে তিনি হেস্টিংসয়ের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন মাত্র। এ ঘটনার আগের দিন রাত্রে ইংলণ্ডে এক বন্ধুর কাছে তিনি লিখেছিলেন—He knows best, you know better on what principle I have acted. মারাঠা যুদ্ধ নিয়ে তাঁর মতদ্বৈধ ছিল হেস্টিংসের সঙ্গে, ছিল হেস্টিংসের যথেচ্ছাচার নিয়েও। এগুলোই কি শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলো—এমনি চরম সিদ্ধান্তের দিকে, অথবা—

অথবা,—কেউ কেউ বলেন, কারণ ব্যক্তিগত। রাজনৈতিক নয়। দুষ্টগ্রহ পিছনে লেগেছে এঁদের তারও বহু আগে ১৭৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর। চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ভিড়ল একখানা। সদলবলে অবতরণ করলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস আর নবগঠিত সুপ্রিম কোর্টের বিচারকমণ্ডলী। যা রীতি—অদূরেই কেল্লা থেকে গর্জন করে উঠলো তোপ। তোপের পর তোপ। মনে মনে গুণে গেলেন ফ্রান্সিস। মাত্র ১৭ বার আওয়াজ হলো। তিনি আশা করেছিলেন অন্ততঃ ১৯ বার হবে। হেস্টিংসের সমান। মেজাজ বিগড়ে গেল। এই যে একবার বিগড়ালো, পরের ছ' বছরে তা ক্রমে ক্রমে আরও খারাপ ছাড়া ভালো হলো না আর। কিন্তু তাই বলে—পিস্তল হাতে,—হয়ত বা এই-ই তার কারণ। হয়ত নয়। কেউ কেউ এমনও বলেন, কারণ আরও গভীরে, কোন অলক্ষ্য সূত্রে, কোন অন্দরে। কারণ—হৃদয়গত। 'They exchanged fire in the days when European woman were few ; jealousy often gave rise to these affairs of honour.' অর্থাৎ ডুয়েলের কারণটি নারীঘটিত। হেস্টিংস প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। দু'টো বিয়ে—অথবা দু'জন স্ত্রী ছিল তাঁর, দু'বাড়িতে। ফিলিপ ফ্রান্সিসও কম ছিলেন না। গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতেই মই বেয়ে তাঁর বাড়িতে উঠে তাঁর স্ত্রী, বিশ্বখ্যাত মিসেস গ্রাণ্ডের 'শ্লীলতাহানি'র অপরাধে পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা গুণে দিতে হয়েছিল তাঁকে জরিমানাস্বরূপ। এই কোলকাতা শহরেই। সুতরাং অসম্ভব কি?

তবে এ কারণটি আমি রিফর্মারি রোডের বৃদ্ধ সিপাহীজীকে বলিনি। তাহলে লজ্জায়, দুঃখে বেচারা কেঁদে ফেলতেন কিনা কে জানে! পুরানো লাটবাহাদুরের গল্প শুনে—খুব আগ্রহভরে পথ-ঘাট সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই।

॥ একটি তারকার গল্প ॥

এগিয়ে চললাম। কবরের ভিড় ঠেলে যেন চলেছি। লোয়ার সাকু'লার রোড সিমেট্রিও যেন আস্ত একখানা কবরের বন। রাশি রাশি কবর। প্রতিদিনই দু'চারখানা করে যোগ হচ্ছে আজও। ইতিমধ্যেই খ্যাত-অখ্যাত, অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত মানুষের রীতিমত ভীড় জমে উঠেছে এখানে। যতদূর চোখ যায় এক আকাশের নীচে একমাঠ মানুষ। কোনমতে গা ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আছে যেন। অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। কিন্তু ভালো করে তাকাতে না তাকাতেই ভদ্র হয়ে উঠলো ভীড়টা। পরাজিত সৈনিকের মতো সার বেঁধে মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো কবরগুলো। কতো কবর, কত মানুষ! দু'চার ছত্রের লিপিতে স্নেহ মায়া মমতা এবং দুঃখ প্রকাশের কি আকুল চেষ্টা! যত্ন করে পড়লে তবে জানা যায় কে কিংবা কি এরা! কি এদের নাম, কিবা পরিচয়! পুরুষ অথবা নারী, শিশু কিংবা বয়োবৃদ্ধ! নয়ত সবাই এক—মানুষ এবং মৃত।

নামী যাঁরা দামী পাথর তাঁদের বুকজোড়া। আজও, পঞ্চাশ কিংবা একশ' বছর পরেও বরাদ্দকৃত অর্থের বিনিময়ে মালী নিত্য ফুল জোগায় তাঁদের কবরে। গোছা গোছা রজনীগন্ধা, নয়ত কচুরীপানা। যাদের কেউ নেই, তাদের ওপরে বুনো ঘাসের জঙ্গল। উপরের হাল্কা পাথরের ভাঙা আস্তরণের নীচে হাঁ হয়ে আছে তাদের আত্মা একটুখানি স্নেহদৃষ্টির জন্যে।

গাইড তাড়া দিলে—চলিয়ে, চলিয়ে।

চললাম। আমার প্রার্থিত নামটি শুনে থমকে দাঁড়ালো বেচারা। কত নাম! (আর স্বভাবতই) কি সব বিদ্‌ঘুটে নাম! কত মনে

রাখতে পারে একজন! দু'চারজন ভাগ্যবান যাঁদের কবরে বছরে একবারের জন্য হলেও সমাগম হয় বহুজনের, তাঁদের ওরা চেনে। নাম না জানলেও কবরটি ঠিক চিনে রাখে। কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে বলে, এটা কি? যদি না হয়, তবে ওটা, তা না হলে নিশ্চয় সেটা। এটা-ওটা-সেটার পর গোটা তিন-চারেকও যখন হলো না আমার, তখন অনন্যোপায় হয়েই—'তব আপ দেখিয়ে' বলে সরে পড়লো বেচারা।

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, একশো বছরেরও আগেকার ব্যাপার যখন, তখন বুঝতেই পারছেন একটু সময় দিতে হবে স্যার। যদি থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই পাবেন। কবর না থাকলেও কোথায় ছিল, তার লোকেশানটা অন্তত—

অতঃপর বাধ্য হয়ে নামতে হলো নিজেকেই। আবার কবর। সেই কবরের অরণ্য। আমার ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে সারি সারি কবর। শত শত, হাজার হাজার কবর। তারি মধ্যে আমি খুঁজে ফিরছি একশো বছরেরও আগেকার একজন অভিনেত্রীকে।

আশ্চর্য! একশো বছর আগে এর বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যায় নিশ্চয় ভীড় লেগে থাকতো ফ্যান্‌দের। সিবিলিয়ান-মিলিটারী কর্তা-ব্যক্তিদের পাল্কী আর জুড়িগাড়ির ভীড়। ৯৭নং তালতলা বোধ হয় তখন মহানগরীর তীর্থ। আর আজ? আজকের লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর একজন লোকও সন্ধান রাখে না কোথায় কোন্ নির্জনে পড়ে আছে এর অবশেষ!

অবশেষে পেয়ে গেলাম। আমি যেন ম্যাডিলিনকে একেবারে মুখোমুখি পেয়ে গেলাম। এ পাওয়ার আনন্দ বলে বোঝানো দায়। আমি সিনেমা-বিরাগী নই, তবে সিনেমা-উন্মাদও নই। উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল-নির্বিশেষ তারকারা আমার কাছে মাটির মানুষ-ই। কারও স্ত্রী কন্যা অথবা বোন মাত্র। তাই তাদের তথাকথিত ক্রিকেট

খেলা দেখার জন্যে আমি কোনদিন টিকেটের সারিতে দাঁড়াইনি। দূরবীন কষে দর্শনলাভের কৃতার্থ হাসি হাসিনি। গাড়ির নম্বর কিংবা বাড়ির ঠিকানার জন্যে সিনেমাপত্রের সম্পাদক সমীপে বিনীত চিঠিও লিখিনি। অথচ সেই আমি-ই সেদিন কোন বিগত অভিনেত্রীর কবরকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম।

কবর নয়তো—একখণ্ড পাথর। অত্যন্ত সাদাসিধে দীনহীন চেহারা। বহুকালের অবজ্ঞায় নিতান্ত জীর্ণ। লোয়ার সার্কুলার রোড সিমেট্রির দীনতম কবরটির সঙ্গেও বুঝি তুলনা চলে না এর। সেই শেওলা-ধরা পাথরটির গায়ে অতি সংক্ষেপে এবং ভীষণ গদ্যে লেখা দুটো ছত্র :—

"*SACRED TO THE MEMORY*

OF

MARIA MADELINE TYLOR

who died on 13th May, 1841

AGED — 27 YEARS."

শুধু নামটুকু। কার স্ত্রী, কার কন্যা, কি পেশা কিছু নয়। কেউ প্রয়োজন মনে করেননি সে কথা এই পাথরের টুকরোটির গায়ে লিখে রাখার। কিন্তু পরিচয়-লিপিতে সে কথা উহ্য থাকলেও এই ২৭ বছরের মেয়েটির নামে সরগরম সমকালীন কোলকাতার ইতিহাস। মারিয়া ম্যাডেলিন টেলর ওরফে মাদাম দারমেনভিল তখন সারা কোলকাতার প্রিয়তম নায়িকা।

টেলরদের আদিবাস অস্ট্রেলিয়ায়। সিডনীতে। শোনা যায় তাঁর কালের সবচেয়ে নামজাদা অভিনেত্রী ছিলেন তিনি সেখানে। যেমন তাঁর চেহারা, তেমনি অভিনয়। তদুপরি কণ্ঠস্বরেও ছিলেন তিনি অদ্বিতীয়া। সারা সিডনী শহর তাই তাঁর অভিনয়ের রাত্রে ভেঙে পড়তো রঙ্গমঞ্চের দরজায়।

এমনি করে কেটে গেল ছ'বছর। জনপ্রিয়তার শীর্ষে মিসেস্

টেলর। নাচেন, গান, অভিনয় করেন। হয়ত এমনি করেই চলে যেতো আরও কিছুকাল, হয়ত চিরদিন। কিন্তু তা সম্ভব হলো না।

বিপত্তি বাধালেন নিজেরই স্বামী মিঃ টেলর। অপদার্থ বেকার কর্মহীন মানুষ। একমাত্র সম্পত্তি তাঁর মারিয়া। স্ত্রীর জনপ্রিয়তা আর রোজগারের ছত্রছায়ায় দিব্যি নিরুপদ্রব দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। তাতে এখনকার মতো তখনকার দিনেও পৌরুষ খুব বিচলিত হতো এমন নয়। মিঃ টেলর অন্ততঃ তাতে কোন হীনমন্যতা অনুভব করতেন না। কিন্তু মুস্কিল হলো এই ভদ্রলোক অন্য কোন কাজ না করলেও একটি কাজ করেছিলেন। অতি যত্নে স্ত্রীকে তিনি পরিণত করেছিলেন প্রথম শ্রেণীর মদ্যপে। ফলাফল হিসেবে পরবর্তী কালে দেখা গেল মারিয়া হারিয়েছেন তাঁর কোকিল-কণ্ঠ, আর মিঃ টেলর তাঁর স্ত্রী।

স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন কণ্ঠে ভর করলেন অথবা নতুন ভূত নিজঘাড়ে চাপালেন মিসেস টেলর। ভদ্রলোকের নাম ক্যাপ্টেন পিরে লারগেট বা লারগেটিউ। যথাসময়ে দু'জনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে উদ্যোগী হলেন মিসেস টেলর বা মিসেস লারগেট। উভয়ের মতেই অতঃপর আর অস্ট্রেলিয়া বাস নিতান্ত অনুচিত। কিন্তু যাওয়াই বা যায় কোথায়? এক যাওয়া চলে—পূর্বদেশে। নতুন ইংরেজ উপনিবেশ—ভারতবর্ষে—কোলকাতায়। সারা পশ্চিমের হতচ্ছাড়া ঘরতাড়ানোদের এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য দেশ আর কোথায়? তা ছাড়া কোলকাতার আকাশ তখনও নিঃসীম নীল। সন্ধ্যার নির্মল আকাশে দু'একটি তারকা চোখে পড়ে বটে কিন্তু তারা নিতান্ত অনুজ্জ্বল। ভূতপূর্ব অভিনেত্রী মিসেস লারগেটিউ তাই কোলকাতার কথা পাড়লেন।

আপত্তি করলেন না পিরে লারগেটিউও। কোলকাতার রূপকথা তাঁর কাছেও অবিদিত নয়। নিজ কানে তিনিও

শুনেছেন—রাইটারেরা ওদেশে মুঠোমুঠো সোনা ছড়ায় দু'হাত ভরে ; ফ্যাক্টরেরা হীরে। এমন কি সাব-অলটার্ণদের পকেটে পকেটেও নাকি রাশি রাশি কোহিনূর! সুতরাং কোলকাতা যাত্রাই সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু পাথেয়?

ক্যাপ্টেন বললেন, সে ভার আমার।

ভদ্রলোকের নামের আগে একটা ক্যাপ্টেন পদবী থাকলেও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কোন যোগ ছিল না তাঁর। তিনি ছিলেন জেলে নৌ-বহরের কাপ্তেন। তাঁর অধীনে একখানা জাহাজ ছিল। গোপনে গোপনে সেটি বিক্রি করে দিলেন। তার পর তার চেয়েও গোপনে, অতি সন্তর্পণে পাড়ি জমালেন কোলকাতায়।

নবদম্পতি কোলকাতায় এলেন। অনাহুত হয়েই এলেন। অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মিসেস টেলর আর তাঁর বর্তমান স্বামী পের লারগেটিউ। কোলকাতার মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই বড়মানুষীতে পেয়ে বসল লারগেটিউকে। তিনি 'ব্যারণ' সাজলেন। অতঃপর তাঁর নাম হয়ে গেল হেনরী দারমেনভিল। বাড়ি নিলেন পার্ক স্ট্রীটে। একটা ফ্ল্যাট নয়, আস্ত একখানা বাড়ি!

পার্ক স্ট্রীট তখন জমজমাট। চৌরঙ্গী থিয়েটার উঠে গিয়ে নতুন থিয়েটার সাঁ সুঁসির উদ্বোধন হয়েছে এখানে। দেখতে শুনতে সে মঞ্চ যেমন তেমনি তার অভিনয়-খ্যাতি। মিসেস টেলর ওরফে মাদাম দারমেনভিল সেখানে কাজ জুটিয়ে নিতে চাইলেন। স্থায়ী কাজ। প্রত্যাশা হিসাবে তাঁর পক্ষে সেটা অতিরিক্ত কিছু ছিল না! কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়ালেন মিসেস লিচ্। মিসেস এস্থার লিচ্। লিচ সাঁ সুঁসির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এক-কালের মালিকও। সাঁ সুঁসির প্রাণ তিনি। আজকের সিনেমা-রসিকদের কাছে তিনিও অবশ্য বিগতস্মৃতি। কিন্তু তাঁর জীবন-কাহিনীও কম রোমাঞ্চকর নয়। বিশেষ করে কোলকাতার আদি নাট্য-আন্দলনে এস্থার লিচ্ এমন একটি নাম, যাকে বাদ দিয়ে

যে কোন কাহিনীই অসমাপ্ত থেকে যেতে বাধ্য। মিসেস টেলরের কাহিনী তো বটেই।

লিচ্ এতদ্দেশীয় জনৈক বৃটিশ সৈনিক-কন্যা। অভিনেত্রী-জীবনের শুরু তাঁর দমদমে ; আর শেষ নিজহাতে গড়া সাঁ স্যুঁসির কক্ষে। তাঁর মৃত্যু-কাহিনীও এক করুণ কাহিনী। অপ্রাসঙ্গিক হলেও, তার উল্লেখ বর্তমান উপাখ্যানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হবে বলেই আমার ধারণা।

১৮৪৩ সালের ২রা নভেম্বরের কথা। অর্থাৎ টেলরের মৃত্যুর দু' বছর পরের কাহিনী। খাস বিলেত থেকে বিখ্যাত অভিনেতা জেমস্ ভিনিং এসেছেন কোলকাতায়। সাঁ স্যুঁসিতে অভিনয় করবেন তিনি। সারা হল্ লোকে-লোকারণ্য। নভেম্বরেও হাতে হাতে পাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। দর্শকদের মধ্যে কোলকাতার গণ্যমান্য কেউ বাদ নেই। অবশ্য সবাই ইউরোপীয়ান দর্শক।

অভিনয় চলেছে। সহসা হৈ হৈ কাণ্ড। অভিনয় করতে করতে সহসা এক সময় অগুন ধরে গেল মিসেস লিচের পোষাকে। দাউ দাউ আগুন। দর্শকরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। তাদের চীৎকার, মিসেস লিচের আর্তনাদ সব মিলিয়ে আনন্দ-উচ্ছল প্রেক্ষাগৃহ মুহূর্তে পরিণত হলো আতঙ্কপুরীতে। অভিনয় শেষ না হতেই ভেঙে গেল।

মিসেস লিচের পোষাকের আগুনও নিভে গেল এক সময়। কিন্তু আর জ্বালানো সম্ভব হলো না তাঁর জীবনদীপ। মাত্র ক'দিনের মধ্যে (১৮ই নভেম্বর) চিরদিনের মতো বিদায় নিলেন তিনি। সাঁ স্যুঁসির পাশেই ছিল তাঁর বাড়ি। আজ সেখানে আর্চবিশপ-ভবন। আর সাঁ স্যুঁসি থিয়েটার ? ভালো করে তাকিয়ে দেখবেন—আজকের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আজও খুঁজে পাওয়া যায় তার কঙ্কাল। অবশ্য দু'টো বাড়ির গঠনগত ঐক্যের

জন্যেই তা সম্ভব হচ্ছে আজও। নয়ত এস্থার লিচের মতো আজও এর স্মৃতিটুকু থেকে যেতো ইতিহাসের পাতায়ই।

যা হোক আমাদের মাদাম দারমেনভিল অতঃপর সাঁ স্যুঁসি থেকে নিরাশ হয়ে স্থির করলেন নিজেই মঞ্চ গড়বেন। মঞ্চ না হোক, অন্ততঃ নিজেই কোন নাটক কোন মঞ্চে উপস্থিত করবেন। সেই মর্মে বিজ্ঞাপনও বের হলো কোলকাতার ইংরেজী কাগজগুলোতে। বিজ্ঞাপিত হলো টাউন হলে অভিনয় হবে। নাটকটির নাম— The Taming of the Shrew. তাতে ক্যাথারিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন স্বয়ং মাদাম দারমেনভিল। দিন ধার্য হলো— ২৫শে মে, ১৮৪১।

সব ঠিক। টিকিটও বিক্রি হলো যথেষ্ট। কিন্তু এবার দেখা দিল আর এক দৈব-দুর্বিপাক। যেদিন অভিনয় হওয়ার কথা, ঠিক তার আগের রাত্রিতে কলেরায় প্রাণ হারালেন হেনরী দারমেনভিল। মিসেস টেলারের প্রিয়তম স্বামী। বিদেশে-বিভূঁয়ে একমাত্র বান্ধব স্বামীকে হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন মিসেস টেলার।

স্বভাবতই বন্ধ হয়ে গেল প্রস্তাবিত অভিনয়। দর্শকরা নিঃশব্দে টাউন হলের দরজা থেকে ফিরে গেল।

মাদাম দারমেনভিলকে তারিখ পরিবর্তন করতে হলো। এবার দিন ধার্য হলো —১৫ই এপ্রিল।

১৫ই এপ্রিল। সেদিন টাউন হলে তিল ধারণের স্থান নেই। দর্শকদের অভিবাদন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন—অস্ট্রেলিয়াখ্যাত মিসেস টেলার। গৌরচন্দ্রিকা পাঠ করলেন। তখনকার দিনে ওটাই ছিল রীতি। গৌরচন্দ্রিকা পাঠ দর্শকদের অজানা ছিল না। অভিনয়ের অংশ হিসেবেই তাঁরা সেটুকু গ্রহণ করতেন। অত্যন্ত নিঃস্পৃহভাবে। কিন্তু সাধারণ স্বাভাবিক পোষাকে মাদাম দারমেনভিল যখন Friends বলে শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য,

তখন নড়ে চড়ে কান খাড়া করে বসতে হলো সবাইকে। মাদাম দারমেনভিল তাঁর দীর্ঘ উপক্রমণিকায় যা বললেন সংক্ষেপে তার মর্মার্থ :—

হে দর্শক-বন্ধু, আমি তোমাদের স্বাগত জানাই। তোমরা এই নবাগতার দিকে দৃক্‌পাত কর এবং স্মরণ কর সেই দিনটির কথা যেদিন এই দূর বিদেশে তোমরা পদার্পণ করেছিলে। আশা করি, আমার আজকের আবেদন তোমাদের কাছে ব্যর্থ হবে না, আশা করি তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সমবেদনা জাগবে এই হতভাগ্য মেয়েটির জন্য। কে জানে, চিরকাল যারা সৌভাগ্যের কোলে লালিত তাদের পক্ষে কতখানি সম্ভব দুঃখীর মর্মবেদনা অনুভব করা! তবে স্মরণ রেখো হে বন্ধু, এখন যে কথা বলছে তোমাদের কাছে সে অভিনেত্রী নয়, নারী (The woman, not the actress speaketh now)। হায়, মুহূর্ত পরেই তাকে আবার ধারণ করতে হবে অভিনয়ের মুখোস! প্রয়োজন আমাকে বাধ্য করছে এ কর্মে। অন্তরে আমার অন্ধকার, বুকজোড়া আমার গুরুভার। তবুও একটু পরেই আমায় আনন্দনিবেদনের ডালা সাজিয়ে হাজির হতে হবে তোমাদের সামনে। সুতরাং আমার প্রত্যাশা—তোমরা আমার এই মানসিক অবস্থা মনে রেখে আমার অভ্যকার দোষ-ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবে।

তারপর মিসেস টেলার দৃষ্টি ঘোরালেন মঞ্চ-সমালোচকদের দিকে। তাঁদের কাছেও আবেদন জানালেন। দীর্ঘ আকূতি-ভরা আবেদন। 'তোমরাও আজ আমাকে বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে দেখো না।' Lords of the mind, to you I turn, ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, নাট্য-সাংবাদিকরা একশ' বছর আগেও কোলকাতায় ছিলেন জনমনের প্রভু (Lord of the mind)। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁদের কাছে কাতর আবেদন জানাতেন সুবিচারের জন্যে, সহৃদয়তার জন্যে। আজকের চিত্র ও

নাট্য-সমালোচকরা পূর্বসূরীদের গৌরবে অবশ্যই আত্মপ্রসাদ ভোগ করতে পারেন।

যাহোক, সুঅভিনয়ের কারণেই হোক আর সেই দীর্ঘ কান্না-ভেজা আবেদনের ফলেই হোক, টাউন হলে মিসেস টেলারের প্রথম রাত্রি ব্যর্থ হলো না।

তারপর দ্বিতীয় অভিনয়-রজনী। এবারও টাউন হল প্রেক্ষাগৃহ। এবার মঞ্চস্থ হবে "Mischief-Making" নামক একটি গীতি-প্রধান হাসির বই।

২৯শে এপ্রিল অভিনয় হয়ে গেল। এবারও অভূতপূর্ব সাফল্য মিসেস টেলারের।

কিন্তু দর্শকদের করতালিধ্বনির রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘটে গেল আর এক দুর্ঘটনা। টাউন হল থেকে মাত্র ক'পা দূরে,—বেঙ্গল ক্লাবে। বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ি তখন ট্যাঙ্ক স্কোয়ার ইস্ট, অর্থাৎ লালদীঘির পূব পাড়ে।

ঘটনাটি এই : 'মিসচিফ-মেকিং' দেখে এসে যথারীতি নিজ ঘরে ঢুকেছেন বেঙ্গল ক্লাবের জনৈক বাসিন্দা। তার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর ঘরে গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। চাকরবাকর দৌড়ে ছুটে এলো। ছুটে এলো অন্যান্য ঘরের লোকজন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছেন মিঃ কক্স। সামনে পিস্তল। মাথার রক্তে সারা বিছানা লাল। আত্মহত্যা করেছেন—ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন কক্স। ভদ্রলোক ছিলেন ক্যালকাটা ফায়ার ইনসিওর কোম্পানীর একজন কর্মচারী।

আত্মহত্যা তখনকার কোলকাতায় প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার। সুতরাং বেঙ্গল ক্লাবের কোন ঘরে জনৈক ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন কক্সের আত্মহত্যা নিয়ে এতটা কানাঘুষা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হলো। কারণ, ভদ্রলোক ছিলেন মিসেস টেলারের বন্ধু। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস টেলারের অন্তরঙ্গতম বান্ধব এবং শোনা যায়, তাঁদের বন্ধুত্ব

তখন অন্তরঙ্গতার স্তর পেরিয়ে আরও গভীরে পৌঁছেছিল। হয়ত একদিন স্বাভাবিক পরিণতিও হতো এ বন্ধুত্বের। প্রকাশ্যেই হয়ত পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বের হতে পারতেন এঁরা। কিন্তু তার আর সময় পেলেন না ভদ্রলোক।

সেইদিনই দেশ থেকে চিঠি পেয়েছেন তিনি একখানা। তাঁর স্ত্রীর লেখা চিঠি। স্ত্রী পুত্র-কন্যাসহ জাহাজে চড়ছেন। আশা করছেন আগামী অমুক তারিখে দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসান ঘটবে। ইত্যাদি।

সুতরাং,—লোকে বলে, এক বিচ্ছেদের বেদনাকে আর এক বিচ্ছেদের মূল্যে মুছে না দিয়ে জেণ্টলম্যানের মত সব বিরহ-মিলনের উর্ধ্বে উঠে গেলেন কক্স।

আরও বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা হলো। কিন্তু আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ রহস্যাবৃতই থেকে গেল চিরকাল। যাঁরা জানতে সমর্থ হয়েছিলেন—তাঁরাও মৌন রয়ে গেলেন। ফলে জনশ্রুতিই অদ্যাবধি ইতিহাস।

শোনা যায় কক্স কতকগুলি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন মরার আগে। অনেক চিঠি। প্রথমটি লেখা করোনারকে। তাঁকে তিনি অনুরোধ করেছেন যেন, ময়নাতদন্ত ইত্যাদিতে মিছামিছি তাঁর দেহটাকে অযথা কষ্ট না দেন। আর লিখেছেন—তাঁর শেষকৃত্যে অযথা যেন ব্যয়বাহুল্য না হয়, পাকা সমাধি তাঁর চাই না। দ্বিতীয় চিঠিটি লেখা—তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে। তাঁকে তাঁর ফী খামে ভরে দিয়ে তিনি লিখেছেন—যেন চারদিকের চাপে তিনি লিখে না দেন যে, সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতিই কক্সের মৃত্যুর কারণ। তৃতীয় চিঠিটি লেখা অফিসের বড়বাবুকে। তাঁকে অভয় দিয়ে তিনি লিখেছেন—অফিসের চাবি এবং হিসেবপত্র সব ঠিক আছে। এছাড়া বেঙ্গল হরকরার মতে কক্স সাহেব আরও একটা জিনিস লিখে রেখে গিয়েছিলেন। তা হচ্ছে একখানা

প্রবন্ধ। বিষয়বস্তু: আত্মহত্যা। ওটা তাঁর ছেলেপুলেরা ছাড়া আর কেউ যেন না পড়ে এই ছিল তাঁর কড়া আদেশ। যা হোক,—চিঠির বাক্স তাঁর এখানেই নিঃশেষিত হয়ে গেলো না। তারপরও বের হলো আরও দু'খানা চিঠি। তাদের উপরে যথাক্রমে লেখা দু'জনের নাম। একজন মিঃ জে. এইচ. স্টককুয়েলার, অন্যজন মাদাম দারমেনভিল ওরফে মিসেস টেলার।

স্টককুয়েলার তখনকার দিনের খ্যাতনামা সাংবাদিক। 'ইংলিশম্যান' কাগজের সম্পাদক। অভিনেতা-অভিনেত্রীমহলে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন তিনি। চৌরঙ্গী থিয়েটার এবং পরবর্তী কালের সাঁ স্যুঁসি বলতে গেলে তাঁরই কীর্তি। মিসেস লীচের প্রতিষ্ঠার পেছনেও ছিল তাঁর ঐকান্তিক উৎসাহ আর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা। মিসেস টেলারের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় ছিল তাঁর। 'মিস্‌চিফ-মেকিং'য়ের দর্শক হিসেবে তিনিও সে রাত্রে উপস্থিত ছিলেন টাউন হলে। কেউ কেউ নাকি অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে কথা বলতেও দেখেছে ক্যাপ্টেন কক্সের সঙ্গে। যাহোক, তাঁর কাছে লেখা কক্স সাহেবের চিঠিটি কর্তৃপক্ষ প্রকাশের অনুমতি দিলেন না।

এই রহস্য আরও ঘন হয়ে উঠলো দিন পনের পরে। একদিন ভোরবেলা শহরময় রটে গেল—মিসেস টেলার মারা গেছেন। ৯৭নং তালতলার বাড়িতে দেখতে দেখতে লোক জমে উঠলো।

আত্মহত্যা, নিশ্চয় তবে আত্মহত্যা; আগেই জানতাম—যে শোনে তার মুখেই একথা। টেলারও আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ডাক্তার রায় দিলে—স্বাভাবিক মৃত্যু। স্বামীর মত মাদাম দারমেনভিলও মারা গেছেন কলেরায়।

লোকে বললো, ডাক্তার মিথ্যে বলে। কেলেঙ্কারি চাপা দিতে চায়।

হয়ত তাই। হয়ত তা নয়। তবে ১৮৪১ সালের ১৩ই মে মাদাম দারমেনভিল যে লোকান্তরিত হয়েছেন এ বিষয়ে বিতর্ক নেই।

কবরটির সামনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করছিল একবার গোপনে জিজ্ঞেস করি:—বলুন না মাদাম, কোন্‌টা সত্য? লোকেদের কানাঘুষা, না, ডাক্তারের রিপোর্ট। লজ্জার কি আছে, বলুন না কাকে ধরতে চেয়েছিলেন আপনি এমনি করে—কক্সকে, না, স্বামীকে? কে ডেকে নিয়ে গেলো আপনাকে—মৃত স্বামী, না, কক্স?

কিন্তু বলা হলো না। তিন লাইনের সেই পরিচয়লিপিটি যেন আবার পাথর ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ওপরে। তারপর এক ধমকে থামিয়ে দিলো আমার ভাবনা।

—চুপ। প্লি—জ্, এখানে এসব নয়। এই পাথর যার নামে দাঁড়িয়ে আছে এখানে, সে মারিয়া ম্যাডেলিন টেলার। সাতাশ বছরের একটি মেয়ে। কারও স্ত্রী নয়, কন্যা নয়, অভিনেত্রী নয়,—একটি মেয়ে।

॥ জর্নালিস্ট ॥

"Before he will bow, cringe or fawn to any of his oppressors...........he would compose ballads and sell them through the streets of Calcutta as Homer did." বলেছিলেন কোলকাতার এক দীন সাংবাদিক। হেস্টিংস-ইম্পের মদমত্ত অট্টহাসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্পর্ধা-উন্নত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তিনি—ভাঙবো, তবুও মচকাবো না। রক্তচক্ষুর ভয়ে বিকিয়ে দেবো না আমার স্বাধীনতা। তৎকালীন কোলকাতার ইংরেজ নরনারী চমকে উঠেছিল তাঁর কথা শুনে। এ কি উন্মাদ? রাস্তার লোক হয়ে লড়তে চায় গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে!—"হ্যাঁ, তাই।" উত্তর দিয়েছিলেন সেই দুঃসাহসী সাংবাদিক। কাগজে-কলমে উত্তর। ভীতিবিহ্বল হয়ে কোলকাতাবাসী পড়ে গেল, তিনি লিখেছেন:—পাঠক, আজ আমার হারাবার মতো জিনিস আছে মাত্র তিনটি। প্রথম আমার কাগজ,—আমার সম্মান; দ্বিতীয় আমার স্বাধীনতা এবং শেষ আমার জীবন। শেষের দুটোকে আমি আজ হেলায় বিসর্জন দিয়ে দিতে পারি প্রথমটির জন্যে।—আমার কাগজের জন্যে।

তা তিনি দিয়েওছিলেন। স্বাধীনতা এবং জীবন দুই-ই অকৃপণভাবে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রথমটিকে বাঁচাতে পারেননি। কাগজ তাঁর বাঁচেনি। বাঁচাতে পারেননি তিনি নিজেকেও। বেঙ্গল গেজেটের মতো তার সম্পাদককেও মরতে হয়েছে অকালে। হোমারের মতো কোলকাতার পথে পথে গান

গেয়ে বেড়াবার আগেই—এককালের অত্যাচারীদের কাছে Your Obedient Servant বলে দরখাস্ত লিখতে লিখতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতার মূল্যও বাঁচাতে পারেনি তাঁকে। হিকি ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডি।

হিকি। জেমস্ অগস্টাস হিকি—দি প্রিণ্টার, ভারতবর্ষের আধুনিক সাংবাদিকতার পিতা (The Papa of the Press)। তাঁর কাগজ বেঙ্গল গেজেট ভারতবর্ষে প্রথম কলে ছাপা কাগজ, সংবাদপত্র। ছাপার কল তখনকার সময়ে গুটি তিন ছিল ভারতবর্ষে। কিন্তু কাগজ ছিল না। অবশ্য সংবাদ প্রদানের রেওয়াজও ছিল, কিন্তু সংবাদপত্র ছিল না। হিকির সময়ে কোলকাতায় ছিল একটা মাত্র খবরের কাগজ। তবে হাতে লেখা কাগজ। বোল্টস বলে এক ভদ্রলোক বার করেছিলেন সেটি। পাঠকেরা তাঁর বাড়ি গিয়ে পড়ে আসতো। কিন্তু বেশী দূর এগুবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল তা। নানা কারণে কর্তৃপক্ষ তাড়িয়ে দিলেন বোল্টসকে কোলকাতা থেকে।

এগিয়ে এলেন হিকি। কাগজ বার করবেন তিনি। বোল্টসের মতো হাতে লেখা কাগজ নয়,—ছাপা পত্রিকা। ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী শনিবার বের হলো তাঁর প্রথম কাগজ। বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাড্ভারটাইজার। সম্পাদক, প্রকাশক এবং মুদ্রাকর—হিকি।

হিকি। জেমস্ অগস্টাস হিকি। কে তিনি—কোলকাতাবাসীর মুখে মুখে জিজ্ঞাসা। এমন সুন্দর ছাপা কাগজ বের করতে পারলো যে—কে সেই লোক। হিকি জানালেন—আমি জেমস্ অগস্টাস হিকি—মহামান্য কোম্পানী বাহাদুরের প্রথম এবং ভূতপূর্ব মুদ্রাকর। কাগজ বার করার আমার বিশেষ রকমের কোন নেশা নেই, এদিকে আমার যে খুব ঝোঁক আছে তাও নয়—তাছাড়া খুব কঠিন জীবনেও আমি অভ্যস্ত নই; তবুও যে আজ এই শ্রমসাধ্য

কাজে নিজেকে নিয়োগ করছি তার কারণ আমি মন এবং আত্মার স্বাধীনতা চাই (in order to purchase freedom of mind and soul)। নিজেই অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন তিনি তাঁর কাগজের উদ্দেশ্য ঃ আমার কাগজ হচ্ছে রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সাপ্তাহিক। সমস্ত দলের জন্যে খোলা এর পাতা, কিন্তু প্রভাবিত নয় কারো দ্বারাই।

হু-হু করে কোলকাতার ইংরেজ নরনারী গ্রাহক হতে লাগলো বেঙ্গল গেজেটের। হিকির কাগজের। দু' সপ্তাহেই জনপ্রিয় সাংবাদিক হয়ে উঠলেন হিকি। জনপ্রিয় কাগজের জনপ্রিয় সম্পাদক তিনি।

কিন্তু হিকি বরাবর সাংবাদিক ছিলেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, এর আগে তিনি ছিলেন ছাপাখানার লোক মাত্র অর্থাৎ প্রিন্টার। কিন্তু ইতিহাস বলে প্রিন্টার হওয়ার আগে তিনি ছিলেন ডাক্তার। চিকিৎসক। নেটিভদের মধ্যে ডাক্তারী করে কোন মতে পেট চালাতেন তিনি। আবার কেউ কেউ বলেন—হিকি ছিলেন কেরানী। সার্জেন্ট ডেভি নামে জনৈক আইনজীবীর গোমস্তা ছিলেন তিনি। অর্থাৎ হিকি ছিলেন এক বিচিত্র পেশার মানুষ। এবং যতদূর জানা যায় তাতে নিঃসন্দেহে এ মানুষটির জীবন রীতিমত রোমাঞ্চকর।

ভদ্রলোক জাতিতে ছিলেন আইরিশ। বাপ ঠাকুর্দার খবর বড় একটা পাইনি। কোন মতে বাবার নামটুকুই জানা গেছে। তাঁর নাম ছিল উইলিয়াম হিকি। বৃদ্ধ উইলিয়াম ছেলেকে শিক্ষানবিশরূপে রেখে এসেছিলেন লণ্ডনের স্টেশনারস্ হলে। সেখান থেকেই তিনি পাড়ি জমান কোলকাতায়। শোনা যায় আসার পথে জাহাজ অবধি তিনি ছিলেন জনৈক ডাক্তারের পার্শ্বচর। কারণ সে জাহাজের যাত্রীর তালিকায় তাঁর নাম নেই। ১৭৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তাঁর জাহাজ এসে পৌঁছালো বাংলায়, কোলকাতায়।

জাহাজের খালাসী হিকি, ডাক্তারের ভৃত্য হিকি কিন্তু জাহাজ থেকে নেমেই হয়ে গেলেন নিজে ডাক্তার। এণ্টালী অঞ্চলে বাড়ি নিলেন একখানা। তারপর স্থরু করলেন রীতিমত রোগী দেখাশোনার কাজ। অবশ্য তাঁর রোগীরা সবই ছিল নেটিভ। ডাক্তারী চললো। হিকি দেখলেন শহরে ছাপাখানা নেই। চট্ করে তিনি রাতারাতি হয়ে উঠলেন প্রিণ্টার। দিন রাত্রি পরিশ্রম করে তৈরী করলেন একসেট টাইপ। তাতে দিব্যি ছাপা চলে মোটামুটি হ্যাণ্ডবিল এবং বিজ্ঞাপন। কাজের অভাব ছিল না। অনেক কাজ পেয়ে গেলেন হিকি। একদিকে অনেক রোগী অন্যদিকে অনেক ছাপার কাজ। হিকির আনন্দ আর ধরে না। কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করে দেশে অর্ডার দিয়ে বসলেন একটা ছাপার মেশিনের এবং সেই সঙ্গে কিছু ওষুধপত্তরের।

যথাসময়ে ছাপার কল এসে পৌঁছালো। এবার আর ডাক্তারী নয়। পুরোপুরি প্রিণ্টার হয়ে উঠলেন হিকি। খ্যাতনামা মুদ্রাকর। সরকারী কাজও পেতে লাগলেন। প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কুট একটা বিরাট কাজ করতে দিলেন তাঁকে। সৈন্যদলের নিয়মকানুন ছাপাতে হবে। পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশী টাকার কাজ। হিকির আনন্দ আর ধরে না। টাকা তাঁর চাই। বেচারার টাকার অভাব লেগেই আছে।

শোনা যায়—ইতিমধ্যে ঋণের দায়ে কিছুকাল কারাবাসও নাকি করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর নামে নাম আর এক হিকি (আইনজীবী উইলিয়াম হিকি) তাঁকে দেখেছিলেন কয়েদখানায়। ১৭৭৭ সালে। হিকির কারাজীবনের তখন তৃতীয় বর্ষ।

যাহোক, সরকারী কাজ শেষ করে হিকি নামলেন কাগজ বের করতে। ছাপাখানা ছাড়া হাজার দুই টাকা তখন সম্বল ছিল। তাই মূলধন করেই বের হলো বেঙ্গল গেজেট। লোকে বলে—হিকির গেজেট।

কাগজ হিসেবে হিকির গেজেট সামান্য কাগজ। অন্ততঃ আজকালকার কাগজের তুলনায়। দুই সিট কাগজ। দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি, চওড়ায় আট ইঞ্চি। খুদি খুদি হরফে ছাপা বেশীর ভাগ জায়গাই বিজ্ঞাপনে বোঝাই। তবুও বেঙ্গল গেজেট নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেল শহরে। শুধু কোলকাতা শহরে নয়—সারা ভারতবর্ষে। কারণ প্রথম সংখ্যা থেকেই হিকি প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন শাসকদের বিরুদ্ধে। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তিক্ত মতামত, তীব্র কশাঘাত চালিয়ে গেলেন তিনি।

অবশ্য এটা ঠিক, এ ব্যাপারে হিকি তাঁর কালের রুচিকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তিনিও যে কিয়ৎপরিমাণে ভাল্‌গার ছিলেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক সংবাদপত্রের প্রতিশ্রুতি দিলেও হিকি তাঁর সমস্ত অধ্যবসায় নিযুক্ত করলেন ব্যক্তিগত জীবনের দিকে। নামজাদা ব্যক্তিদের পারিবারিক জীবন, বিশেষ বিশেষ মহিলার চালচলন কিছুই বাদ দিতেন না তিনি। দু'একখানা নমুনা দিলেই বোঝা যাবে তাঁর কৌশলটি। Public notice : Lost on the course, last Monday evening, Buxey Clumsey's heart, which he stood simpering at the footstep of Hooka Turban's carriage ; as it is supposed to be in her possession, she is desired to return it immediately, or to deliver up her own as a proper acknowledgement.

বলা বাহুল্য, নাম দু'টি কিয়ৎপরিমাণে বিকৃত হলেও ঘটনাটি মূলত সত্য। কারণ হিকির রিপোর্টাররা সামাজিক মেলামেশার স্থানে রীতিমত খুঁজে বেড়াতো এমনি সব ঘটনা। তারপর এমনি রসিকতা করে হিকি ছেপে দিতেন তার বিবরণ। একবার জনৈক মহিলার পোশাক লক্ষ্য করে হিকি লিখলেন :

If Eve in her innocence could not be blamed,
Because going naked she was not ashamed,
Whoe'er views the ladies, as ladies now dress
That again they grow innocent sure will confess,
And that artfully, too, they retaliate the evil—
By the devil once tempted they now tempt
the devil.

এর পর সে মহিলাই শুধু নয়, সমস্ত সোসাইটি মহিলারা যে আনন্দে, উৎসবে তাঁদের বেশভূষা সম্পর্কে সতর্ক হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখানেই শেষ নয়, বিবাহের সম্ভাবনা, পাত্রীর দেহশ্রী, পাত্রের পৌরুষ ইত্যাদিও বাদ যেত না বেঙ্গল গেজেটের পাতায়। কবিতার পর কবিতা ছাপা হতো Poets' Corner-এ। এমনি সব কবিতা ঃ

Oh lovely Su—,
How sweet though art,
Than sugar thou art sweeter, ইত্যাদি।

এই Su ছিল কোন নামের আদি দুটি শব্দ। তৎকালীন ইংরেজদের সমাজ ছিল ছোট। সুতরাং পাঠকেরা অতি সহজেই চিনে ফেলতেন উপলক্ষ্য মানুষটিকে। হিকি সেটা জানতেন। জেনেও এ সব নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাপাতে দিতেন 'কবিতা হিসেবে।

হয়ত তাতে কিছু হতো না। নিজ নিজ ঘর সামলে পাঠকেরা শনিবারে শনিবারে নিয়মিত পরচর্চার আস্বাদ পেতেন মাত্র। কিন্তু হিকির কাগজের এটা ছিল এক দিক। তাঁর সমস্ত ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিল—বড় ঘর, প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল—উঁচু চেয়ার। তাদের জীবনে কেলেঙ্কারীর অভাব ছিল না। বরং কেলেঙ্কারী কেচ্ছাই

ছিল তাদের সমাজ, তাদের জীবন। বেঙ্গল গেজেটের পাতায় হিকি চেপে ধরলেন তাদের। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে, এমনি ধারার সব মানুষকে তিনি দাঁড় করালেন তাঁর কাঠগড়ায়। অবশ্য এও করতেন তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে। ছোট ছোট নাটক লিখতেন তিনি ব্যঙ্গের উপলক্ষ্যটিকে কেন্দ্র করে। তারপর আসল নামগুলো একটু বিকৃত করে সেই সব রথী-মহারথীকে হাজির করাতেন সেখানে পাত্র-পাত্রী হিসেবে। পাঠকের বুঝতে কষ্ট হতো না, বুঝতে পারতেন শাসনকর্তারাও। না বোঝার কারণ নেই। একটু নমুনা দিচ্ছি। একবার হিকির গেজেটে টুকরো খবর বের হলো দুই বন্ধুর কথোপকথনের সারাংশ। তাতে একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করছে—'আচ্ছা ভাই বল তো দেখি একটা ভালো রকমের চাকৃরী বাকৃরী পাওয়া যায় কি করে?' বন্ধু উত্তরে বললেন, 'আলীপুরবাসিনী মারিয়ন সমীপে ধর্না দাও কিংবা পুল-বন্দীর কাজে নিজ দেহমন সমর্পণ কর।' পাঠক পড়েই বুঝে গেলেন প্রথম ইঙ্গিতটি হেস্টিংস-গিন্নী সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি স্যার ইলাইজা ইম্পেকে লক্ষ্য করে বলা। পুল-বন্দী বা ব্রিজ মেরামতি ইত্যাদির কাজে তখন পয়সা ছিল। শোনা যায়, ইম্পে একবার তাঁর কোন আত্মীয় মিঃ ফ্রেজারের বেনামীতে তার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে বেশ কিছু পয়সা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য গভর্ণর জেনারেল কিংবা প্রধান বিচারপতির মতো মানুষ এমনি আক্রমণ দিনের পর দিন সইবেন কেন! ১৭৮০ সালের ১৪ই নভেম্বর অর্থাৎ জন্ম-বছরেই বেঙ্গল গেজেটের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল জেনারেল পোস্ট অফিসের পথ। সরকারী আদেশে ডাক-ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হলো বেঙ্গল গেজেট। কারণ হিসেবে বলা হলো—এ কাগজে যা তা ছাপা হয় এবং হচ্ছে।

এতে জনগণের রুচিকে বিকৃত করা হচ্ছে এবং অত্র শহরের শান্তিকে রীতিমত বিঘ্নিত করা হচ্ছে।

হিকি কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র দমলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, গভর্ণর জেনারেলের এই কাজ হচ্ছে—'অত্যাচারী শাসকবর্গে'র ক্ষমতার অপপ্রয়োগের শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ।

পাঠকেরা সবিস্ময়ে দেখতে পেলো বেঙ্গল গেজেট: পর সপ্তাহে শুধু বের হচ্ছে যে তাই নয়, তার পূর্বচরিত্র বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত না করেই বের হচ্ছে। বরং আরও তীব্র হয়ে উঠেছে হিকির আক্রমণ। গভর্ণর জেনারেলকে ছাড়িয়ে ক্রমে আরও বিস্তৃত হচ্ছে তার পরিধি।

এবার তিনি ধরলেন রেভারেণ্ড কিরলেণ্ডারকে। কিরলেণ্ডার কোলকাতর মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা। হিকি লিখলেন, ভদ্রলোক গভর্ণর জেনারেলকে চার্চখানা বিক্রি করে দেবার চেষ্টায় আছেন। আর যায় কোথা? পরদিনই গভর্ণর জেনারেল কাগজে-কলমে লিখে দিলেন এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাদ্রী সাহেব সেই কাগজখানা হাতে করে হাজির হলেন আদালতে। মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করলেন তিনি হিকির নামে। বিচারে জেল হয়ে গেল হিকির। চার মাসের কারাদণ্ড এবং সেই সঙ্গে পাঁচ শ' টাকা নগদ জরিমানা। এই তো গেল এক মামলার রায়, এদিকে হেস্টিংসও তাঁর নামে রুজু করে রেখেছেন আরও দু'টো মোকদ্দমা।

হিকি এ সব তুচ্ছ করে ঘোষণা করলেন: মিঃ হিকির মতে কোন ইংরেজপুরুষ কিম্বা স্বাধীন গভর্নমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। প্রত্যেকটি প্রজার নিজ নিজ আদর্শ এবং মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং যে তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করে সে নিঃসন্দেহে অত্যাচারী।

এর পর রাজকর্তব্যে আর শিথিল হলে চলে না। হেস্টিংস তখন কোলকাতায় নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শনে গেছেন। অস্থায়ী গভর্ণর সিপাই পাঠিয়ে দিলেন হিকিকে ধরে আনতে। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে চার শ' লোক চললো এণ্টালী। হিকির বাড়ির দিকে। সাদায় কালোয় মেশানো চার শ' সিপাই। শক্তিহীন এক দরিদ্র গৃহস্থ সাংবাদিক তাদের লক্ষ্য। সরকারের কাণ্ড দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল হিকির। অবশেষে গায়ে হাত দেবে সাংবাদিকের? ক্ষেপে গেলেন হিকি। সামনে ছিল ছাপাখানার সাজ-সরঞ্জাম, তাই নিয়েই নেকড়ের মতো তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন চার শ' লোকের সেই বিরাট বাহিনীর ওপর। মুহূর্তে ছত্রখান হয়ে গেল মাইনে-করা সিপাই-বাহিনী।

এবার আইনের কথা স্মরণ হলো হিকির। জামা-কাপড় পরে সরকারের আইন রক্ষার্থে নিজেই রওনা হলেন সুপ্রিম কোর্টের দিকে। গিয়ে দেখেন কোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে। ফেরার পথে পা বাড়ালেন, কিন্তু আর ফেরা হলো না। কোর্ট না খোলা অবধি আটক করে রাখা হলো তাঁকে।

হিকি চললেন কয়েদখানায়। কিন্তু মোটেই দমলেন না। দু'দিন বাদেই পাঠকদের বিস্মিত করে বের হলো বেঙ্গল গেজেট এবং তার পৃষ্ঠায় তখনও সম্পাদকের বলদৃপ্ত ঘোষণা: এই সব অত্যাচারীর দল যদি আমাকে আমার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে জেলে পুরে রাখে তাহলেও আমি চিরকালের মত চালিয়ে যাব আমার কাগজ।

কথা রাখলেন হিকি। জেলখানা থেকেই ছাপিয়ে গেলেন তাঁর কাগজ, এক মেজাজে। পরের বছর (১৮০২) জানুয়ারীতে হেস্টিংস ফিরে এলেন কোলকাতায়। শুরু হলো হিকির বিচার। হেস্টিংসের প্রথম মোকদ্দমায় রায় হলো এক বছর কারাদণ্ড এবং দু'হাজার টাকা জরিমানা। আর দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ৫০০০৲ টাকা

ক্ষতিপূরণ। হেস্টিংস দয়া দেখালেন। জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের টাকা তিনি মকুব করে দিলেন। হাত দিলেন না হিকির ছাপাখানায়। জেলে থেকেই হিকি ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে তাঁর এই উদারতার জন্যে। হিকির জেলবাসে আপত্তি নেই। কিন্তু কাগজ বন্ধ হয়ে গেলে কি নিয়ে বাঁচবেন তিনি? তাই জেলে থেকেই লিখলেন, by protecting the types they have protected the liberty of the press.

কিন্তু শুধু স্বাধীনতায় কাগজ বাঁচে না। তাই ১৮০২ সালেই একদিন বন্ধ হয়ে গেল বেঙ্গল গেজেট। হিকি তখনও জেলে। তারপর ছাড়া পেয়ে দেখেন—এবার নিজেকে বাঁচানোই দায় তাঁর পক্ষে। চারিদিকে ঋণ আর ঋণ। বিরাট পরিবার। চিরস্থায়ী অভাব। কি উপায় করবেন তিনি এদের, তাঁর ছেলেমেয়েদের?

অবশ্য উপায় তাঁর ছিল না এমন নয়, কিন্তু ক্ষমতা বড় নির্মম। তারা সহজে প্রতিশোধের সুযোগ ছাড়তে চায় না। আগেই বলেছি, কাগজ বার করার আগে হিকি সরকারী কাজ করেছিলেন অনেক টাকার। প্রায় ৩৫,০৯২৲ টাকার। হিকি তার সঙ্গে জুড়লেন শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে দু'তিন বছরের সুদ। মোট অঙ্ক দাঁড়ালো ৪৩,৫১৪ টাকা ১ আনা ৩ পাই। অনেক টাকা। স্বচ্ছন্দে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারেন তিনি। চাই কি কাগজও বার করতে পারেন আবার।

কোম্পানী সেটা জানতো। তাই শুরু হলো গড়িমসি। চিঠির পর চিঠি লিখছেন হিকি। এমনি করে চলে গেল দীর্ঘ ষোল বছর। কোম্পানী অবশেষে সম্মত হলো।—'দিচ্ছি তোমায়', কর্তৃপক্ষ জানালেন তাঁকে। 'তবে এতো টাকা কে দেবে? আমরা মঞ্জুর করছি তোমার নামে মোট—৬,৭১১৲ টাকা।'

—কোন্ হিসেবে? ক্ষেপে গেলেন হিকি। এই আমার

হিসাব, এই তার ভাউচার—এই এই বাবদ কোম্পানীর কাছে আমার আইন-সম্মত প্রাপ্য টাকা! ন্যায্য পাওনা কেন দেবে না? ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৪ সালের চিঠিতে তিনি কোম্পানীর কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন, তাদের ব্যবহারের। দু'দিন বাদেই আবার লিখলেন তিনি (২৭শে ফেব্রুয়ারী)—দাও টাকা, ও টাকাই নেব আমি। অনুগ্রহ করে, আজই দাও।

পরের দিন কম্পিত হাতে ষোল বছর পরে প্রাপ্য টাকার এক সামান্য ভগ্নাংশ হাতে পেয়েই তিনি লিখে দিতে বাধ্য হলেন—'সাকুল্য প্রাপ্য বুঝে পেলাম।' সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায়, শাসকবর্গ তখনও ক্ষমা করেননি তাঁকে। তখনও বেচারার উপর চলেছে তাঁদের প্রতিশোধ।

এর পর হিকিকে আমরা দেখতে পাই আরও ক'বছর পরে। ১৭৯৭ সালে। একটি অসহায় পরিবারের কর্তারূপে, ভূতপূর্ব সাংবাদিক চিঠি লিখছেন—বিলেতে। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে। 'আমার শিশু সন্তানদের রক্ষা করুন। বাজার-তদারকের কাজ অন্ততঃ একটা জুটিয়ে দিন আপনি আমায়, নয়ত কোন দেশমুখী জাহাজের সার্জেন। অন্ততঃ স্বদেশের মাটিতে মরতে পারবো তাহলে।' ইত্যাদি।

এ চিঠির উত্তর আসেনি। তারপর, তিন বছর পরে আবার লিখছেন তিনি হেস্টিংসকে। 'বিষয়-আসয় যা ছিল সব চলে গেছে। এবার একমাত্র ভরসা ঈশ্বর, ভরসা আপনি।'

উত্তর এলো না এ চিঠিরও। তিন বছরের মধ্যেই (১৮০৩) চোখ বুজলেন হিকি। জেমস আগস্টাস হিকি—দি প্রিণ্টার, পাপা অব দি প্রেস্। কোলকাতার প্রথম সাংবাদিক।

॥ হুক্কা ও এক্কা ॥

হুক্কা আর এক্কা এক জিনিস নয় বটে, কিন্তু এক যুগের জিনিস। তার চেয়েও বড় কথা—এক মেজাজের জিনিস। তাই একটির কথা বললেই আর একটির কথা এসে যায়। হুক্কার কথা তুললেই এসে পড়ে এক্কার কথা। আর এক্কার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে যায় পাল্কীর কথা। কারণ, পাল্কী কোলকাতার এক্কার জনক।

অষ্টাদশ শতকের কোলকাতার বাহন বলতে ছিল দুটো পা। পা-ই, তবে—নিজের অথবা অন্যের। গরীব লোকেরা সেই শীর্ণ কালো কালো পা দুখানা ভর করেই চড়ে বেড়াতো আজব নগরীতে, আর বড়মানুষেরা বেড়াতেন এদেরই ঘাড়ে চড়ে। নিজের পা মাটিতে ছোঁয়াতে হতো না তাঁদের। হেঁইও-হো, হেঁইও-হো করতে করতে সেই শীর্ণ পদযুগলই তাঁদের বয়ে বেড়াতো দেশময়। অর্থাৎ বেহারাই ছিল তখন বাবুলোকের একমাত্র বাহন। অবশ্য মোটটি বইতো তারা পাল্কীতে চাপিয়েই। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? বাবু ভাবতেন হয়ত পাল্কী চড়েছি, কিন্তু বেহারা মনে মনে ঠিকই জানতো পাল্কী নয়, বাবু বইছি। তবুও যুগটা বেহারার যুগ না হয়ে হচ্ছে পাল্কীর যুগ! যেন তা হলেই পাল্কীর আড়ালে পড়ে যাবে সাধ-আহ্লাদ করে মানুষের ঘাড়ে চড়ার কাহিনীটা।

কিন্তু আড়াল পড়েনি। নতুন যাঁরা দেখেছেন কোলকাতার পাল্কী তাঁদের সকলের দৃষ্টিতে প্রথমেই পড়েছে—কোলকাতার বেহারা। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাল্‌টাজার্ড নামে একজন

ইটালীয়ান চিত্রশিল্পী এসেছিলেন কোলকাতায়। তিনি লিখেছেন: "ইউরোপীয়ানরা যে-সব শহরে বসবাস শুরু করেছে তার প্রত্যেকটিই পাল্কীময়। পাল্কীগুলো সব বেশ সুন্দর গড়নের। চারজন বেহারা তা বহন করে থাকে। প্রত্যেকের হাতে হাতে থাকে একটি করে লণ্ঠন। তার আগে আগে চলে হরকরা এবং পেয়াদার দল।" বেহারাদের নৈপুণ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "বেহারারা ব্যাটারা এমনি সুন্দর চলে, কি বলব ভাই, টেরই পাবে না তুমি যে, কারও ঘাড়ে চড়ে চলছো। ওরা ঘাড় বদল করে কখন তাও টের পাবে না। চলতিও এদের এমনি দ্রুত যে, দেখতে না দেখতে মাইলের পর মাইল চলে যায়। চলতে চলতে কখনও থামে না ওরা, এমন কি চলার তালে তালে কথাবার্তা কিংবা গানও চলে দিব্যি। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ইউরোপের ডাকগাড়ীর ঘোড়া বদলের মতো হিন্দুস্থানে বেহারাও পথে জায়গায় জায়গায় বদল হয়। ইত্যাদি"

মিস সোফিয়া গোল্ডবোর্ণ (১৭৪৮) নামে আর এক মহিলা লিখেছেন "যেখানটায় নামলাম আমরা, চৌরঙ্গী সেখান থেকে প্রায় চার মাইল। অথচ আশ্চর্য, দেখতে না দেখতেই পৌঁছে গেলাম। এমনি ওস্তাদ এই বেহারাগুলো। রোদ গরম কিছুই লাগে না ওদের। ঘন্টায় ন' থেকে বারো মাইল চলে যায় অক্লেশে। আর পাল্কীগুলোও এমনিভাবে তৈরি—মনে হয় যেন, গদীতে বসে আছি। সামনে লাল সরাব এবং আনুষঙ্গিক ইত্যাদি।"

এমনিভাবে লোক যেত। পাঁচশ মাইলও যেত। কোলকাতা থেকে এলাহাবাদ, কাশী যেখানে খুশী। বড়বাবু তীর্থ করতে যেতেন পাল্কী চড়ে, বড়া সাহেব অফিসে, বড় গিন্নী স্নানে। যার যেমন ঘর, তার তেমন পাল্কী, তার তত বেহারা। সিন্দুকের পরিস্থিতি অনুযায়ী দুই বেহারাতে চলে যায় কারো। কারো চাই চারজন,

কারো আবার ছ' বেহারা না হলে চলেই না। বেহারার ওপরে আছে হরকরা, পেয়াদা, সোটাবরদার, মশালচী। সুতরাং পাল্কী পোষা সহজ ব্যাপার নয় তখন।

পাল্কীর দাম আছে। যেমন তেমন একটা হলে বড়মানুষী থাকে না। অথচ একটু রং-চং-ওয়ালা ভাল একখানা পাল্কী করতে হলে—তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ। তারপর আছে বেহারাকুলের মাইনে। মধ্যবিত্ত মানুষেরা তাই ঠিকা পাল্কী চড়তেন। তারও খরচ কম নয়। কোলকাতা থেকে কাশীর ভাড়া ৫০০ সিক্কা টাকা। তাই পাল্কী করে তাদের তীর্থ করা হতো না। কাছাকাছি জায়গায় যাতায়াতটুকুই হতো শুধু। তারও ভাড়া কম নয়। আজকালকার ট্যাক্সির প্রায় সমান। প্রতি ক্রোশে এক টাকা তু'আনা।

ভাববেন না বেহারাদের রোজগার তাই বলে খুব ভাল ছিল। বরং একেবারে তার উল্টো। ঠিকা পাল্কী বয়ে দিনে তাদের রোজগার হতো এক টাকা চার আনা। চার আনা দিয়ে দিতে হবে মালিককে। নিজেদের পাল্কী ছিল না বেচারাদের। আজকালকার রিক্সাওয়ালাদের মতো ওরাও ছিল মজুরমাত্র। যাহোক বাকী যে টাকাটা হাতে রয়ে গেল—সেটি ভাগ হতো চারজনের মধ্যে। মাথাপিছু দৈনিক রোজগার হতো তাই চার আনা মাত্র। সাহেবের চাকরীতে আরও কম। সেখানে মাথাপিছু মাসিক মাইনে তাদের—পাঁচ টাকা।

তাতেও হয়ত দিন চলে যেতো কোনমতে। কিন্তু সহসা একদিন সভ্যতার বিপাকে পড়ে গেল বেচারা বেহারার দল। শহুরে কানুনে পড়ে গেল তারা। ১৮২৭ সালের কথা। সহসা পুলিশ থেকে নোটিশ জারী হলো—ঠিকা পাল্কী সব রেজেস্টারী করতে হবে। আর বেহারাদেরও নিতে হবে লাইসেন্স নম্বর।

সেই নম্বর খোদাই করা থাকবে একটি পিতলের চাকৃতির ওপর এবং প্রত্যেক বেহারাকে তাবিজের মতো বাহুতে ধারণ করতে হবে সেটি। কঠিন আইন।

কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ছিল বেহারাদের শ্রেণীবন্ধন। তারা সবাই উৎকলবাসী। সুদূর উড়িষ্যা থেকে কোলকাতায় এসেছে তারা পাল্কী বইতে, জাত খোয়াতে নয়। ক্ষেপে গেল তারা। পাল্কী বই বলেই কি মান-অপমান নেই আমাদের, টিকিট ঝোলাব হাতে ?

বেহারাদের মিটিং বসলো। স্থির হলো, ঠিকা পাল্কী-বেহারারা সব হরতাল করবে—ধর্মঘট। ২১শে মে তারিখে গঠিত হলো তাদের এক সংগ্রাম-পরিষদ। পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলো—যতদিন পর্যন্ত না এই অন্যায় আইন তুলে নেওয়া হচ্ছে ততদিন পাল্কী ছোঁব না আমরা। যদি কেউ তা করে তবে একঘরে করা হবে তাকে। কঠিন সংকল্প।

সেই দিনই, অর্থাৎ ১৮২৭ সালের ২১শে মে দুপুরের একটু আগে ময়দানে সমবেত হলো শহরের এক হাজার পাল্কী-বেহারা। তারপর মিছিল করে চললো তারা লালবাজারের দিকে। লালবাজার তখনও পুলিশ অফিস। "চলবে না"—"চলবে না" করতে করতে সেই জনতা এসে হাজির হলো সেখানে। কিন্তু পুলিশের মেজাজ সনাতন। তারা এই আইন প্রত্যাহার করতে সম্মত হলো না। সুতরাং বেহারাবাহিনী ফিরে চললো। ফেরার পথে সুপ্রিম কোর্টের সামনের মাঠে আবার মিটিং হলো তাদের। গরম গরম বক্তৃতা হলো। পুলিশ-জুলুমের নিন্দা এবং সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি—ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চলে গেল যে যার বস্তিতে।

পাল্কী চড়েন যাঁরা, তাঁরা হাঁফ ছাড়লেন।—যাক বাবা, বাঁচা গেল। এ তাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা।—বেহারা আবার

মিছিল করে, মিটিং করে—ছোঃ!—দিনে দিনে কত কি-ই বা হবে!

কিন্তু আরও বিস্ময় ছিল তাঁদের জন্যে। পরদিন সকালবেলা ছোট সাহেবের ঠিকা পাল্কী অনুপস্থিত। মেজো সাহেব শ্বশুরবাড়ি যাবেন। হরকরা ঘুরে এসে বললো—পাল্কী নেই। বড় গিন্নী গঙ্গাস্নানে যাবেন—তাঁর পাল্কী তো এলো না এখনো! তাহলে সত্যি-সত্যিই ধর্মঘট করেছে বেহারারা।

সত্যি-সত্যিই ধর্মঘট! কোলকাতার নগর-জীবনে প্রথম যানবাহন ধর্মঘট। হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা শহরে। কাগজে কাগজে চিঠিপত্র লেখা হতে লাগলো—ধর্মঘটের পক্ষে এবং বিপক্ষে। ক্রমে ক্রমে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—মাইনে-করা বেহারাদের মধ্যেও। ঠিকা-ভাইদের সমর্থনে তারাও এসে দাঁড়ালো পেছনে। নগর-জীবন অচল হওয়ার উপক্রম হলো।

কিন্তু, আজকের মতো তখনও রুজিরোজগারহীন মানুষে ভর্তি দেশ। কোলকাতার ধর্মঘটী বেহারাদের তাই বিপদ এলো অন্য দিক থেকে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে ক্রমে ক্রমে দু-চারজন করে কোলকাতার রাস্তায় দেখা দিল রেওয়ানী বেহারা। এরা ধর্মঘটের সুযোগ নিয়ে দলে দলে পাড়ি জমাতে লাগলো কোলকাতায়। ধর্মঘট বানচাল হওয়ার উপক্রম দেখা দিল। কিন্তু উড়িয়া বেহারারা তবুও সংকল্পে স্থির।

অবশেষে তাদের টনক নড়লো আরও দিন কয় পরে। কিন্তু তখন চাকতি বেঁধেও পাল্কী ঘাড়ে নেবার সুযোগ আর অবশিষ্ট নেই আগের মতো। নতুন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তাদের ভাগ্যে। ব্যাপারটি হয়েছে কি! মিঃ ব্রাউনলো নামে এক সাহেব ছিলেন শহরে। তাঁরও পাল্কী ছিল একখানা। বেহারাদের হরতালে আপিস-আদালত করাই ভার হয়ে উঠলো সাহেবের। আচ্ছা

কাণ্ড! বিরক্তি আর ধরে না তাঁর। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, অথচ এদিকে ধর্মঘট শেষ হওয়ার কোন লক্ষণই নেই। অবশেষে একদিন ক্ষেপে গেলেন সাহেব। সারারাত্রি উত্তেজনায় পায়চারি করে বেড়ালেন ঘরময়। তারপর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজের পাল্কীখানার নীচে বসে বসে চাকা লাগালেন চারখানা। তারপর মেম-সাহেবের ছোট্ট আরবী ঘোড়াটা জুড়ে চেপে বসলেন তার মধ্যে। ঘট্ ঘট্ করে গাড়ি হাজির হলো আপিসের দরজায়।

—বের হলো "ব্রাউনবেরী গাড়ি।" আমরা বলি—"পাল্কী গাড়ি।" বেগতিক দেখ উড়িয়া বেহারারা হাতে টিকিট বেঁধেই ফিরে এলো যে যার কাজে। কিন্তু তাদের পাল্কী সব তখন ঘোড়ার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছে অনেক দূর।

ক্রমে "মোকাম কলিকাতায় ছ্যাকড়া গাড়ির উৎপাতে রাস্তা চলা ভার" হয়ে উঠলো। শুধু পাল্কী গাড়ি নয়, নানা রকমের গাড়ি। শ্রেণীভেদ আছে, জাতিভেদ আছে তাদের। কোনটা এক ঘোড়ার, কোনটা দুই ঘোড়ার। এমন কি চার ঘোড়া আট ঘোড়ার গাড়িও আছে শহরে।

শুরু হলো ঘোড়ার গাড়ির বড়মানুষী। হাজার হাজার টাকা ব্যয় হতো একখানা মনের মতো গাড়ি গড়তে। তারপর ঘোড়া আছে। যেমন গাড়ি তেমন ঘোড়া না হলে চলে না। তেমন কোচোয়ান ইত্যাদি না হলেও গাড়ির মান থাকে না। ঘোড়ার সাজ চাই, চাই কোচোয়ানেরও। সে এক রাজসিক ব্যাপর!

এমনি ঠিকাগাড়িও অবশ্য ছিল, কিন্তু গরীব লোকের সাধ্য ছিল না তাতে চড়া। সাহেবরাই সে সব গাড়ি রাখতেন—সাহেবরাই ভাড়া নিতেন। একটা দুই ঘোড়ার গাড়ির দৈনিক ভাড়া ছিল—ষোল টাকা, মাসে তুশ টাকা। মেম-সাহেবদের সন্ধ্যায় মার্কেটিংয়ের জন্যে আর একটু কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভাড়ার হার। মার্কেটিংয়ের জন্য গাড়ি নিতে হলে—তাদের দিতে

হতো প্রথম ঘণ্টায় আট টাকা, আর যদি এক ঘণ্টার বেশী লেগে যায় এবং দু' ঘণ্টা পুরো হওয়ার আগেই ছেড়ে দেয়, তবে মাত্র—বারো টাকা। দিব্যি লাভের কারবার। সাহেবরা জায়গায় জায়গায় আস্তাবল খুললেন। কশিয়াটোলায় এমনি অনেক আস্তাবল ছিল তখন। ছিল ধর্মতলায়ও। বিখ্যাত ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসায়ী চার্লস্ মেডেরিথের নামে কশিয়াটোলা—অর্থাৎ বেন্টিক স্ট্রীট অঞ্চলে রাস্তা আছে আজও একটা।

কিন্তু কোন ব্যবসাই একতালে চলে না। একদিন পাল্কীর জায়গায় ঘোড়ার মতো শহরের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির জায়গায় এসো দাঁড়ালো মোটর! সাহেব-মেমরা পরমানন্দে চেপে বসলেন তাতে। আরও তাড়াতাড়ি যাতায়াত হবে, হবে আরও আরামও। মেডেরিথরা ঘাবড়ালেন না উড়িয়া বেহারাদের মতো। তাঁরা আস্তাবলকে গ্যারেজ করলেন। কিন্তু বিপদ হলো সহিস-কোচোয়ানদের। সহিস থেকে কোচোয়ান হওয়া যায়—কিন্তু কোচোয়ান থেকে ড্রাইভার হওয়া কঠিন। অগত্যা তাই তারা পরিত্যক্ত ঘোড়া আর গাড়িখানাকেই আগলে পড়ে রইলো এখানে-ওখানে। আধ মরা ঘোড়া, ভাঙা গাড়ি, আর জীর্ণ সহিস প্রেতের মতো সেই থেকে টুক্‌টুক্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরে। আজও।

একার ইতিহাসটা যেখানে শেষ—হুক্কাটারও ইতি সেখানেই। জীবন যত অলস, গতি তত শ্লথ ; আর হুঁকোর নলটিও তত লম্বা। পাল্কী থেকে মোটর অবধি হুক্কার ইতিহাসটি সংক্ষেপে এই-ই। লোকে যখন পাল্কী চড়তো—তখন রূপোর গড়গড়ায় সোনা বাঁধানো নলে হুঁকো খেতো। তারপর যখন পাল্কী গিয়ে এলো ঘোড়ার গাড়ি তখন নল ছোট হয়ে হয়ে এলো এতো কাছে যে, নিজেই হাত বাড়িয়ে লাগানো যায় খোলা যায়। তারপর আজ মোটরের যুগে নল উঠে এসেছে সোজাসুজি মুখে। পাইপ, চুরুট,

সিগারেটের যুগ এটা। আজও লোকে ধূমপান করে। অনুসন্ধানীদের মতে—আগের চেয়ে বেশীই করে। কিন্তু সিনেমার ইন্টারভেলে, ট্রাম-স্টপেজে কিংবা রেস্তোরাঁর টেবিলে বসে ধোঁয়া পানের সঙ্গে সেদিনের ধুম-পানের তুলনা! কারণ ধুমপান তখন বাস্তবিকই ছিল ধুমপান করে ধোঁয়াপান। একটি মাত্র বিবরণ দিচ্ছি এখানে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এদেশের প্রধান সেনাপতি-পত্নী লেডি নুজেন্টের লেখা। হুক্কার অন্তিম যুগের বিবরণ। তবুও কোলকাতার হুঁকা-যুগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাবেন পাঠক এর থেকে। লেডি নুজেন্ট লিখছেন :

"হুঁকো জিনিসটি কিন্তু বাস্তবিকই অপূর্ব। এখন গভর্ণমেন্ট হাউসে হুঁকো খেতে অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী প্রধান সেনাপতি এবং তাঁর স্ত্রীর মতো আমি এবং স্যার জর্জ (তাঁর স্বামী) এ বিষয়ে আপত্তির কিছু দেখিনে। আমাদের কাছে এর গন্ধ তেমন কিছু আপত্তিকর কিংবা অসমর্থনীয় বলে মনে হয় না। তা ছাড়া হুঁকো নিষিদ্ধ করার অর্থ আমাদের সমাজের অর্ধেক লোককে তাদের অতিপ্রিয় আমোদ থেকে বঞ্চিত করা। আমরা তাই হুঁকো ব্যাপারে আপত্তি তুলিনি। আর বাস্তবিক পক্ষেই সামাজিক বৈঠকে এ একটা দেখবার জিনিস বটে!" তারপর সেই 'মহীয়সী' মহিলা বিবরণ দিয়েছেন এমনি একটা হুঁকো-বৈঠকের। কল্পনা করে দেখুন :—"বিরাট বৈঠকের আধাআধি লোকই হুঁকো খাচ্ছেন। গুড় গুড় করছেন, ধোঁয়া ছাড়ছেন। অদ্ভুত শব্দ উঠেছে সারা ঘরে। এক এক হুঁকোর এক এক রকম শব্দ। আমার মনে হয় —নলের দৈর্ঘ্য এবং হুঁকোতে গোলাপ জলের তারতম্যের ওপরই এই শব্দ-ভেদের কারণ নির্ভর করে। আমার দু'পাশে বসে দু'জন দু'রকম শব্দ করে খাচ্ছেন।"

মেয়েরাও খেত। লেডি নুজেন্ট নাকি একদিন দু'টান দিয়ে

কেশেই অস্থির। কিন্তু লেডি পামার ছিলেন ওস্তাদ হুঁকো-খেকো। তিনি নাকি তাঁর জাঁকজমকি হুঁকোবরদার নিয়ে হাজির হতেন বৈঠকে বৈঠকে। তবে মেয়েরা নিজের হুঁকোসহ হাজির হলেও তাঁদের নিজ হুঁকো টানা বড় একটা হয়ে উঠতো না। আসতে না আসতেই পুরুষেরা এগিয়ে ধরতেন নিজ নিজ নল। —ইফ্ ইউ প্লিজ্।

মহিলাটি হেসে হয়তো হাত বাড়াতেন কারও দিকে। সে ব্যক্তি তক্ষুণি একটা নতুন মুখনল লাগিয়ে দিতো নলেতে। উচ্ছিষ্ট নলটা তো আর দেওয়া যায় না কোন লেডিকে! এ করেই তিনি কৃতার্থ। অন্যরা তাঁর ভাগ্যে রীতিমত ঈর্ষান্বিত!

এতো সময়ও নেই এতো পয়সাও নেই। জীবন ক্রমেই কঠিন হয়ে এলো শহর কোলকাতার। সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়ে এলো হুঁকোর নলও। প্রথমে বন্ধ হলো সামাজিক বৈঠকে, থিয়েটারে তারপর ক্রমে ঘরে। অবশেষে ইংরেজ সমাজ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল হুঁকো। হুঁকোর গুড় গুড় আজ তাই এক্কার ঠকাঠকের মতোই দুর্লভ। তবুও শহর কোলকাতা আজও ধরে রেখেছে সেই যুগের স্মৃতি। এক্কা দেখতে চান চলে যান হওড়া কিংবা শিয়ালদহ স্টেশনে, দেখবেন প্রেতের মতো দীর্ঘ মিছিল করে দাঁড়িয়ে আছে অষ্টাদশ শতকের স্মৃতি। লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে পিঠের ঘায়ের। আর হুক্কা চান তো চলে আসুন লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানায়। পশ্চিমের ৪নং প্লটের দ্বিতীয় সারিতে দেখবেন কবর রয়েছে একটা। উপরে নাম লেখা এইচ. ভি. বেইলি, বি. সি. এস.। এই ভদ্রলোক কোলকাতার শেষ হুঁকোবীর। পরিচয়-লিপিতে দেখেছি ইনিই নাকি শেষ হুঁকো খেয়েছিলেন বেঙ্গল ক্লাবে। বাড়িতে হয়ত আজও কেউ কেউ খান, কিন্তু প্রকাশ্য ক্লাবে বেইলিই শেষ বীর, অষ্টাদশ শতকের সামাজিকতার প্রথম শহীদ।

।। অথ উত্তমর্ণ অধমর্ণ কথা ।।

সুখী কে? আমাদের শাস্ত্রে বলে—অঋণী আর অপ্রবাসী। কিন্তু কোলকাতার ইতিহাসের মত ঠিক তার উল্টো। জন্ম থেকেই কোলকাতা পরদেশীদের শহর। ভিনদেশীরা বরাবরই সুখী এখানে। বোধ হয় আজও। কিন্তু তার চেয়েও বেশী সুখী ঋণীরা। ঋণ না করে কোলকাতায় সুখে থাকা যায় না। আর প্রবাসী না হলে ইচ্ছেমত ঋণও মেলে না। কোলকাতা শহর তাই পরবাসীদের জন্য, আর অকুতোভয় ঋণীদের শহর।

কোলকাতার বাঙালী ঋণ করতে জানে না তা নয়, বিয়ের খরচ যোগাতে তারা বসতবাটী বাঁধা দিয়েছে, কিংবা পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে শ্রাদ্ধ ডেকে এনেছে পরবর্তী তিন পুরুষের. এমন নজীর অল্প নয় এখানে। কিন্তু এই সব অধমর্ণরা আসলে উত্তমর্ণের দলের। তারা সাধারণ বাঙালী নয়। ঘি তো পরের কথা, নুন তেলের জন্যেই রামা-শ্যামা বাঙালীর ধার জোটে না এ শহরে। ইংরেজ চালাক করে দিয়ে গেছে সেকালের উদারচরিত ঋণদাতাদের। তারা দোকানে দোকানে আজ ঝুলিয়েছে সেই ইংরেজী পদ্যটি যার মানেঃ 'আমার টাকা ছিল, বন্ধুও ছিল; বন্ধু টাকা নিল; বন্ধুও গেল টাকাও গেল।' এখানেই শেষ নয়। তারপর আছেঃ 'আজ নগদ কাল বাকী' আর 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'র লজ্জাকর রসিকতা। কোলকাতার বাঙালী আজ ধার দেয় না, দিতে চায় না; কেমন যেন কিপ্টে হয়ে গেছে তারা।

কিন্তু আগে দিতো। মুৎসুদ্দি মুৎসুদ্দিকে, বেনিয়ান বেনিয়ানকে

এবং সব ছোটরা সুযোগ পেলেই সব বড়কে। তবে প্রতিবেশীর চেয়ে পরবাসীকে দিতেই ছিল তাদের বেশী উৎসাহ। বিদেশী এলো। শহরে নামলো। কি-ই বা চাকরী, কতো আর মাইনে! কিন্তু দেশ ছেড়ে এই বিভূঁয়েই যখন এলাম তখন তিনখানা স্যুটে চলবে কেন? চললেই বা চালাবো কেন মাত্র গুটি পাঁচ বয় আর বেয়ারায়? 'নবাব' হতে হবে না? নবাবের মেজাজে চলতে হবে না? নবাবের মেজাজে চলতে হবে, খেতে হবে, থাকতে হবে। তারপর নাচগান জলসা আছে, জুয়া খেলা আছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের তো তাই হাতটান পড়তোই—এমনকি মুহুর্মুহু মূলধনে টান পড়ে যেতো চালু ব্যবসায়ীদেরও। লক্ষণ তার প্রকাশ পেয়েছে কি না পেয়েছে অমনি ছুটে এসে হাজির বাঙালী সরকার বেনিয়ান। 'সাহেব, কষ্ট যাচ্ছে? তা নাও না আমার থেকে? যখন সময় হবে দেবে। আমরা কি আর পর? তবে সুদ দিতে হবে। ওটা আমরা নিজের ছেলের থেকেও নিই। আসল ছাড়তে পারি কিন্তু সুদ ছাড়তে পারি না।' সুদের ভয়ে সাহেব ভীত নয়। তার কাছে বর্তমানটাই মুখ্য। আগামী সপ্তাহের আমোদ-আহ্লাদের প্রোগ্রামটি রক্ষা করাই তার আশু লক্ষ্য। সুতরাং সে নিঃসঙ্কোচে নিয়ে নিলো। যত খুশী। নিঃশব্দে দিয়ে দিলো বাঙালী সরকার মুৎসুদ্দি বেনিয়ান। শুভঙ্করীর আর্যা দিয়ে সুদ কষল মনে মনে। বাঙালীর ক্ষেত্রে ভ্যালুয়েশান কষল তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির। যত দেরীতে হয় ততই ভাল। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়বে। দেবে না? না দিয়ে যাবে কোথায়? আইন আছে। সাহেবের আইনেই ঘায়েল করবো সাহেবকে।

ঋণ দেওয়ার লোকের তখন অভাব ঘটতো না। বরং কখনও কখনও অভাব ঘটে যেত নেওয়ার লোকের। চার্লস মুর তাঁর The Sheriffs of Calcutta বইতে লিখেছেন: 'ঋণ না করলে তখনকার দিনের সায়েব সুবাদের মোটেই ভাল লাগতো না।

জীবনটা মনে হতো নেহাত মধ্যযুগীয়, একঘেয়ে। হাজার দশেক টাকা যে ঋণ না করেছে কোলকাতায় এসে, এখানে তার আসাই বৃথা।' দেবে কে? মুর সাহেব লিখেছেন:

Money was easily made, debts were easily contacted, and there seems to have been no end to the number of people willing to lend or give credit, and in such a happy state of society there were sure to be unlimited people ready to borrow and to spend.

ঋণ না করেই বা করবে কি? কোম্পানীর সংসর্গে যারা আছে ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাদের খাওয়া-পরার ভাবনা নেই বটে, কিন্তু শুধু খেয়ে থাকার জন্য কোলকাতা নয়। 'সুখে' থাকতে হলে মুঠো মুঠো টাকা চাই এখানে। অব্যবসায়ী ইংরেজদের কাছে ঘুষ খাওয়া আর প্রাইভেট ব্যবসা করা ছাড়া টাকা রোজগারের পথ ছিল তিনটি। হয় চুরি ডাকাতি, নয় জাল জুয়াচুরি, নয়ত—ঋণ করা। প্রথম দু'টোর ঝঞ্ঝাট ঝামেলার কথা শুনলেই বুঝতে পারেন—কেন শেষেরটি ছিল তাদের প্রিয়তম পন্থা।

ডাকাতি তখন একটা উল্লেখযোগ্য পেশা ছিল তরুণ ইউরোপীয়ানদের। দেশী ডাকাতদের সঙ্গে মিলে মিশে তারা দল করতো। তারপর ওৎ পাত্‌ত রাতের চৌরঙ্গীতে। শুধু চৌরঙ্গী কেন—পালিয়ে থাকার মতো বনের অভাব ছিল না তখনকার কোলকাতায়।

আর বন ছাড়া ডাকাতি হয় না, তাও নয়। আজকের বৌবাজারের ফরডাইস লেন—তখন ছিল গলাকাটা গলি। হাড়কাটা গলি, গুমখানা গলি আজও আছে কোলকাতায়।

যাহোক্, এমন ডাকাতও ছিল যারা দিনে কোম্পানীর কাজ করতো আর রাতে করতো ডাকাতি। ১৭৯১ সালের ক্যালকাটা

গেজেটে—একদল মিলিটারী ডাকাতের কথা পাওয়া যায়। তারা ময়দানে ডাকাতি করতো।

ডাকাতি করার ঝক্কি ছিল অনেক। প্রথম বিপদ ধরা পড়ার! ধরা পড়ে গেলে এ ব্যাপারে ইংরেজের আইন বড় কড়া। এমনি একটা লোককে খুন করলে—তার আইনে লেখে—এক টাকা জরিমানা, কিন্তু ডাকাতি বা রাহাজানি হলে নির্ঘাত ফাঁসি। ১৭৯৫ সালে স্থপ্রিম কোর্ট পাঁচজন সাহেব এবং একজন বাঙালীকে ফাঁসি দিয়েছিল—ডাকাতির অভিযোগে। ফাঁসিও যেমন যেমন তেমন নয়। কড়া ফাঁসি। যার বাড়িতে ডাকাতি করেছে, তার বাড়ির আশেপাশে ফাঁসি দিতে হবে। এবং যতক্ষণ না একেবারে মরে যায় ততক্ষণ ফাঁসিতে ঝুলবে। স্থপ্রিম কোর্ট তার রায়ে তাই লিখেছিল: Every one of them be hanged by the neck until they and each and every of them are dead!

ফাঁসি না হলে দ্বীপান্তর কিংবা বেত মারা অথবা পিলারীতে দাঁড়ানো। দ্বীপান্তর মানে, সাহেব হলে সেই ভ্যান ডায়মণ্ডস্‌ল্যাণ্ড বা ট্যাসমনিয়া, এতদ্দেশীয় হলে—আকিয়াব, মৌলমিন কিংবা প্রিন্স অব ওয়েলস্ দ্বীপ। কোলকাতাই যদি ছাড়তে হয়, তবে আর ডাকাতির ঝঞ্ঝাট কেন! বেত মারাটাও সহজ শাস্তি ভাববেন না। দশ আনা চুরির দায়ে রামজয় ঘোষকে বড়বাজারের দক্ষিণ কোণ থেকে বেত মেরে মেরে প্রকাশ্য রস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো উত্তর কোণে। তারপর আবার উত্তর থেকে দক্ষিণ। অবশেষে চিৎপুর ব্রিজের কাছে নিয়ে যখন ছেড়ে দেওয়া হলো তাকে, তখন কোলকাতার জীবনের সাধ তার মিটে গেছে চিরকালের জন্য।

অথচ ডাকাতিতে আর লাভ হয় কত? বড় রকমের ডাকাতি হলো চৌরঙ্গীতে রাত দশটায়। লোমহর্ষক ব্যাপার। পাল্কী চড়ে যাচ্ছিলেন মিঃ মাস্থক। তাঁকে সহসা আক্রমণ করে ডাকাতেরা গুরুতরভাবে আহত করে নিয়ে গেছে তাঁর সর্বস্ব।

কি ?—না তাঁর জুতোর বাকলস্‌গুলো (Shoe-buckles)! খুব বড় রকমের ডাকাতি হলো একটা কলুটোলায় চৈতন দত্তের বাড়িতে। জিনিসপত্রে এবং নগদে মিলিয়ে ডাকাতেরা যা নিয়েছে তা পরিমাণে ৬০০০৲ টাকা! প্রথমতঃ, মনে রাখুন এটা দত্ত মশাইয়ের নিজের এষ্টিমেট। তারপর মনে রাখবেন—খবরের কাগজের রিপোর্ট। এ দু'টো তথ্য মনে রেখে ডাকাতের হয়ে জিনিসপত্রগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করুন তারপর ভাগ করুন নিজেদের দলের মধ্যে; দেখুন—কত করে পড়ে মাথা-পিছু। দেখবেন কিছুই না। একটা রাইটারও তার বেশি রোজগার করে কলম পিষে।

সুতরাং চুরি-ডাকাতির চেয়ে তখন লোক বেশি করতো ঋণ। ১৮০২ সালে জেলের হিসাবে মোট কয়েদীর সংখ্যা দেখলেই বুঝতে পারবেন—আমার অনুমান গল্প নয়। সে বছর কোলকাতার জেলখানায় মোট কয়েদী ছিল—৭২ জন। তার মধ্যে ২৮ জন চোর ডাকাত আর ৪৬ জন ঋণগ্রস্ত। ডাকাতদের মধ্যে ১৩ জনই আবার ইউরোপীয়ান। ঋণের ঝামেলা অনেক কম। তাই এত ভীড়। তাছাড়া পন্থাটি রীতিমত সম্মানজনকও। কি আর হবে! না হয় শেষ অবধি জেল হবে। এর বেশী তো আর নয়!

ঋণগ্রস্তদের জেলের জীবন যদি শোনেন—তবে আপনারও ইচ্ছে হবে জেল খাটতে। স্বদেশীওয়ালারাও জেলের এতো মজা লুটতে পারেনি, যত লুটেছে কোলকাতার এই সব বিদেশী অধমর্ণরা। সত্যিই যেন জেলখানা ছিল ওদের শ্বশুরবাড়ি! বোধ হয়—ওদের জেল-জীবন দেখেশুনেই জেলখানাকে শ্বশুরবাড়ি ভেবেছিল এদেশের লোক।

আমাদের এডিটর হিকির কথা শুনেছেন বোধ হয়। ঋণের দায়ে জেল খাটতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিলেন তখন আর এক হিকি, এডিটর হিকির পক্ষের উকিল হিকি। তিনি তখনকার জেল-জীবনের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। জেলখানা তখন লালবাজারে। ওখানেই ছিল অনেক দিন। তারপর ওটাকে উঠিয়ে আনা হয় ময়দানের এক কোণে। আজ যেখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সেখানে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি করার সময় ওটাকে সরিয়ে নেওয়া হয় আলীপুরে।

যাক্ সে কথা। এডিটর হিকির নাকি পছন্দ হতো না জেলের ঘরগুলো। ছোট ছোট ঘর। তিনি তো আর চুরি-ডাকাতি করে জেলে আসেন নি। তিনি কেন থাকতে যাবেন ওখানে! গরীবিয়ানা মতো বাঁশ, খড় দিয়ে তিনি নিজের জন্যে তাঁবু করে নিলেন একখানা। জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে সেই তাঁবুতে বসেই তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাগজ—বেঙ্গল গেজেট! সুতরাং বুঝুন এবার সেদিনের কোলকাতায় অধমর্ণের স্বাধীনতা কি ছিল!

কাগজ চালানো বা নিজের ব্যবসা চালানো তো সাধারণ ব্যাপার। অনেক অসাধারণ কারবারও করতে পারতেন তখনকার দিনের ঋণীরা। হরিণবাড়ি জেলে নাকি এক স্বর্গপুরী বানিয়ে তুলেছিলেন তাঁরা। ময়দানের জেলখানাকেই বলা হতো হরিণবাড়ি। কেন সঠিক কেউ জানে না। কেউ কেউ বলতেন—ওটি ছিল নবাব সিরাজদ্দৌলার হরিণ শিকারের স্থান। আবার কেউ কেউ বলেন—নবাবের গৃহপালিত হরিণ ইত্যাদি প্রাণীর জন্যে ওখানে বাড়ি ছিল একখানা এবং তাই থেকে পরবর্তী কালের জেল-বাড়িটার নাম হয়ে যায় হরিণবাড়ি। যা হোক, এই হরিণবাড়িতে ছিল অধমর্ণদের ভিড়। ছোট-বড় নানা আকারের অক্ষম ঋণী বিচারান্তে প্রেরিত হতেন ওখানে।

কিন্তু কে বলবে, এরা অর্থাভাবে আছে কিংবা জেলে আছে? সন্ধ্যায় ওদিকের পথচারিরা বিস্মিত চোখে দেখতো হরিণবাড়ির ছাদে খোলা আকাশের নীচে জলসা বসেছে। উল্লসিত চিৎকার আর নেটিভ বাইজীর গানের সুর ভেসে আসছে কানে। নাচ-গান-হৈ-হল্লা। শুধু কয়েদীরা নয়,—বাইরে থেকে আমন্ত্রিত হয়ে তাদের বন্ধু-বান্ধবরাও যোগ দিতেন এ সব উৎসবে।

উৎসবও প্রায়ই হতো, প্রায় প্রতিদিন। খাওয়া-থাকার খরচা সরকারের। দৈনিক সে জন্যে বরাদ্দ করা আছে দু'আনা, মাসে একুনে চার টাকা। এতদ্দেশীয় হলে তার অর্ধেক—দু'টাকা। এতে চলবে কেন? কয়েদীরা তাই ঋণের দায়ে জেল খাটতে খাটতেই আবার ঋণ করতো। না হয় আরও দু'বছর থাকতে হবে এখানে। তা অসুবিধে কি? John Maclachlin নামে এক কয়েদী ছিলেন—তিনি বললেন, দেখো জেলে থেকে আমার শরীর কি হয়েছে! জেল খাটবো বলে শরীর খোয়াব নাকি? ঘোড়া চাই। বাড়ি থেকে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর ঘোড়া আসতো—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে দু'বেলা নিয়মিত ঘোড়ার পিঠে চড়ে চক্কর খেতেন তিনি জেলের ভেতরে। কেউ কেউ বাড়ি থেকে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আসতেন। এক সঙ্গে থাকতেন। যাঁরা অবিবাহিত তাঁরা নিয়ে আসতেন—মিস্ট্রেস্। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে। "It was all open and unashamed and there was no pretence or disguise about the matter." যার যা ইচ্ছে। কেউ কেউ খাবার আনাতেন বাড়ি থেকে, কেউ কেউ নিজ নিজ চাকর-বাকর রাখতেন নিজেদের সঙ্গে। এ সব তো আছেই, তারপর আছে "an eternal flow of brandy!" মদ, মেয়েমানুষ, ঝি-চাকর, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম কিছুই আপত্তি নেই এখানে। একটি মাত্র সর্ত,—যা করবে করতে হবে চার দেওয়ালের মধ্যে।

ইংরেজের আইনকে অস্বীকার করতে পারবে না, এড়াতে পারবে না, এড়াতে পারবে না বন্দিত্বকে।

টিপু সুলতানের ছেলে মুয়াজুদ্দিন একবার ছিলেন এই কারাবাসে। মাসে তিন শ' টাকার ওপর হতো শুধু তাঁর বাজার খরচ। তাঁর নিজস্ব ধোপা, নাপিত, দর্জি সব ছিল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর বিছানাটির দামই ছিল নাকি চার শ' টাকার ওপর। অর্থাৎ সুলতান-পুত্র মুয়াজুদ্দিন আগে যা ছিলেন, তাই রইলেন। শ্রীরঙ্গপট্টম ছেড়ে কোলকাতার হরিণবাড়িতে এই যা!

কেরানীপুত্ররা এতোটা পারতেন না। কেউ কেউ আবার হতভাগ্যও ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু সে নেহাত ভাগ্যবিভ্রাট! ১৭৯৫ সালের হরিণবাড়ির সংবাদ। রাউল্যাণ্ড স্কট নামে এক ভদ্রলোক ঋণের দায়ে জেলে এসেছেন। ৯০০০ সিক্কা টাকার অনাদায়ে। আঠারো বছর পরে সুপ্রিম কোর্টে মানবতার নামে তিনি কেঁদে-কেটে আবেদন পাঠালেন মুক্তির জন্যে। চল্লিশ বছরের স্কট তখন ষাট বছরের বৃদ্ধ। এমন স্বপ্নপুরীতে এমন ঘটনা তা হলে সম্ভব হলো কি করে? না, আইনে।

স্কটের পাওনাদারটি ছিলেন নিশ্চয়ই কোন জাঁদরেল লোক। নয়তো—ন' হাজার টাকার জন্যে তিনি আরও সোওয়া হাজার টাকা নিশ্চয়ই খরচ করতেন না। ব্যবসায়িক বুদ্ধি তা করতে দিতো না সেকালে। বলতে পারেন কি করে খরচ হোল তার? সে এক মজার আইনে। নিয়ম ছিল ঋণী ব্যক্তিটির বিষয়-আসয় যদি কিছু না থাকে, তবে তার জেল-খরচা যোগাতে হবে পাওনাদারকে। যতদিন পাওনাদার সেটি জুগিয়ে যাবে, ততদিনই জেলে রাখা হবে তাকে। স্কটের পাওনাদার আঠারো বছর রেখেছিলেন বেচারাকে। নিশ্চয়ই এমন পাওনাদার সেদিন কম ছিল। থাকলেও আজকের কোলকাতার অধমর্ণদের কাছে গতকাল স্বর্গ।

॥ মশা থেকে ম্যালেরিয়া ? ॥

লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে হেঁটে চিড়িয়াখানা গিয়েছেন কখনও ? কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অথবা রেসকোর্স ? তাহলে জায়গাটা চিনতে মোটেও অসুবিধা হবে না আপনার। পি, জি, হসপিটাল-এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়। হালে যাকে বলে—সুখলাল কার্নানি হাসপাতাল—তার কথাই বলছি। চৌরঙ্গি রোডের পর ক'পা যেতে না যেতেই বাঁ দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে কার্নানি হাসপাতালের লৌহ-ঘের। এখান থেকেই শুরু হাসপাতালের সীমানা। এগিয়ে যান আরও কয়েক পা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই। সঙ্গে যদি ছোট ছেলেমেয়ে থাকে তবে সেই টেনে ধরবে আপনার জামার কোণটা।

থামলেই দেখবেন আপনার সামনে একটা লাল রঙের তোরণ। তাতে একটুকরো সাদা পাথরে লিখিত কয়েকটি ছত্র। তোরণশীর্ষে কাল পাথরে খোদাই করা একটি আবক্ষ মূর্তি।

ঘটনাটা এদিক থেকে কিছু নয়। তোরণটি চন্দননগর বা মহীশূরের কোন বিজয় তোরণ নয়। লাইন কয়টি ক্লাইভ, ওয়াটসন বা আউটরাম, লরেন্স-এর মত কোন বীরের বীরত্ব-গাথা নয়। সামান্য কথা। ছোট্ট একটি সংবাদ। বাংলা করে বললে যার মানে দাঁড়ায়—এখান থেকে, এই তোরণটি থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরের ঐ ছোট্ট গবেষণাগারটিতে এই ভদ্রলোক একদিন আবিষ্কার করেছিলেন—মশা ম্যালেরিয়ার বাহন।

মশা থেকে ম্যালেরিয়া, আপনার নয় বৎসর বয়স্ক পুত্রটি হয়ত হেসে ফেলবে খবরটি শুনে। কে না জানে আজ মশা ম্যালেরিয়ার বাহন ? হয়ত মনে মনে একটু বিস্মিত হবেন আপনি

নিজেও। আবিষ্কারটা তুচ্ছ বলে নয়, ঘটনা এখানে ঘটেছিল বলে। মশা এবং ম্যালেরিয়ার যোগাযোগ না জানে পৃথিবীতে আজ এমন শিক্ষিত লোক নেই। কিন্তু আপনার মত তাদের অনেকেরই জানা নেই—এই যোগাযোগটা আবিষ্কৃত হয়েছিল একদিন আপনারই শহরে। এই কলকাতায়।

'রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি।'—কলকাতার সঙ্গে মশার যোগাযোগ অনেক দিনের। এ-শহরে থাকতে হলে মশা-মাছি নিয়ে থাকতেই হবে। ঈশ্বর গুপ্ত তা-ই ছিলেন। আমরাও তাই আছি। কিন্তু যাকে বলে সেই থাকার মত থাকা সে ছিলেন মাত্র একজনই। আপনার সামনে ঐ কাল পাথরের মূর্তিটি যাঁর তিনিই।

কত সাহেব-ই ত এসেছে কলকাতায়। রাতের পর রাত মশার অত্যাচারে তারা ছটফট করেছে বিছনায় পড়ে। কখনও ঘরময় ছুটে বেড়িয়েছে মশা-শিকারের ব্যর্থ চেষ্টায়। কিন্তু পরিবর্তে এই ছোট্ট কীটটির মৃত্যুকামড়ের শিকার হয়েছে নিজেরাই। মুরদের চেয়েও ইংরেজরা তাই বেশী ভয় করত মশাকে। মরে মরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল নেটিভেরা। কিন্তু ইংরেজরা তখনও এভাবে মরতে শেখেনি। ফলে মশা ছিল তাদের কাছে আতঙ্ক। কোকিল নিয়ে ইংরেজ কবিরা কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ কবির অন্যতম বিষয় ছিল সেদিন মশা। 'মশা' নিয়ে কত কবিতা কত গান যে আছে 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' সাহিত্যে তার ইয়ত্তা নেই।

সব-ই হয়েছে। গান, গালাগালি, মশারির উদ্ভাবন—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটি সেটি হল অনেক, অনেক দিন পরে। অবশেষে সার্ রোনাল্ড রস যেদিন কলকাতায় এলেন সেদিন।

সাধারণত, লোকে জানে এনোফেলিস্ মশা যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহ থেকে দেহান্তরে বয়ে নিয়ে যায় রোনাল্ড রস এই তত্ত্বটিরই

আবিষ্কারক। একারণেই অবশ্য ১৯০২ সনে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 'সার্' থেকে আরও পঞ্চাশটি সম্মান পদকের কারণও অবশ্য তাই। কিন্তু জীবনী পড়লে মনে হয় রোনাল্ড রস-এর জীবনে এ আবিষ্কারটা নেহাৎই আকস্মিক ঘটনা নয়।

জন্মেছিলেন তিনি ভারতেই। আলমোড়ায়। ১৮৫৭ সনের ১৩ই মে। বারটা ছিল শুক্রবার। একে থার্টিনথ্, তার উপর ফ্রাইডে! মা বাবা ভেবেছিলেন ছেলেটা বোধ হয় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মাল।

কিন্তু ক'বছর বাদেই দেখা গেল ব্যাপারটা উল্টো। যাতে হাত দেন রস্ তাতেই তিনি বিজয়ী। ইচ্ছে ছিল চিত্রকর হবেন। কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড ড্রয়িং-এর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রমাণ করলেন—ইচ্ছাটা স্বপ্নমাত্র নয়।

লিওনার্দো না হয়ে বিটোফেন? তাও যে একেবারে আকাশকুসুম কল্পনা তাঁর কাছে তাও নয়। শেলি বায়রনের কবিতায় রস্ অহরহ সুর যোজনা করতেন। কবিতাও লিখতেন নিজে। শুধু কবিতা নয়, ছোট গল্প, নাটিকা,—এমনকি উপন্যাসও। তাঁর একখানা উপন্যাস চাইল্ড অব ওসান-কে সমালোচকেরা একদিন ঠেলে দিয়েছিলেন ক্লাসিকের তালিকায়।

বহু দেশভ্রমণকারী রস্ বহুভাষী ছিলেন। ইতিহাস, দর্শন, গ্রীক এবং, রোমান ও ইউরোপীয় সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। কিছুকাল লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন তিনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি হল। জাহাজে সার্জেনের চাকরি এবং অবশেষে ভারতে আর্মি মেডিকেল সার্ভিসে। ভারতের বাইরে এশিয়া আফ্রিকার বহুদেশে যেমন কাজ করেছেন রোনাল্ড রস তেমনি কাজ করেছেন কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও আরও অঞ্চলে। কিন্তু কলকাতার গর্ব—এখানে জনচক্ষে সাফল্য লাভ করেছিলেন অলুক্ষণে শুক্রবারে-জাত এই লোকটি!

এই তোরণটি থেকেই তাকিয়ে দেখুন ঐ আটপৌরে বাড়িটিকে। মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখুন সেই চিত্রটি। অপরিসর ঘরে সাবেকি যন্ত্রপাতি নিয়ে একাকী সাধনায় মগ্ন আছেন এই বিজ্ঞানী। টিউবে টিউবে রকমারি মশা, নরদেহের রক্ত।

১৮৯৭ সনের ২০শে আগস্ট ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সার্জন। প্রথমে খবরটা শুনতে পেল সহকর্মীরা। তারপর ক্রমে বিশ্ববাসী। মধ্য-এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকার লক্ষ লক্ষ জ্বরকাতর রোগী কাঁপতে কাঁপতে শুনতে পেল পৃথিবীতে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুদূতকে চিহ্নিত করে ফেলেছেন জনৈক মানবহিতৈষী। কোথায়? না কলকাতায়। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে—ঐ ছোট্ট ঘরটিতে।

॥ 'কাজী' থেকে 'মাননীয় বিচারপতি' ॥

শতক সম্পূর্ণ হল। স্ব-পরিচয়ে, সগৌরবে একশ'টি বছর স্বভাবতই শুধু কলকাতার নিসর্গে নয়, বাংলাদেশ তথা বাঙ্গালীর অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে হাইকোর্ট আজ অঙ্গাঙ্গিপ্রায়, একাত্মীভূত। সুতরাং বাঙ্গালীর কাছে অন্তত নতুন করে তাকে চেনাবার প্রশ্ন ওঠে না।

রাজধানীর কথা উঠলেই যেমন আজও অনিবার্যভাবেই বাঙ্গালীর বুক ঠেলে ওঠে ওল্ড পোস্ট-অফিস স্ট্রীটের প্রকাণ্ড সেই রক্তবর্ণ বাড়িটার কথা, তেমনি এই শতবার্ষিকী দিনে হাইকোর্টের কথা বলতে গিয়ে কেন জানি মনে পড়ে অখ্যাত সেই 'বাঙ্গাল' কবিটির কথা, যিনি একদা 'দ্বার সায়রের কবিতা' নামে একটি পদ্যে বাঙ্গালীর মনে ভবিষ্যত হাইকোর্টের ভিত্তি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামের কবি জনৈক রামপ্রসাদ মৈত্র সেদিন নগরের সভাকবিদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে গেয়েছিলেন—

'অপূর্ব শুনহে সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইয়া সাহেবরূপী।
ছাড়িয়া আহ্নিক পূজা
পরিধান কুর্তি মোজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী ॥
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে
কৈলকাতা পুরাণা কুঠি আদি।
গতামল সুভেদারী শুভ সন বাহাত্তরী
আংরেজ আমল তদবধি ॥'

কবির মতে ১৭৬৫ সনে দেওয়ানি লাভের দিন থেকে নয়, এদেশে ইংরেজ আমল সুরু হয়েছে, সাত বছর পরে ১৭৭২ সন থেকে।

কেননা, সে বছর থেকেই জেলায় জেলায় ইংরেজী আদালত,—'দ্বার সায়র' বা দায়রা সেসন।

কবিতাটির রচনাকাল বাংলা ১২২০ সালের কার্তিক। সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন, হাইকোর্ট তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি। কিন্তু তা-হলেও এ কবিতায় তার সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত রয়েছে, তেমন বোধ হয় কোন সরকারি দলিলেও নেই। কেননা, প্রায়শ ইতিহাস পাঠক হিসেবে আমরা যে ভুলে পড়ি, পাবনার কবি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইংরেজের আদালত তাঁর কাছে বিচারালয় মাত্র নয়,—ইংরেজ রাজত্বের, ইংরেজ প্রভুত্বেরই প্রতীক মাত্র।

"দিনেক দুই গতে
হুকুম জারি ফৌজদারিতে
যে মত প্রতিমা পূজা হয়।
তবে শুন তার মজা যেমত হইল পূজা
প্রতিমা হইলা সাহেব আসি।
কাদিরা আসন করি সমুখেতে মেজ ধরি
পূজা লন পূর্ব মুখে বসি॥"

হাইকোর্ট এই নবদেবতার অধিষ্ঠান পরবেরই সর্বশেষ অধ্যায়, স্বপ্নাদিষ্টপ্রায় ইংরেজ সাম্রাজ্য সাধকদের শেষ মন্দির। এ অট্টালিকার কাহিনী শুধুই ইঁট কাঠ পাথরের কথা নয় তথাকথিত 'ইংলিশ জাস্টিস' বা বিলিতি ন্যায়ধর্মের কাহিনীও নয়। এর সঙ্গে জড়িত ইংরেজের জটিল সাম্রাজ্য-সাধনার ততোধিক জটিল ইতিহাস।

প্রধানত রাজস্ব আদায়ের চিন্তা থেকেই একদিন উদ্ভূত হয়েছিল—আইন এবং আদালতের প্রশ্ন। নয়ত বার্নিয়ারের মত দর্শক হিসাবে শুধু নয়, ইংরেজরা এই কলকাতা শহরে নিজেরাও যে কাজীর মত বিচার করেছেন কলকাতার প্রথম সাহেবী আদালত 'মেয়রস কোর্টে', এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আদালতগুলিতে তার নজীর যথেষ্ট। ফাঁসি দেওয়ার অধিকার ছিল না বলেই ছিঁচকে চোরের জন্যে শাস্তি ছিল

তখন মৃত্যু না হওয়া অবধি বেত্রাঘাত! একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেনঃ নৃশংসতায় বিশেষ দীক্ষা না থাকলে এর সঙ্গে মোগলাই বিচারের পার্থক্য বোঝা সত্যই কষ্টকর!

ইংরেজাধীন কলকাতায় তখন বিচারালয়ের অভাব ছিল না। 'কোর্ট অব রিকোয়েষ্ট' নামে আদালত ছিল একটা। সরকার মনোনীত চব্বিশ জন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন সেখানে বিচারক। আজকে যেখানে লালবাজার সেখানে প্রকাশ্য রাস্তার ওপরে ছিল তাঁদের আদালত। সে আদালতে রায় যাঁরা দিতেন তাঁরা স্থানীয় লোক ছিলেন বটে, কিন্তু যাদের আশ্রয়ে সে-সব অমানুষিক রায় কার্যকর করা হত, মনে রাখতে হবে তাঁরা ছিলেন কুঠিয়াল ইংরেজ!

স্থানীয় দেশীয়দের এই নিম্ন আদালতটির পরেই ছিল সাহেবদের পরিচালিত কলকাতার স্বনামধন্য 'মেয়রস্ কোর্ট'। তার বিচারকদের মধ্যে থাকতেন স্বয়ং নগরাধিপ শেরিফ, সাতজন খাঁটি ইংরেজ এবং বত্রিশ জন দেশীয় খ্রীষ্টান। তবে তাঁদের প্রত্যেককে প্রটেস্ট্যাণ্ট হওয়া চাই। তাঁদের বিচারধারার কথা আগেই বলা হয়েছে।

'মেয়রস্ কোর্টের' পরেই ছিল কলকাতার জমিদারের নিজস্ব আদালত, উপরে কোর্ট অব আপিল বা গভর্নরের বিচারসভা। শহরের অন্যতম বিখ্যাত জমিদার (১৭৫২-৫৬) হলওয়েলের নিজের জবানীতে তাঁর বিচারক জীবনের কাহিনীঃ জমিদার দেওয়ানি এবং ফৌজদারি ছু'-রকমের বিচারই করে থাকেন।

He tried in a summary way, had the power of the lash, fine and imprisonment, he determined all matters of meum and tuum, and in all criminal cases proceed to sentence and punishment immediately after hearing, except when the crime requires the lash to be inflicted until death...........

সেখানে প্রধান 'কাজী' অর্থাৎ স্বয়ং গভর্নরের সম্মতি লাগত।

১৭৬৫ সনে দেওয়ানি লাভের পরক্ষণেই বোঝা গেল এই ব্যবস্থা ইংরেজের সুনামের পক্ষে হানিকর না হলেও ইংরেজ রাজত্বের পক্ষে মোটেই শুভঙ্কর নয়। সুতরাং অচিরেই দেখা গেল তাঁরা বিচারধারা পরিবর্তনে মনযোগী হয়ে উঠেছেন। দেওয়ানি—রাজস্ব আদায়ের অধিকার মাত্র। তার সঙ্গে বিচার অধিকারের 'আইনত' কোন যোগ নেই। কিন্তু ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করতে সঙ্কল্পবদ্ধ; সুতরাং ছ'টি বছর কাটতে না কাটতেই দেখা গেল তাঁরা নামান্তরে ন্যায়দণ্ড হাতে তুলে নিয়েছেন। সে ১৭৭২ সনের কথা। সেদিনই মনে মনে ভারতের মাটিতে ভবিষ্যত হাইকোর্টের সম্ভাবনা বীজ হিসেবে রোপিত।

পাবনার কবির মত অনেককে চমকিত করে সে বছর প্রতি জেলায় ছুটি করে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হল। একটি দেওয়ানি আদালত, অন্যটি ফৌজদারি। রাজস্ব-ভাবনা থেকে জাত বিচারালয়। সুতরাং জেলায় যিনি কালেক্টর তিনিই নিযুক্ত হলেন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে পাশে রাখা হল স্থানীয় নমুনা—একজন করে দেওয়ান। কবির কথায়ঃ

'বুঝিলাম হক বটে জজ সাহেব ধর্ম বটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওয়ান।'

সর্বোচ্চ দেওয়ানি আদালত হিসেবে সে বছরই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল—সদর দেওয়ানি আদালত। আজকের চৌরঙ্গির সদর স্ট্রীটের একটি বাড়িতে পুণ্যাহ হয়েছিল তার। তারপর স্থানাভাব হেতু সেটি স্থানান্তরিত হয় আজ যেখানে ভবানীপুরের মিলিটারী হাসপাতাল সেখানে। হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিল—বিখ্যাত সদর দেওয়ানি আদালত। উল্লেখযোগ্য, দেওয়ানি বিচারের প্রায় ষোল আনা অধিকার হাতে তুলে নিলেও, '৭২ সনের সেই ব্যবস্থায় ফৌজদারি বিচার ছিল বলতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণত দেশীয়দের এক্তিয়ারে। সেখানে কাজী, বক্সী, নাজির, মোল্লা এবং

গঙ্গাজলীদেরই আধিপত্য। শুধু জেলা আদালতগুলিতে নয়, সর্বোচ্চ ফৌজদারি ধর্মাধিকরণ সদর নিজামত আদালতের ক্ষেত্রেও তাই ছিল নিয়ম। সদর দেওয়ানি আদালতের দপ্তর ছিল যেমন কলকাতায়, সদর নিজামত আদালতের দপ্তর তেমনি মুর্শিদাবাদে। এখানে বিচারপতি ছিলেন যেমন গভর্নর এবং কাউন্সিল সদস্যগণ, সেখানে তেমনি নায়েব নাজিম। বলা বাহুল্য, রাজস্ব আদায় চিন্তা না হয়ে ইংরেজী-ন্যায় প্রবর্তন ধ্যান হলে এই দ্বৈত ভঙ্গীতে কিছুতেই সেদিনের ইংরেজদের রাজী করানো যেত না।

রাজস্ব-ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করার চিন্তায় তখন নিত্যনতুন বিচারবিধি, নিত্যনতুন বিচার বন্দোবস্ত। ১৭৭৪ সনে জেলা আদালত-গুলোর অধিকার আবার ছেড়ে দেওয়া হল 'আমিল'দের উপর। তারপর ১৭৮১, '৮৬, '৮৭, '৯০ সনে দফায় দফায় রকমারি হতে হতে অবশেষে ১৭৯৩ সনের বিখ্যাত কর্ণওয়ালিশ-বিধি।

'৮৭ সনে কর্ণওয়ালিশ ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদ বাদ দিয়ে জেলা আদালতগুলোকে আবার কালেক্টরের অধীন করলেন। ক্রমে সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে আবার (আর একবার হেস্টিংসও তা করেছিলেন) কলকাতায় স্থানান্তরিত করলেন এবং জেলায় ফৌজদারি আদালতগুলো উঠিয়ে দিয়ে কলকাতা মুর্শিদাবাদ পাটনা এবং ঢাকায় চারটে সার্কিট কোর্ট স্থাপন করলেন। তাঁরা বছরে দুবার নিজ নিজ এলাকায় বিচার করতে বের হতেন। এক কথায় আগে যা ছিল অনিশ্চিত পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে কোন মতে খাপ খাইয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টায় গোঁজামিল মাত্র, কর্ণওয়ালিশ তাকেই এবার দৃঢ় ইস্পাত মুষ্টিতে আনলেন। তিনিই হাইকোর্ট তথা আইনের শাসনকে চাক্ষুষ করে তুলেছিলেন।

তবে হাইকোর্টের সুউন্নত সেই শীর্ষের সঙ্গে সঙ্গে '৭২ থেকে '৯৩ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে '৯৩ থেকে ১৮২৮ বা তৃতীয় পর্যায়ের ১৮২৯ থেকে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত অসংখ্য পদক্ষেপের ইতিবৃত্ত জড়িত থাকলেও এ

বাড়ির অবয়বে সবচেয়ে স্পষ্ট যে ইংরেজী ন্যায়ের কঙ্কালটি তার নাম —সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সদর দেওয়ানি আদালতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৭৭৪ সনে। এর জন্মসূত্র সর্বজনবিদিত রেগুলেটিং অ্যাক্ট। সেই নতুন চার্টার অনুযায়ী কলকাতার ইংরেজ আদালত ভেঙ্গে গেল এবং তার জায়গায় ছাড়পত্র পেল নতুন আদালত সুপ্রিম কোর্ট।

জাহাজটার নাম ছিল—'আর্ল অব আসবার্নহাম'। ১৭৭৪ সনের ১৪ই অক্টোবর ইম্পে, হাইড, চেম্বার্স এবং লেমাস্ত্রে (Lemaistre) —চার চারজন বিচারককে নিয়ে সেই জাহাজ নোঙ্গর করল এসে কলকাতার উপকূলে খিদিরপুরে। কলকাতা সভয়ে এবং সশ্রদ্ধায় দেখল তাঁদের হাতে হাতে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের নিয়োগপত্র।

এক সপ্তাহ পরেই, অক্টোবরের ২২ তারিখে শুরু হল কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের জীবন। সদ্যজাত আদালতের জন্যে উপযুক্ত কোন বাড়ি ছিল না শহরে সুতরাং মেয়র বাহাদুরের পুরানো কোর্ট বাড়িটাই ছেড়ে দেওয়া হল ওঁদের। সেই বাড়িটা ছিল ওল্ড কোর্ট হাউসের প্রান্তে লালদিঘির যে কোণটিতে আজ সেণ্ট এণ্ড্রুর গির্জা ঠিক সেখানটায়। বাড়িটার তখন মালিক ছিলেন সেণ্ট জন চার্চ কর্তৃপক্ষ। আদালত বাবদে কোম্পানি তাদের ভাড়া দিতেন। তাছাড়া অন্য ভাড়াটেও ছিল। ওপর তলায় প্রায় প্রায়ই জলসা এবং খানাপিনা হত।

ইম্পে প্রধান বিচারপতি। তিনি মেজাজী লোক ছিলেন। মেকলে তাঁর সম্পর্কে লিখে গেছেন—'the Chief-Justice was rich, quiet and infamous. His conduct was a piece with almost every part of it that comes under the notice of history. No such judge has dishonoured the English ermine, since Jeffreys drank himself to death in the tower'.

তরুণ প্রধান বিচারপতির বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। অন্য তিনজন 'পিউনি' জজের মধ্যে হাইড ছিলেন পরম বিলাসী। ইম্পে স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—

'....He is an honest man but a great coxcomb. His tongue cannot be still, and he has more parde and pomp than I have seen in the East.'

সুতরাং মাস কাটতে না কাটতেই তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। দীর্ঘ চিঠি গেল কর্তৃপক্ষের কাছে, প্রথম কথা আমাদের মাইনে তো দিচ্ছেন, কিন্তু টাকার বদলে শিলিং দেবেন ক'খানা তা অনুগ্রহ করে বলুন দেখি শুনি? দ্বিতীয়ত, অগোণে জানাবেন এ বাড়িটি কবে বদলাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ সেদিনই উত্তর দিলেন—জান ত, কোম্পানির অর্থকষ্ট।

অর্থকষ্ট। সুতরাং, সাত বছর একটানা এই বাড়িতেই ছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারপর বহু কষ্টে খবর পাওয়া গেল আর একটি বাড়ির। গঙ্গার কাছাকাছি চৌরঙ্গির ওপরে সে বাড়িটির মালিক জনৈক আর্চিবল্ড কের। তিনি জানিয়েছেন—মাসে সতের শ' টাকা ভাড়া পেলে তিনি বাড়ির আসল অংশটুকু ছেড়ে দিতে রাজি। বিচারপতিদের সে বাড়িও পছন্দ নয়। সারাই করে নিতে পারলে হয় বটে কিন্তু তাহলেও খরচ পড়ে যায় প্রায় ষাট হাজার টাকা!

সুতরাং উপায়ান্তরহীন কোম্পানি অগত্যা বাধ্য হয়ে ভাড়াই নিয়ে নিলেন বাড়িটা। ভাড়া মাসে—দু'হাজার টাকা! ১৭৮২ সনে সে বাড়িতেই উঠে এল কলকাতার তৎকালীন মহাধিকরণ সুপ্রিম কোর্ট। দশ বছর পরে ১৭৯২ সনে ভেঙ্গে ফেলা হল লালদিঘির কোণের পুরানো বাড়িটা। সেই বাড়ি—যেখানে ১৭৭৫ সনে একদিন মাঝ রাত্তির অবধি মোমের আলোয় বিচার হয়েছিল মহারাজ নন্দকুমারের, যেখানে মাদাম গ্রাণ্ডের প্রীতির মূল্য হিসেবে পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা গুনে দিয়েছিলেন কাউন্সিলার ফিলিপ ফ্রান্সিস, এবং যেখানে

সাধারণ 'মাছ চুরি' 'দুধ চুরি'র জন্যে ফাঁসির দড়িতে জীবন দিয়েছে অগণিত ব্রজমাধব হরিচরণ। ইতিহাস অতঃপর এখানেই, তৎকালের চৌরঙ্গির এই এক কোণে।

সবিস্তারে সুপ্রিম কোর্টের বাড়িটার ইতিহাস আজ বলতে হল, কারণ দর্শকেরা যাকে বলতেন কলকাতার 'দীনতম কুঠি' সুপ্রিম কোর্টের সেই বাড়ির ভিতেই আজকের হাইকোর্ট। ১৮০১ সনে ওয়েলেসলি আশী হাজার টাকায় বাড়িটা কিনেছিলেন। এবং কের সাহেবের সেই বাড়িই তেষট্টি বছর পরে নতুন করে আবির্ভূত হয়েছিল—হাইকোর্টের পতাকা মাথায় নিয়ে। তার ভিত্তিপ্রস্তর পড়েছিল ১৮৬৪ সনের মার্চ মাসে দারোদ্ঘাটন—১৮৭২ সনের মে মাসে। স্থপতি—ওয়াল্টার গ্রানভিল।

সেকালেও এটা আইনের পাড়া। কোর্ট বাড়ির পূবদিকে ছিল একটা সরু গলি। তারপরেই সেকালের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট ক্লার্ক সাহেবের বাড়ি। ক্লার্ক সাহেব কলকাতার বার লাইব্রেরীর (জুন, ১৮২৫) প্রতিষ্ঠাতা। তা ছাড়াও 'বরফ কুঠি' 'মেটকাফ হল,' মেকলের ইংরাজী-বিদ্যা-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁর বাড়ির পরেই তখন এসপ্ল্যানেড! আশেপাশে অন্যান্য বাড়িওয়ালাদের মধ্যে ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল—কলভিল এবং সুপ্রিম কোর্টের 'মাস্টার' উইলিয়াম ম্যাকফারসন। গার্ডেন রীচ থেকে প্রতিদিন এ বাড়িতেই হেঁটে এসে আপিস করতেন স্যার উইলিয়াম জোন্স।

সকলের আগে নগরের শেরিফ। তারপর ডেপুটি-শেরিফ এবং তাঁদের পার্শ্বচরগণ। তাঁদের কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে ন্যায়দণ্ড, কারও হাতে সমুদ্র-শাসনের প্রতীক নোঙর। প্রতি বছর ফৌজদারি অধিবেশনের সূচনায় হাইকোর্ট ভবনে বিচিত্র এই শোভাযাত্রাটি দেখা যেত। শেরিফ এবং তাঁর অনুচরদের পরেই সেই নাতিদীর্ঘ সারিটিতে থাকতেন—মাননীয় বিচারপতিগণ।

সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতিসহ বিচারক ছিলেন চারজন। নব-প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টে নিযুক্ত হলেন প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও বারো জন। তাঁদের মধ্যে আটজন ছিলেন কোম্পানির পুরানো বিচারসভা সদর দেওয়ানি আদালত থেকে নিযুক্ত। অবশিষ্ট চারজনের দু'জন এলেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে এবং দু'জন স্থানীয় 'বার' থেকে।

ক' বছর পরে নতুন ফতোয়াবলে (লেটারস পেটেণ্ট, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫) নতুন করে আবার বেঞ্চ সাজান্ হল। হাইকোর্টের জন্যে এবার বিচারপতির ব্যবস্থা করা হল পনের জনের। স্থির হল প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের ছ'জনকে অবশ্যই ব্যারিষ্টার হতে হবে। মোট সংখ্যার তিনজনকে সরাসরি বিলেত থেকে নিযুক্ত করা হবে, পাঁচজনকে নিযুক্ত করা হবে উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের মধ্য থেকে বা কোভেনেণ্টেড সার্ভিস থেকে, তিনজন স্থানীয় 'বার' থেকে এবং বাকী তিনজন ভারতীয়দের থেকে। শেষোক্ত ঘটনাটি যে ভারতে সাম্রাজ্য জয়ের মত সহজে সম্পন্ন হয়নি সে-কথা নতুন করে বলা অনাবশ্যক।

সে যা হক, হাইকোর্ট তখন শ্রেষ্ঠতম বিচারালয়, যাবতীয় উচ্চ আদালতকে ধূলিসাৎ করে তার জন্ম হয়েছে, দেশের চরম ন্যায়দণ্ড তার হাতে; সুতরাং শেরিফের সেই জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা ধীর পায়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলত বিচারকক্ষের দিকে। রক্তবর্ণ পোশাকে সজ্জিত বিচারকরা উপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াতেন মঞ্চোপরি স্থাপিত সুউন্নত আসনগুলোর সামনে। তাঁরা আসন পরিগ্রহ করা মাত্র ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট কাঁপিয়ে চৌরঙ্গির ঐ কোণে সুগম্ভীর একটা হাঁক শোনা যেত—'ওইয়েজ! —ওইয়েজ!—ওইয়েজ!' মার্শাল মুখে হাত দিয়ে গলা ফুলিয়ে হাঁক দিচ্ছে—'অল পারসনস দ্যাট হ্যাভ এনিথিং টু ডু বিফোর মাই লর্ড দি কিংস জাস্টিস অব ওইয়েজ এণ্ড টার্মিনার অ্যাণ্ড জেনারেল গোয়াল

ডেলিভারি এ্যাণ্ড অ্যাট দিজ অ্যাডমিরালিটি সেসানস ড্র নিয়ার এ্যাণ্ড গিভ ইওর অ্যাটেণ্ডেন্স······ওইয়েজ !—ওইয়েজ !—ওইয়েজ !

বাক্যটার সঠিক মানে কি—ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে ইতস্তত ছড়ান, আইনের আঙ্গিনায় সমবেত ভারতবর্ষ তা জানত না, শুধু এটুকুই জানত, কোর্ট বসেছে, হাইকোর্ট,—সেই বিচিত্র আদালত যা আমাদের ছিল না এবং আমরা মনে মনে যা চেয়েছিলাম।

বায়ুর গতি ধরে মত গঠন করলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু এলোমেলো ইতিহাসের সেটাই সিদ্ধান্ত, মনের কথা। ওঁরা দিয়েছিলেন বলেই আমরা দু'হাত বাড়িয়ে নিইনি, আমরা চেয়েছিলাম বলেই দু'হাত ভরে নিতে পেরেছি।

কি ছিল সেদিনের সুপ্রিম কোর্টের ?—কতখানি আইনের বিচার ছিল—সদর মফঃস্বলের দেওয়ানি আদালতগুলোতে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারমঞ্চ থেকে ঘোষিত প্রথম দিনের একটি রায়ঃ ওর হাত পুড়িয়ে দেওয়া হোক। তারপর কলকাতার সাধারণ কয়েদখানায় ওকে এক বছর কয়েদ রাখা হোক। এবং তারপর ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক। উল্লেখযোগ্য আসামী সেখ মোহম্মদের অপরাধ ছিল নরহত্যা। সেদিনই আর এক আসামী ছিল—রাধামণি। তার অপরাধ ছিল—। রায় ঘোষিত হল—আসামীকে লালবাজারের মোড়ে পিলারীতে দেওয়া হোক। তারপর তাকে বড়বাজারে নিয়ে গিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে চাবুক মারতে মারতে ঘোরান হোক।

এসব কলকাতার সাধারণ মানুষ সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে ন্যায় বিচার পেয়েছিল তার নমুনা মাত্র। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর সমস্যা দেখা দিল সুপ্রিম কোর্টের ভিত্তি নিয়ে।

আগেই বলা হয়েছে—কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট বসেছিল ইংরেজের নিজস্ব আদালত প্রাচীন মেয়রস্ কোর্টের বিকল্প হিসেবে। মেয়রস্ কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—১৭২৬ সনে রাজা প্রথম জর্জের

অনুমতিক্রমে। ১৭৭২ সনে দেওয়ানি বিচারের নব্য-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে উঠল—তার জায়গায় কোম্পানির নিজ এক্তিয়ারের অন্তর্গত মানুষের জন্যে অধিকতর শক্তিশালী একটি আদালতের কথা। সে বছর হাউস অব কমন্সে সে দাবি বিশেষ আমল পেল না বটে, কিন্তু এক বছর পরেই ১৭৭৩ সনের ১০ই জুন হাউস অব কমন্সে গৃহীত হল—লর্ড নর্থের বিখ্যাত বিল। সেই বিল আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৭৪ সনের ২৬শে জুন—আবির্ভূত হল বিখ্যাত সুপ্রিম কোর্ট

মেয়রস্ কোর্টের বিকল্প, সুতরাং নবপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার নির্দেশ করা হল—বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার—ব্রিটিশ প্রজাদের যে কোন অপরাধ, ফোর্ট উইলিয়াম তথা ইংরেজাধীন কলকাতার নাগরিকদের বিচার এবং গভর্নর জেনারেল ছাড়া কোম্পানির যে কোন কর্মচারীর বিচার। ১৭২৬ সনের ইংরেজী আইন অনুযায়ী এই বিচার সম্পন্ন হবে। দাবির টাকার পরিমাণ চার হাজারের বেশী হলে খাস ইংল্যাণ্ডে, রাজদরবারে আপিল করা চলবে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট জন্মসূত্র, জন্মলক্ষণ এবং প্রতিশ্রুত জীবন অনুযায়ী সব দিক থেকেই—ইংরেজী ব্যাপার।

সুতরাং কাজে নামা মাত্র গোল বেঁধে গেল। নয়া ধর্মাধিকরণের ভিত্তিগত দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল। উপলক্ষ্য: কাশিজুরার জমিদার।

জনৈক কাশীনাথবাবু সুপ্রিম কোর্টের দরবারে আর্জি পেশ করলেন—কাশিজুরার জমিদার মহোদয় তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছেন, কিন্তু এখন আর ফিরিয়ে দেবার নাম নেই। কথা ছিল টাকার অঙ্ক যদি পাঁচ শ'র বেশী হয় এবং বিবাদী দুই পক্ষ যদি একমত হয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তবে তাঁরা কোম্পানির খাস প্রজা না হলেও সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের ন্যায় বিচারের আলোক দেখাতে পারেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ সদ্য জাহাজ

থেকে নেমেছিলেন। সুতরাং কাশীনাথ বাবুর অভিযোগ অনুসারে তাঁরা তলব করে বসলেন কাশিজুরার রাজাবাহাদুরকে। তিনি সে সমন হাতে নিলেন না। কেননা, গভর্নর জেনারেলের হুকুম আছে—জমিদাররা, বিশেষ করে যাঁরা কোম্পানির কর্মচারি নন তাঁদের উপর সুপ্রিম কোর্টের কোন অধিকার নেই। সুতরাং সমন নিয়ে রাজাকে দ্বিতীয়বার খুঁজতে গিয়ে শেরিফ এবং তাঁর লোকজনেরা কাশিজুরা থেকে বেদম প্রহার খেয়ে ফিরে এলেন। বাধ্য হয়েই সুপ্রিম কোর্ট এবার আদেশ দিলেন, তাঁর জমিজমা সম্পত্তি সব জব্দ করতে। রাজা যতক্ষণ আদালতে ধরা না দিচ্ছেন ততক্ষণ তাঁর ছাড়া নেই।

শেরিফ কলকাতা থেকে পঞ্চাশ ষাটজন নাবিক, ভবঘুরে ইত্যাদির সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে আদালতের হুকুমনামা নিয়ে কাশিজুরা যাত্রা করলেন। সে খবর কানে আসা মাত্র গভর্নর জেনারেল মেদিনীপুরের সেনাধ্যক্ষকে আদেশ পাঠালেন শেরিফকে বন্দী করতে। তিনি কোম্পানির কর্মচারি সুতরাং রাজধানীর আদেশ উপেক্ষা করলেন না। শেরিফ বন্দী হলেন। সে খবর পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট আবার নতুন আদেশ জারী করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন—যারা শেরিফকে বন্দী করেছে তারা আদালতকে অপমান করেছে। সুতরাং তাদের যাবতীয় সম্পত্তি আটক করা হবে এবং যথাযোগ্য আইন অনুযায়ী তাদের বিচার হবে। বলা বাহুল্য, সে রায় কার্যকর করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ছিল না। আদালতের লোকেরা আবার লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে মেদিনীপুর থেকে ফিরে এল। দেখতে দেখতে পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে উঠল যে, সুপ্রিম কোর্ট শুধু যে দেশীয়দের মধ্যে হাসির উপলক্ষ্য হল তাই নয়, তার ভিত নিয়েও সন্দেহ দেখা দিল। বিচক্ষণ হেস্টিংস সে ভরাডুবি থেকে ইংরেজের ইজ্জতকে বাঁচাবার চেষ্টায় অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজাকে নিযুক্ত করে বসলেন—কোম্পানির আদালত সদর দেওয়ানি আদালতেরও প্রধান বিচারপতি। তাতে

অবশ্য তখনকার মত দুই কুঠির বিবাদ মীমাংসা হল বটে, কিন্তু প্রধান বিচারপতির মাহাত্ম্য যে খর্বিত হল সে কাহিনী সুবিদিত। কেননা নতুন পদ বাবদে যে 'ঘুষ' ইলাইজা পকেটে পুরেছিলেন সেটা ত ফিরিয়ে দিতে হলই,—সেই অপরাধে স্যার ইলাইজার বিচারও হয়ে গেল। ভারতীয় আদালতের ইতিহাসে সে-ই সম্ভবত প্রধান বিচার-পতির প্রথম ও শেষ বিচার।

তবে—কি গঙ্গাতীরে, কি টেমস নদীর উপকূলে সুপ্রিম কোর্টের দীর্ঘ অষ্টাশী বছরের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিচার—মহারাজা নন্দকুমারের বিচার। সে বিচার-কাহিনী আজও মুখে মুখে এদেশে প্রবাদ। বাংলায় তখন সবচেয়ে উত্তপ্ত আলোচ্য নন্দকুমারের বিচার, সবচেয়ে জনপ্রিয় ছড়ার বিষয় ইংরেজের আইন।

"আজগুবী এক আইন হয়েছে
কৌলচলিদের সাথে হেস্টিন
ঝগড়া বাঁধিয়েছে
হায়রে হায় একি হোল
বামুনের ফাঁসি হোল,
নন্দকুমার মারা গেল,
গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।"

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ঐতিহাসিক মোকদ্দমার দীর্ঘস্থায়ী চাঞ্চল্যের একটা কারণ 'বামুনের ফাঁসি' হলেও সাধারণ লোকের মনে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না যে, নন্দকুমারকে হত্যা করেছে যে রজ্জু সেটি আইন নয়, 'কৌলচলিদের সাথে হেস্টিনের' ঝগড়া বা ভেতরকার ষড়যন্ত্র। স্যার জেমস স্টিফেন রবার্টস—প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখেছেন সেটা অমূলক সন্দেহ নয়। কেননা, ১৭৭৫ সনের মে মাসে মোহনপ্রসাদ যে উইলটি উপলক্ষ্য করে মহারাজার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, তা ছিল পাঁচ বছর আগেকার। দ্বিতীয়ত, নন্দকুমার

ভারতীয় ছিলেন। তৃতীয়ত, যে আইন অনুযায়ী নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল সেটি ভারতে প্রয়োগ করবার অধিকার পাওয়া গিয়েছিল কমপক্ষে পাঁচ বছর পরে। চতুর্থত—প্রথা-বিস্মৃত হয়ে বিচারকরা সেদিন নিজেরাই আসামীপক্ষের কাউন্সেলকে জেরা করেছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। পদে পদে আইন লঙ্ঘনের এইসব নজীর দেখিয়েই স্টিফেন সুপ্রিম কোর্টের সেই কলঙ্কিত অধ্যায়টির নাম দিয়েছিলেন—'মিস-ক্যারেজ অব জাস্টিস!' রবার্টস সেদিনের কাউন্সিল সদস্যদের মৌনতা সম্পর্কে লিখেছেন,—

"It casts the darkest and most sinister shadow over the reputation of the men who used him (Nuncoomar) for their own purpose and then callously and contemptuously flung him to the wolves."

ময়দানের ওপরে সদর দেওয়ানি আদালতেও বলতে গেলে তখন প্রায় একই ইতিহাস। ওখানকার আদালত শেষে মাঠ পেরিয়ে লোকেরা আসতেন, আসতে আসতে আজও 'জজেস ওয়াক' নামে জজ সাহেবদের জন্যে স্বতন্ত্র রাস্তাটার দিকে বাঁকা চোখে তাকাতেন, কানে কানে ইংরেজী আইনের পোশাকী মাহাত্ম্য নিয়ে হাসাহাসি করতেন, তারপর এসে ভিড় করতেন এপারে সুপ্রিম কোর্টের উঠোনে। উভয় অঙ্গন ঘিরেই তখন প্রবল গুঞ্জরন।

সুতরাং অবশেষে কর্নওয়ালিশ থেকে স্যার জন শোর—পর পর কয়েকজন গভর্নর জেনারেলের উদ্যোগে—সংস্কারের পর সংস্কার হতে হতে শেষ পর্যন্ত কথা উঠল—পুরানোকে সমূলে বিদায় দিয়ে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করবার। হাইকোর্ট সেই জরুরি প্রয়োজনেরই উত্তর। তার প্রতিষ্ঠার পিছনে—কোম্পানির অধিকার বিস্তৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস যেমন আছে,—যেমন আছে ইংরেজী বিচারপ্রথা চালু করবার চেষ্টা, তেমনি—ভারতীয়দের মনে পশ্চিমী ন্যায় সম্পর্কে

সুস্পষ্ট ফাটলগুলোকে বুজোবার চেষ্টাও। মনে রাখতে হবে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার আগে সিলেক্ট কমিটি সুপ্রিম কোর্টের কার্যধারা অনুসন্ধান করে যেমন নির্দ্বিধায় মন্তব্য করেছিলেন—

'the court has been generally terrible to the Natives and has distracted the Govt. of company.' তেমনি—ইংরেজের আদালত দেখে পাবনার গ্রাম্য কবি মন্তব্য করেছিলেন—'কাজের কিছু নাহি ছল, দুধের দুগ্ধ জলের জল—জজের আমলার ধর্ম বটে!' তাছাড়া এই হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার আগে খাস বিলেত থেকে শুধু যে দুই দুটি আইন কমিশন (১৮৩৪ এবং ১৮৫৩) বসেছিল তাই নয়, ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ নামে একটি প্রলয় হয়েছিল যার বেপরোয়া তলোয়ারের মুখে প্রকারান্তরে ঘোষণা ছিল —ধর্মরাজ্য,—ন্যায়ের শাসন।

আজ শতবর্ষ পরে—আলোয় আলোয় স্বপ্নের মত একশ আশী ফুট উঁচু মহাধিকরণের চূড়োটার দিকে তাকাতে গিয়ে তার ভিতের নীচে অবলুপ্ত সেদিনের সেই ইতিহাসের কথাটাই কেন জানি আরও বিশেষ করে মনে পড়ে।

॥ লালবাজার ঃ লালপাগড়ি ॥

লালবাজার !

লালবাজারের নাম শোনামাত্র যাদের হাত থেকে বাজারের থলিটা খসে মাটিতে পড়ে যায় তাদের কথা হচ্ছে না। এমন কি লালবাজার শুনলেই যাদের নানাবিধ (তথাকথিত) কালো আইনের কথা মনে পড়ে যায় তাদের কথাও না। আমরা বলছি লোকে যাদের বলে পাঁচজন, সেই বৌবাজার-চিৎপুরের ট্রামযাত্রীদের কথা। কলকাতার রকমারি সাধারণ মানুষের কথা। লালবাজার তাদের কাছে বাজার নয়, একটা ইঁটের বাড়ি। লালবাড়ি। চিৎপুর আর বৌবাজারের মোড়ের সেই মস্ত লাল বাড়িটা যার ভেতরে ও, সি, ডি, সি, কণ্ট্রোল রুম, ওয়ারলেস ভ্যান, লাকি, মিতা প্রভৃতিরা থাকেন !

কলকাতার বাইরে যাঁরা থাকেন লালবাজার তাঁদের কাছে আরও রহস্যময়। অনেকটা সেই অদেখা মস্কোর রেড স্কোয়ারের মত। শুনলে মনে হয়, সবকিছুই বোধ হয় সেখানে লাল—ঘাস, মাটি, জমি, ফুল, ফল, বেড়া—সব। এমন কি সম্ভবত উপরের আকাশটুকুও।

তবে লোকাল ট্রেনের চাকার সীমানায় যে বৃহত্তর কলকাতা তারা —বাড়িটা সত্যিই লাল কিনা সেটা সঠিক না জানলে একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে, কলকাতায় নামলেই এখানে ওখানে ছিটান শিমূল ফুলের মত যে লাল পাগড়িগুলো চোখে পড়ে তারা সকলেই নিশ্চয় এক মঠের শিষ্য। এবং নিশ্চয় লালবাজার সেই মঠ,—বিহার !

ডাকু নয়, খুনী নয়, একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা-পণ-নয় গোছের মানুষ যারা, পেনাল কোড যাদের কাছে মর্স কোডের মত এক ধরনের টেলিগ্রাফের টরে টক্কা, এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ যাদের কাছে বলপ্রয়োগের জন্যে তৈরী জোয়ানবাহিনী, একশ' বছর পরে মোটামুটিভাবে আজও

তাদের কাছে লালবাজারের এই-ই পরিচয়। আজও লালবাজার বলতে তাদের চোখে ভাসে—একটা লালবাড়ি আর অগুন্তি লালপাগড়ি। শুধু লালবাড়ি আর লালপাগড়ি।—কিন্তু তাই কি?

লালপাগড়ি চিৎপুর আর বৌবাজারের মোড়ের ঐ লালবাড়ির অন্যতম পরিচয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও লালবাজারের কথা শুনলেই কেন জানি আমার মনে পড়ে যায় একটি রক্তবর্ণ মানুষের কথা, —মাইকেল গ্রেসের কথা।

সে অনেক, অনেককাল আগের কথা। হিসেব কষলে লালপাগড়ির শতবার্ষিকী দিনে গ্রেস সাহেবের কমপক্ষে পৌনে দুই শতাব্দী উৎসবের দিন হয়ে যায়। কলকাতার প্রথম বাজার লালবাজার তখন লালপাগড়ির হাট নয়,—সত্যিই বাজার। এবং সত্যিসত্যিই সে বাজার তখন লালে লালে লালাকার!—যেন লাল কলাবতীর ঝাড়। ওপাশে লালদিঘি, এপাশে লাল গীর্জা তথা মিশন চার্চ, মাঝখানে বসন্ত দিনে লাল আবীরের মস্ত বাজার! বাঙ্গালী গবেষকরা বলেন—লালদিঘির মত, এ ফাগ গায়ে মেখেই লালবাজার তখন লালবাজার। লং সাহেবের মতে—লালবাজার লাল হয়েছে মিশন চার্চের লাল রং দেখে।

সম্ভবত ওঁরা দুজনেই সত্য। কিংবা হয়ত বা সত্য সেই ইতিহাসের অনুল্লেখিত তৃতীয় জন, নাম যার—পালকিওয়ালা। সোয়ারী সাহেবরা ছিলেন ওদের কাছে—লাল মানুষ—রাঙ্গা মানুষ। সুতরাং তারা যখন লাল, তখন তাদের হাট কি কখনও কালো বাজার হয়?

কারণ যাই হক, লালবাজার তখন দ্বিতীয় লণ্ডন। এখানে থিয়েটার হল আছে, ক্লাব আছে, এখানে হোটেল আছে। সে হোটেলের নাম লণ্ডন ট্যাভার্ন। তাছাড়া এখানেই কলকাতার জমিদারের কাছারি, কালেক্টরের আপিস এখানেই বিখ্যাত মেয়রস্ কোর্ট বা কলকাতার আদি বিচারশালা, এখানেই কলকতার প্রথম জেলখানা এবং এখানেই পাল্কী চড়ে আপিস করতে আসতেন

'হেড কনস্টেবল' মাইকেল গ্রেস! কলকাতার প্রথম লালপাগড়ি, পহেলা পুলিশ।

সে ১৭৮৫ সনের কথা।

তার আগেও পুলিশ ছিল কলকাতায়। সে পুলিশ নয় চৌকিদার—কতোয়াল। জমিদারের হয়ে তারা কর আদায় করত,—'শান্তি রক্ষা' করত। ১৭০৫ সনের একটা সরকারি চিঠিতে জানা যাচ্ছে কতোয়ালের কপালে আগুন। তার কাছারিটি পুড়ে গেছে।—একটা বিহিত করা আবশ্যক। উত্তরে বোর্ড লিখছে—ইচ্ছে হয় ইঁটের বাড়িই করে দিতে পার ওকে, তবে দেখবে, খরচ যেন কিছুতেই দেড়শ টাকার বেশী না, হয়। স্বয়ং পুলিশ কমিশনারের যেখানে এই অবস্থা সেখানে তদানিন্তন পুলিশ সমাচার অনুমেয়। মাচান বেঁধে তখন বক্সারের লোকেরা এসে কলকাতা চৌকি দিত।

১৭৩৭ সনে একবার ভীষণ ঝড় হয়েছিল কলকাতায়। সেবার চিঠি গেল—বক্সারিদের এগারটি চৌকি ভেঙ্গে গেছে,—অবিলম্বে সেগুলো সারাই করা আবশ্যক। কেননা, নয়ত পুলিশের কাজ অচল।

পুলিশের তখন অনেক কাজ। প্রধান কাজ খাজনা আদায়। সে আদায়ের কৌশলও কলকাতাচিত। বোল্ট সাহেব লিখছেন—'it is a common thing to see the sepoys who are guards at different places, take from the poor as they pass something of everyones basket.'

এমনকি বহু বছর পরে, ১৮২৪ সনেও কলকাতা পুলিশের নামে শোনা গেছে এ ধরনের অপবাদের কাহিনী। 'বঙ্গদূত' কাগজের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সে বছর কলকাতায় পুলিশ নিয়ে কমিশন বসেছিল একটা। কেননা 'কিয়ৎকাল হইল ম্যাজিস্ট্রেটদিগের অমনযোগ ও পুলিশের চৌকিদারদিগের দৌরাত্ম্য বিষয়ক অপবাদে সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ হইতেছিল।' কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল তারা এমন

নব্য-ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন যাতে 'পুলিশ সম্পর্কীয় দৌরাত্ম্য সম্যক রহিত হয় এবং পুলিশের যথার্থ তাৎপর্য দুষ্টের দমন ও প্রজালোকের নিরুপদ্রবে কালযাপন তাহাও সিদ্ধ হয়।' তা কতদূর সিদ্ধ হয়েছে বুঝতে হলে জনসাধারণের মনের গহনে ডিটেকটিভ না পাঠিয়ে সরাসরি একবার পাবলিকের কাছে জানতে চাইলেই বোধ হয় আজকের কমিশনের পক্ষে সত্য নির্ণয় সহজতর হয়!—নয় কি?

সে যাই হক, খাজনা আদায়ের মত 'দুষ্টের দমন'ও যে পুলিশের তখন অন্যতম কর্তব্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন হেতু নেই। কেননা, কালেক্টার এবং তাঁর ডেপুটি ব্ল্যাক জমিদারের বৈঠকখানার আদালত ছাড়াও এই লালবাজারের অদূরে ছিল ওল্ড কোর্ট। সেই কোর্ট থেকেই ওল্ড কোর্ট হাউস। রাস্তাটা থাকলেও মহা মহা তস্য মহা, মহাধিকরণের সেই বাড়িটা আজ আর নেই, সেখানেই বহু দোষী-নির্দোষ ঘড়ি-চোর, থালা-চোর সাহেবের ছেঁড়া জুতা, মেমসাহেবের বাজারের পয়সা চোরের বিচারভূমির উপর আজ দণ্ডায়মান সেন্ট এন্ড্রুর গীর্জা। আজ আর দেখে বোঝবার উপায় নেই, এর মজবুত ভিতের নীচেই,—কলকাতার মাটির গভীরে শায়িত আছে বেচারা ব্রিজমোহন,—সেই ব্রিজমোহন, পঞ্চাশ টাকা দামের একটি ঘড়ি চুরির দায়ে যার একদিন প্রাণদণ্ড হয়েছিল এখানে দণ্ডায়মান কোর্ট বাড়িটি থেকে।

অদূরেই লালবাজার,—কয়েদখানা। চৌদ্দ ফুট উঁচু চাকা লাগান একটা কাঠের বাক্স কয়েদখানা থেকে বের হয়ে দু পাশের ঘরবাড়ি লোকজন কাঁপিয়ে এসে দাঁড়াত কোর্টের সামনে। তার ভেতরে অপরাধী। না, এভাবে আনা হয়েছে বলেই তার মরে যাওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, গাড়ির উপরে দুটো ফুটো আছে! শ্বাস টানার ক্ষমতা আছে যাদের তাদের পক্ষে বাতাস সে পথেই পর্যাপ্ত!

বিচার শেষে কলকাতার সেইসব অশিষ্ট নাগরিকদের টেনে নিয়ে যাওয়া হত আর একটু দূরে, চৌরাস্তার মোড়ে। সেখানেই 'পিলোরী'

শান্তিমঞ্চ! বৌবাজার-চিৎপুরের লোকে লোকে রাস্তা সেদিন অরণ্য হয়ে উঠত। কলকাতার জনতা কলকাতা পুলিশকে চাক্ষুষ দেখতে পেত!

হেড কনস্টেবল গ্রেস লালবাজারের সেই অন্ধকার দিনের মানুষ নন, তিনি কিছুকাল পরের 'লালপাগড়ি'। তাঁর কার্যারম্ভের বছর ১৭৮৫।

গ্রেস সাহেবের লালবাজার যে কলকাতার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স তার লোকসংখ্যা ছিল চার লক্ষের ওপর। কিন্তু 'লালপাগড়ি' ছিলেন কত জানেন? গ্রেসকে নিয়ে মাত্র চারজন! বাকী তিনজন—মাইকেল ফ্লাভিন, টমাস সিম্পসন এবং জন রূপ। ওঁরা 'কনস্টেবল'। গ্রেস 'হেড কনস্টেবল'। তাঁদের ওপরওয়ালা বলতে আর যিনি আছেন শহরে তিনি কলকাতার শেরিফ।

কোম্পানির ম্যাজিস্ট্রেটরাও ছিলেন বটে শহরে। পুলিশকে ঘাঁটাতেনও তাঁরাই। কেননা, শুধু বিচার নয়, অপরাধ নির্ণয় অনুসন্ধান ইত্যাদি আনুসঙ্গিকও ছিল তাঁদের কাজ। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই তখন শেরিফের এক্তিয়ারভুক্ত। সুতরাং লালপাগড়ি ম্যাজিস্ট্রেট নিরপেক্ষ। হেড কনেস্টবল্ গ্রেস নিজেই নিজের প্রভু,—নিজের ভৃত্য।

ভৃত্য বলছি, কারণ নিজের ভৃত্য না হলে কখনই চার মানুষে এতগুলো কাজ সম্ভব হয় না। গ্রেস আপিস করতেন, খাতা লিখতেন, কোর্টে কয়েদীসহ হাজিরা দিতেন, দণ্ডদানের ব্যবস্থা করতেন এবং কি নয়! বিশেষ করে লালবাজারের ঐতিহাসিক জেলখানাটি ছিল তাঁরই পরিচালনাধীনে।

পুলিশ বাড়িটা ছিল জন পামার নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি। পামার হেস্টিংসের বিশেষ বন্ধুব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়ির উল্টো দিকেই ছিল জেলখানা। মানে, লম্বায় একশ ফুট আর চওড়ায় চল্লিশ ফুট একখানা বাড়ি। ভেতরে ছিল পুকুর। কয়েদীরা সেখানেই

স্নান করত কাপড় কাচত। গরমের দিনে পুকুরের ধারে সাহেব কয়েদীরা নিজেদের খরচায় সারি সারি ছাউনি তুলত। খাবারও খেতে হত তাদের নিজেদের পয়সায়। তবে মাঝে মাঝে বাইরে থেকেও আসত। সহৃদয় ব্যক্তিরা পাঠাতেন। কয়েদীরা কাগজের মাধ্যমে তাঁদের ধন্যবাদ জানাত। যথা ঃ এই গরমে আমাদের যাঁরা কোল্ড বিয়ার পাঠিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ!

লালবাজার কয়েদখানায় একটা অসুবিধা ছিল। মেয়ে আর পুরুষের জন্যে এখানে স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা ছিল না। অন্তত ১৭৬৭ সনের একটি বিবরণে তাই বলে। তবে বাড়ি একটা হলেও গেট ছিল ছুটো! একটা ঋণের দায়ে আটক পলিটিক্যাল নায়কদের জন্যে নয় কয়েদীদের জন্যে, অন্যটা অন্যদের জন্যে। উল্লেখযোগ্য ১৭৮৩ সনে বেঙ্গল গেজেটের বিখ্যাত সম্পাদক অগস্টাস হিকি এখানে যাপন করেছিলেন তাঁর বন্দিজীবন!

এছাড়াও আর একটি কয়েদখানা ছিল তখনকার কলকাতায়। সেটি কতোয়ালের কয়েদ। সেখানে যারা থাকত তারা প্রধানত ব্ল্যাকটাউনের নাগরিক এবং অপরাধী হিসেবে মামুলী। এই দুইয়ের মিলেই ১৭৮১ সনে তৈরী হয়েছিল ময়দানের জেলখানা বা বিরজি জেল বা হরিণবাড়ি। আজ সেখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

যা হক লালবাজারের এই লকআপ নিয়েই লালদিঘির তীরে গ্রেস সাহেবের দিন দিব্যি চলে যেত। ১৮০৩ সনে কনেস্টবল একটু বাড়ল। দশ হল। তিন বছর—আরও একজন যোগ হল। এবার থেকে এগার। ১৮১৫ সনে—এগার বার হল। ব্যস, সেখানেই শেষ। তারপর ১৮৫০ সন অবধি হেড কনস্টেবল অনেক অদল বদল হয়েছেন কিন্তু ফৌজ বার জনের সংখ্যা ছাড়ায় নি। কেননা সেটা সহজ ছিল না।

১৮৫৫ সনে সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রস্তাব উঠেছিল একবার। ক্লার্ক অব দি ক্রাউন লিখেছিলেন, আমাদের এখানে অন্তত ছজন কনস্টেবল

দরকার। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে হেড কনেস্টবল উত্তর পাঠালেন —'পাব কোথায় ? আর পেলেই বা টাকা দেবে কে ?'

দু'জন কনেস্টবলের জন্যে সুপ্রীম কোর্ট তখন মাসে মাসে বত্রিশ টাকা দিতেন ম্যাজিস্ট্রেটকে। অথচ একজন কনেস্টবলের মাইনেই বত্রিশ টাকা। যাঁরা আছে তাঁদের মাইনে জোটে না। রোববারে রোববারে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে দুটো চার্চ থেকে একজনের মাইনে পাওয়া যায়। বাদবাকীদের কি করে চলে সে জানেন শুধু তাঁরাই যাঁরা লালবাজার চালান! সুতরাং প্রস্তাব হল সুপ্রীম কোর্ট যদি বত্রিশকে বাড়িয়ে তিপ্পান্ন টাকা করতে পারে তবে আমরা একজন পুলিশ বাড়াতে পারি।

এই ছিল সেদিনকার লালবাজারের হালচাল। কোথায় তখন রাশি রাশি লালপাগড়ি, কোথায় সারি সারি গাড়ি, কোথায় স্কন্ধে স্কন্ধে খচিত তারকা। প্রথম পুলিশ কমিশনার এস, ওয়ানচোপ। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের পরের মানুষ। তাঁর আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সব সুপারিণ্টেডেণ্ট। তারও আগে হেড কনেস্টবল। তবু এঁদের মধ্যে অনেকেই আজও বেঁচে আছেন কলকাতার স্মৃতিতে। মট্ সাহেব আছেন, আছেন রবার্টস, এলিয়ট, হগ। এঁরা প্রত্যেই লালবাজারের লোক এবং প্রত্যেকই স্বনামধন্য। রবার্টস কনেস্টবল হিসেবে জীবন সুরু করে ঠিক একশ' বছর আগে চেয়ারম্যান অব জাস্টিস হয়েছিলেন। আর এলিয়ট ? যদিও আমেদ জমাদারের নামের রাস্তাটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে তবুও এলিয়ট তাতে রাজি হতেন না। কলকতায় তাঁর নামে জীবৎকালের পদ্য রচিত হয়েছিল। কারণ, ডাকাত দমন করে তিনি নগরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন!

উপসংহারে লালবাজার আর লালপাগড়ির আর একটা অবদানের কথা। অনেকেই জানেন না, 'লালফিতে' নামক অত্যাশ্চর্য বস্তুটাও এই লালবাড়িটারই অবদান। প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৮২২ সনের

একটা চিঠিতে। শব্দটা ছিল—'নাম্বারড এজ পার মার্জিন' সেই থেকেই নাকি রাইটার্স বিল্ডিংসে চিঠিতে চিঠিতে লেখা হয়ে চলল—'ইন দি মার্জিন' অথবা 'নাম্বারড এজ পার মার্জিন'। লালফিতের জগতে লালবাজারের (?) দ্বিতীয় অবিস্মরণীয় দান—'আই এম টু সে!'

বিলেতের ইংরেজরাও স্বীকার করেন এই বাক্যাংশটি যিনি প্রথম লিখেছিলেন তিনি একাধারে শেক্সপীয়র আর টমাস হার্ডি!

জিন্দাবাদ—লালপাগড়ি!

।। কোলকাতার ভাষা ও সাহিত্য ।।

ভাষার কথা মনে পড়লো আমার বড় বাজারের রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে এসে। কেন, সে কথা পরে বলছি। তার আগে, আমার মতো আপনারাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, কোলকাতা শহরে সম্প্রতি ভাষা শিক্ষার কেমন একটা প্লাবন জেগে উঠেছে। অফিসের ফেরার পথে, এমন কি টিফিনে কেরানীরা, কলেজের পরে ছাত্ররা অ-আ-ক-খ'র বই নিয়ে ছুটছে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির কেন্দ্রের দিকে অথবা ফরাসী জার্মান, কিংবা রুশ ভাষার ক্লাস করতে। কেন সহসা এমন ভাষা-ভূত চেপে বসেছে শহরের স্কন্ধে, তা অবশ্য এদের অধিকাংশই জানে না। বরং তার চেয়ে কিছু কিছু বলতে পারেন তাদের অভিভাবক কিংবা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা।

আমার প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রসন্তানটি এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই মহাভাবিত হয়ে পড়েছেন ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে—কি করবেন কি না করবেন কিছুতেই কিছু ঠিক করে উঠতে পারছেন না। অবশেষে সেদিন আমায় বললেন, "ঠিক করে ফেলেছি বুঝলেন। তবে দু' বছর টাইম নেবে। তা নিক্, তবুও এই একমাত্র পন্থা। জওহরলালজী থেকে শুরু করে আমাদের বড়বাবু পর্যন্ত সবার এই এক পরামর্শ। বিদেশী ভাষা শেখ। দু' চারটে না পার, অন্ততঃ একটা।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তা কোনটা আপনার পছন্দ ?"

"আমার পছন্দ বলবেন না,—বলুন কোনদিকে হাওয়ার

গতি,—দেশের প্রয়োজন কোন্‌টির। আমি ঠিক করেছি—নন্তকে রাশিয়ান শেখাব। এক বছর রাশিয়ান, এক বছর সর্টহ্যাণ্ড। দু' বেলা দুটো চালিয়ে গেলে এক বছরেই তৈরি হয়ে যাবে। সময়ও লাগবে কম, পয়সাও তাই। কি হবে বাবা আই. এ., বি. এ. পড়ে—সেইতো স্কুল মাস্টার। কি বলেন আপনি?"

আমি বললাম, "তা ভালো, কিন্তু হঠাৎ রাশিয়ান— ।"

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "হঠাৎ নয় বাবা—খবরের কাগজ পড়ি। তিরিশ বছর ধরে নিয়মিত পড়ে আসছি আর ওদের হালচাল বুঝি না? দেখবেন রাশিয়া নির্ঘাত বিজিনেস্ এক্সপাণ্ড করবে এদিকে।"

এই ভদ্রলোকের মতো অনেক ভদ্রসন্তান রীতিমত আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি স্টাডি করে ভাষা শেখায় মত্ত হয়েছেন নিজেরা অথবা পরামর্শ দিয়ে বেড়াচ্ছেন অন্যদের লেগে পড়তে। সম্প্রতি কাগজের সংবাদ—৭০০০ হাজার লোক এখন বিদেশী ভাষা শিখছেন কোলকাতায়। হিন্দী, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, বাংলা ইত্যাদি। তাঁদের ভাগ করা যায়—রাজনীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা হিন্দী, ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্‌রা ফরাসী, ভাবী ইঞ্জিনিয়াররা জার্মান এবং বামপন্থীগণ (বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের পর পূর্বকথিত দক্ষিণপন্থীরাও এর অন্তর্গত) রুশ। এর মধ্যে এক ভদ্রমহিলা নাকি বিনোবার বক্তৃতা শোনার এবং হৃদয়ঙ্গম করার জন্য হিন্দী শিখছেন। তাঁকে বাদ দিন। বাদ দিন রাজকাপুর-নার্গিসের অভিনয় ভালো করে বোঝার জন্য যে যুবকটি হিন্দী শিখছে তাকেও। তা'হলে দেখা যাবে নব্য ভাষা-শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় সাত হাজারের কিছু কম অর্থাৎ ছয় হাজার ন'শ আটানব্বই। আমি এই প্রায়-সাত হাজার চাকুরী-অন্বেষু বন্ধুদের শুধু পরামর্শ দিতে চাই একটু।

১৯৫১ সালে সেন্সাস্ রিপোর্ট মতে কোলকাতায় এখন ভাষা চালু আছে ৮০টি। তার মধ্যে বাংলা ছাড়া—ভারতীয় ভাষা ৫০টি।

হিন্দী-উর্দু-গুজরাতী-তামিল-ওড়িয়া এসব। আর বাদবাকী ৩০টি হচ্ছে অভারতীয়। অর্থাৎ—ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, চীনা, রুশ, ইটালীয়, আফ্রিকান ইত্যাদি। সবচেয়ে কম চালু যে ভাষাটি তাতেও অন্ততঃ ১০০ জন কথা বলে এ শহরে। সুতরাং ধরে নিচ্ছি একশ' জন অন্ততঃ এখনই রুশ জানে কোলকাতা শহরে। এবং তার চেয়েও বেশি লোক জানে জার্মান। তা'হলে আপনি কি করে আশা করেন এদের আগেই চাক্‌রী হয়ে যাবে আপনার? কখনো ভাববেন না এরা সবাই কর্ম-নিযুক্ত কিংবা উপযুক্ত যোগ্যতাহীন।

তেরোটি ভারতীয় অভারতীয় ভাষা জানেন—এমন লোককে আমি চিনি। তিনি এই কোলকাতার কোন স্কুলের ষাট টাকা মাইনের ক্ল্যাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা সংস্কৃত শিক্ষক। কোলকাতার অন্য একটি স্কুলের ভূতপূর্ব সংস্কৃত শিক্ষককে আমি ডালহৌসিতে দেখেছি ভিক্ষে করতে। ইউ. এস. আই. এস.-এর পাঠককে দেখেছি আমি ফরাসী-ইতালীয়ান জানা ভদ্রলোককে দিনের পর দিন বসে বসে উইমেনস্ হোম জার্নালের পাতা ওল্টাতে। সুতরাং আমার পরামর্শ, হরিনাথ দে ছেড়ে রতন সরকারের পথ ধরুন।

বোধ হয় চিনতে পারলেন না রতন সরকার মশাইকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্ট্রীট চেনেন? দেখবেন তাকে ঘিরে চার চারটে রাস্তা আছে রতন সরকারের নামে। রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট, তস্য ফার্স্ট লেন, সেকেণ্ড লেন এবং রতু সরকার লেন। কোলকাতার ক'টা লোকের নামে চারটে রাস্তা আছে?

যাহোক, ১৬৭৯ সালের কথা। প্রথমে বৃটিশ জাহাজ এসে পেঁাছেচে গার্ডেন রীচে। শেঠ বসাকেরা ছুটোছুটি করে গেলেন অভ্যর্থনা জানাতে। কথাবার্তা হলো কাপ্তেনের সঙ্গে। কিন্তু কেউ কারুর কথা বুঝতে পারেন না। ছু' দলেরই আজব বুলি। কাপ্তেন স্টাফোর্ড তখন বললেন, একজন দো-ভাষীর সন্ধান দিতে

এই কথাটাও বলতে হলো তাঁকে ইংরেজীতেই। বসাক মশাই ভাবলেন সাহেবের বুঝি ধোপা চাই একজন। ছুটে এসে রতুকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। পরামাণিকেরই বুদ্ধি আছে রজকের নেই, ইতিহাস তা বলে না। রতন সরকার বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিল। ব্যাপার দেখে সে ছুটে পালিয়ে এলো না শেঠ মহাশয়ের কাছে। 'ইয়েস', 'নো' বলে দিব্যি চালিয়ে নিল কাজ। সাহেব তো মহাখুশী। কি বিপদেই না পড়েছিল তারা। তখনও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বসে নি যে, ফার্সি কিংবা উর্দু জানা ছোকরা সিবিলিয়ান দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। সুতরাং, স্থায়ী দো-ভাষী হিসেবে থেকে গেলো রতু সরকার। কোম্পানীর আনুকূল্যে লক্ষ্মীও অনুকূল হলেন তার প্রতি। আর কাপড় কাচতে হলো না বেচারাকে। রতন সরকার প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক হলেন। আজ দু'শ' আড়াইশ' বছর পর তাঁর নামে চারটে রাস্তা।!! আর—হরিনাথ দে??

তাই বলি—রতন সরকারকেই আদর্শ করুন কোলকাতার ভাষা-রোগীরা। মনে রাখবেন ডিমাণ্ড সাপ্লাইয়ের নিয়ম এক্ষেত্রেও খাটে। বেশী লোক একাধিক ভাষাভাষী হয়ে গেলে—সবাই কাজ পাবে কি করে? দেখলেন তো, রতু সরকার কাজ পেয়ে গেল অথচ নেস্‌ফিল্ড মুখস্থ করেও আজ কর্মহীন কত লোক দেশে। গতকল্যের ইংরেজীর যা ঘটে গেছে আগামীকল্য রুশ ভাষারও তাই ঘটবে। 'এক্সপাণ্ড' করুক না রাশিয়ানরা। লোকের দরকার হলে তখন চাইবেই। আর যোগ্য লোক না থাকে তো—আমাদের মতো রতু সরকারদেরই বাধ্য হবে লাগিয়ে দিতে। বুদ্ধিমানের মতো তাই অপেক্ষা করুন। অনেক কম ঝঞ্ঝাট এবং সেই সঙ্গে অনেক কম প্রতিযোগিতা হবে এই পথে। কারণ ইংরেজী ব্যাকরণ মুখস্থ করা আর রতু সরকার হওয়া এক মাথার কর্ম নয় জানবেন।

তাছাড়া ভাষার ব্যাপারে বাহ্যত নির্বোধেরাই চিরকাল জয়ী

হয়ে আসছে কোলকাতা শহরে। কোলকাতার ইতিহাস তাই বলে।

আমাদের এই ২নং 'নির্বোধ' ব্যক্তিটি একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান। নাম—মিঃ হেনরী পিটস ফ্রস্টার। ভবানীপুরের লোকেরা বলেন—'হাবা-ফ্রস্টার'। তাঁর একটা বাড়ি ছিল রসা রোড আর চৌরঙ্গীর যোগস্থলে। জস্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে। বাড়ির সঙ্গেই ছিল মস্ত এক পুকুর আর তার মাঝখানে একখানা 'জলটুঙ্গী'। কথিত আছে ফ্রস্টার সাহেবের জাঠ-গিন্নি স্নান করতেন ওটাতে। ফ্রস্টার সাহেব বিগত হলে এক বাঙালী বাবুর অধিকারে আসে বাড়িটি, তারপর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের হাতে। ভেঙে ফেলার আগে পর্যন্ত চাঁদনি রাতে—ওপাড়ার লোকেরা বেড়াতে আসতো ওখানে, ফ্রস্টারের 'বোকা-ঘরে'। ছেলেরা পিক্‌নিক্ করতো সেই 'বোকার' জলটুঙ্গীতে।

কি কারণে ফ্রস্টার বোকা বনে গেলেন ওদের কাছে, জানি না। কিন্তু ইতিহাস পড়ে জেনেছি—লোকটি ছিলেন—প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর, তার ওপরে তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্। ১৭৯৯ সালে তিনি দুই খণ্ডে বের করেছিলেন একখানা ভাষাতত্ত্বের বই। 'A Vocabulary, English And Bengalee (Sic) & Viec-Versa'। শুধু তাই নয়, শোনা যায়—বাংলা ভাষা যে সরকারী ভাষা তথা সাহিত্যের ভাষারূপে গৃহীত হয়েছিল তখনকার দিনে, সেও তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায়! 'নির্বোধ ফ্রস্টারের' উদ্যোগে!

॥ ২ ॥

কোলকাতার যেমনি লাট-ভাগ্য, তেমনি সাহিত্য-ভাগ্য। মোগলাই-দিল্লী, ক্যাথলিক-মাদ্রাজ কিংবা বৈদিক-বারাণসী—সহর-কুলে এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে এর তুলনা চলে না। এমন কি বোধ হয় তুলনা চলে না স্বয়ং মানসপিতা লণ্ডনের সঙ্গেও। এমন

বনেদী সহর হয়ত আরও অনেক আছে—কিন্তু এমন কালচার্ড সিটি মেলে দৈবাৎ। বাস্তবিক সাহিত্য-দৌলতে কোলকাতা অদ্বিতীয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ একখানা লাইব্রেরী হতে পারে তাকে নিয়ে লেখা পুঁথিপত্রের। এবং গেল পঁচিশ-ত্রিশ বছরের বঙ্গসাহিত্যের সমুদয় ফসলকে (যা স্বভাবতই ক্যালকাটা প্রডাক্ট অথবা বাই-প্রডাক্ট) বাদ দিয়েই সে গুদাম ভরে আছে!—কি চাই? সব আছে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-স্মৃতিকথা-আত্মকথা-পত্র-সাহিত্য-জর্ণাল, ছড়া-কীর্তন-পাঁচালী-এমন কি ইতিহাস-ভূগোল-স্বাস্থ্য কোনটির কমতি নেই। মায় রম্যরচনাও। আশ্চর্য এই প্রতিটি বইয়ে কোলকাতা নায়িকা। লেখিকা হলে অবশ্য নায়ক। কাল ভেদ নেই, রুচি ভেদ নেই, বয়ঃসীমার প্রশ্ন নেই,—প্রথম দিনটি থেকে এই বার্ধক্যেও কোলকাতা সাহিত্যিকের যৌবনবতী নায়িকা। সহরকুলে উর্বশী।

উর্বশীকে পেয়ে দেব-সাহিত্যের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ হয়েছিল কিনা জানি না, তবে কোলকাতাকে ধরে যে ইঙ্গ এবং বঙ্গ উভয় সাহিত্যই স্ফীত কলেবর হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনি এ সহরের গুণ, যেই পা দিয়েছে এখানকার মাটিতে, দু'চার ছত্র অমনি বের হয়ে গেছে তার কলমে। চিঠির প্যাডেই হোক, আর ডাইরীর পাতায়ই হোক। ফলে কোলকাতা-সাহিত্যে বইয়ের মলাটে মলাটে যাদের নাম তাদের মধ্যে শুধু সাহিত্যিক নয়, আছেন অনেক রথী-মহারথী, লাট-বেলাট, সাবঅলটার্ণ গিন্নী, রাইটার-প্রিয়া ইত্যাদি। তদুপরি সাহিত্যিক তো আছেন-ই। কিপলিং থেকে শুরু করে এ কালের জন মাস্টার্স, হুতুম-পেঁচা ভূতুম-পেঁচা থেকে আমি অধম। কোলকাতা সাহিত্যে এরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। সুতরাং এদের কথা পরে হবে।

কোলকাতা সাহিত্য দেখে শুনে এর একটা স্পষ্ট ধারা আমি আবিষ্কার করেছি। সেটা আগে থেকেই বলে দিই। তাহলে

অনেক অহেতুক শ্রম বেঁচে যাবে আপনার। প্রথমেই দেখবেন লেখকটি কে? যদি দেখেন লেখক-ই তবে রেখে দেবেন। সময়ে অসময়ে পড়বেন। যদি দেখেন লেখক লর্ড অমুক তাহলে বইটির মলাটে যাই নাম থাকুক ধরে নেবেন আত্মজীবনীমূলক। নিশ্চিত জানবেন তার বিষয়বস্তু: আমি কেমন করে এই শহর এবং সাম্রাজ্য গড়লাম। যদি দেখেন লেখক তারই অধস্তন কোন কর্মচারী তবে জানবেন—তার বইয়ের মর্মার্থ হচ্ছে: আমার প্রভু কি অসীম বীরত্ব এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বাইরের প্রবল শত্রু এবং ভেতরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রাজত্ব করেছেন, তারই কাহিনী। এ বইয়ের বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে এই—সব ঘটনাই লেখকের চোখের সামনে ঘটা। যদি দেখেন লেখিকা—তবে সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করুন জানতে, উনি কোন ঘরের। সেটা কঠিন কাজ নয়। ভূমিকাটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। যদি দেখেন লেখিকার পৃষ্ঠপোষকদের তালিকাটি বেশ ভারী তবে ধরে নেবেন তার বই কয়েকটি বড় বড় খানাপিনার গল্প, দু' একটি রোমাঞ্চকর (!) ভ্রমণ বিবরণ, অধস্তন কর্মচারী কিংবা তদীয় গিন্নীদের গুটি তিন কেলেঙ্কারীর কেচ্ছার সমবায়। লেখিকা অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্না হলে এর সঙ্গে যুক্ত হবে: ভারতের আকাশ, কোলকাতার নেটিভ পাড়া, সাপ-বাঘ-সাধু, পাখা-এক্কা-মশা, হুক্কা-বানর-গোঁফ কিংবা কান্ট্রি ক্যাপ্টেন বা বর্ধমান স্টু নামক খাদ্যের অনুপান। মেয়েটি যদি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরের হয় তবে জানবেন পূর্বোল্লিখিত সবই আছে তার বইয়েও তবে আনুপাতিক হিসেবে। অর্থাৎ কম কম করে। কেলেঙ্কারী কাহিনীগুলো তার উঁচু মহলের, ভারতবর্ষ সম্পর্কিত ইনফরমেশানগুলো আরও নীচু মহলের। সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোলকাতা-সাহিত্য। লর্ড-বিচারপতি-যাজক, লেডি-মিস্ট্রেস-মিস্ নির্বিশেষে সকলের সকল শ্রমেরই এই হচ্ছে—মোটামুটি সারবস্তু। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—তৎকালীন এইসব

লেখক-লেখিকাদের ধৈর্য এবং স্বাস্থ্য। দু' তিন ভলুমের নীচে বড় কেউ একটা থামেন নি। যার পদমর্যাদা যত বড় তার বই তত মোটা। স্বভাবতই তত অপাঠ্য। অবশ্য এও ঠিক, পাঠকের কথা স্মরণ রেখে লেখবার মেজাজ লাট-বেলাটদের থাকবার কথা নয়। তাঁরা কষ্ট করে লিখেছেন তাই তো যথেষ্ট। ভালোয়-মন্দে মিশিয়ে তবুও তো তাঁরা আমাদের আলমারি ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

যাক এসব কথা। এবার আসুন কোলকাতার যথার্থ সাহিত্য-জগতে। দুর্ভাগ্য বশতঃ সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্য-সমাচারই এখানে পরিমাণে বেশী। যথাঃ কিপলিং কোলকাতায় বাস করে গেছেন। থ্যাকারে কোলকাতায় জন্মেছেন, ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ৭৯নং বাড়ির দোলনা থেকে আজব নগরীর আকাশ দেখেছেন, আলীপুরের থ্যাকারে রোডে গুলি খেলেছেন। মার্ক টোয়েন এক রাত্তির কাটিয়ে গেছেন—হোটেল কন্টিনেন্টালে। হোটেলের কর্তৃপক্ষের চাইতে কোলকাতার কি কম গর্ব সেজন্যে? অবশ্য রসিকপ্রবর সে রাত্তিরে হেসেছিলেন, না, খাটে বসে কেঁদেছিলেন জানা যায় নি। কারণ ঈশ্বর গুপ্তের মতো চৌরঙ্গী পাড়ার লোকেরা তখনও 'রেতে মশা' নামক জন্তু (মিস্ এমলি ইডেন তার বইয়ে মশাকে animal বলেছেন) এবং দিনে মাছি নিয়েই বাস করছেন।

এখানেই শেষ নয়। এ শহরের সঙ্গে যোগ ছিল কবি ওয়াল্টার সেভেজ ল্যাণ্ডারের, ক্ষুদে-কিপলিং জন মাস্টার্সের, এমন কি ডেভিস্ গ্যারিকের। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা অনেক খেটেখুটে বার করেছেনঃ গ্যারিকের খাটের চাদরটি নাকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে তৈরি! এ হলো সাক্ষাৎ যোগের কথা। যোগাযোগ হতে পারতো এমন সংবাদও আছে। ১৭৭৬ সালে

ডক্টর জনসনের মনেও নাকি এক প্রবল বাসনা জেগেছিল এদিকে আসবার। বলা বাহুল্য, জনসন এলে বসওয়েলও নিশ্চয়ই বাকী থাকতেন না। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্, মন ঘুরে গেল ডাক্তারের। বসওয়েলেরও তাই আর কোলকাতা দেখা হয়ে উঠল না।

কোলকাতার সাহিত্য সমাচার বলতে মোটামুটি এই। তার চেয়ে বরং এবার শুনুন সাহিত্যিক সংবাদ। এটি চিরকালই সাহিত্যের চেয়ে নীরস। স্বভাবতই, চিরকালই এর শ্রোতা কম। তবুও শুনতে বলবো। কারণ সাহিত্যে যা যোগ্যভাবে পাবেন না, সাহিত্য সমাচারে যা উহ্য এমন জিনিস পাবেন এখানে। শুধু কালি-কলমের মানুষ, শুধু বাক্যবিন্যাসের হৃদয় নয়,—রক্তমাংসের গন্ধ পাওয়া যায় এখানে। এখানে অর্থে লাইব্রেরীতে নয়,—কবরখানায়।

কিপলিংকে যদি পান লাইব্রেরীর কক্ষে, পুরানো পুঁথির জীর্ণ পত্রে, তবে তাঁর নায়িকাকে পাবেন, কবরখানায়। বিশ্বাস করবেন তাঁর লুসিয়াকে আমি পেয়েছি। পেয়েছি এই কবরখানাতে। লুসিয়াকে চিনলেন না? লুসিয়া রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের 'সিটি অব ড্রেডফুল নাইটস' বইয়ের নায়িকা। 'Concerning Lucia' নামে তার একটি সুন্দর রেখাচিত্র এঁকেছেন কিপলিং। সাহিত্যে সুন্দর সৃষ্টি। ব্যস, হয়ে গেল। কিন্তু শুনতে পেলাম যখন—এ সৃষ্টি মনের নয়, লুসিয়া সত্যিই একদিন ছিল, তখন আরও ভালো লাগলো কিপলিংকে। তারপর ক্রমে আরও শুনলাম—ছিল নয়, লুসিয়া আজও আছে। তবে কবরখানায়।

ছুটে গেলাম। বিরাট কবর। স্বভাবতই অনেক বিত্তের স্বাক্ষর। দীর্ঘ গুণলিপি পড়ে জানলাম—২৫ বছরের এই সুন্দরী মেয়েটি ছিল রবার্ট পার্কের স্ত্রী। নাম শুনে চিনতে পারলাম নন্দকুমার হত্যা-ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়কপত্নী। কোলকাতার এক

বিরাট জমিদার-গিন্নি। তবুও রাগ হোল না। কিপলিংয়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পড়লাম—

To tell the treasure that these walls contain,
Let those describe it most who knew best........

কিপলিং সাহেবের এই অশ্রু আমি সিটি অব ড্রেডফুল নাইটসের পাতায় পাইনি ; এবার পেলাম। সাহেবকে কবি নয়, আরও বেশী কিছু বলে মনে হলো আমার। এবং গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন—মনে হবে আপনারও।

দ্বিতীয় সংবাদটি চোখে পড়তেই ছুটলাম আলীপুর মিলিটারী সিমেট্রির দিকে।

—হ্যাল্লো বাবু, হোয়াট্‌ ডু য়ু ওয়াণ্ট? বলতে বলতে যিনি এগিয়ে এলেন তিনিও একটি কবর। জরাজীর্ণ চেহারা। ইংরেজী বলেন বটে, কিন্তু ইংরেজ নয়, ইংরেজের প্রেত। দেখে কষ্ট হলো।

বললাম—একখানা কবর। ওয়াল্টার ল্যাণ্ডার নামে একটি ছেলের কবর।

—ওয়াজ হি এনি বিগ্‌ মিলিটারী পার্সন্‌?

বললাম, বিগ্‌ কিনা জানিনে, তবে মিলিটারী তো বটেই। তুমি নিশ্চয়ই ডিকেন্সের নাম শুনেছ। সেই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক,—এ ছেলেটি তাঁরই—।

—ডিকেন্স! ডিকেন্স!! বলে—কিছুক্ষণ মাথা চুলকালেন বেচারা। তারপর বললেন—দেখো, আমি নতুন এসেছি এখানে। রেলে ছিলাম, এক মাসও হয়নি।—

হেসে বললাম—সত্যিই তো তাহলে আর তুমি ডিকেন্স সাহেবকে চিনবে কি করে? আচ্ছা, আমিই খুঁজে নিচ্ছি।

খুঁজতে খুঁজতে পেলাম সেই দুষ্টু ছেলের কবরটি। একদিন নার্সের দিকে চেয়ার ছুঁড়ে মারার অপরাধে ডিকেন্স তাকে

সারাদিন শুধু জল আর দু' টুক্‌রো রুটি দিয়ে আটকে রেখেছিলেন ঘরে। তাও রোববারের মতো একটা দিনে।—আর আজ? এক টুকরো পাথর যেন গুহার মুখে বসে আটকে রেখেছে একটা ২৩ বছরের তরুণকে!

ছেলেটি চার্লস ডিকেন্সের চতুর্থ সন্তান এবং দ্বিতীয় পুত্র। এর জন্মের দু'দিন আগেও বড় কষ্টে কাটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ডাইরীতে লিখছেন: "'কিউরিওসাইট্‌স্ অব লিটারেচারে'র একটা পাতা খুলে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বসে আছি। তখন তিনটে বাজে। একছত্রও পড়া হয়নি। পাতা ওল্টানোর মতো মেজাজই নেই আমার।" পরের ক'দিনও কেটে গেল এমনি দুশ্চিন্তা এবং অশান্তিতে। ১৮ তারিখে (৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪১) জন্মগ্রহণ করলো এই ছেলেটি। ৯ তারিখের ডাইরীতে ঔপন্যাসিক নিঃশঙ্কচিত্তে লিখে গেলেন—"Thank God, quite well."

ওয়াল্টারকে সুলক্ষণ পুত্র হিসাবেই গ্রহণ করলেন তিনি। নাম রাখলেন—এড্‌গার। এমনি সময়ে অতিথি হয়ে এলেন কবিবন্ধু ওয়াল্টার সেভেজ্ ল্যাণ্ডার। ডিকেন্স বললেন—তুমি এড্‌গারের ধর্ম-পিতা। কবি আপত্তি করলেন না। এডগারের নাম হলো—ওয়াল্টার ল্যাণ্ডার ডিকেন্স। "নামটি সুন্দর। তার চেয়েও বড় কথা তোমার আমার হৃদ্যতার পরিচয় থেকে গেলো এর নামে—" ডিকেন্স হেসে বললেন।

ছেলেটি ক্রমে বড় হলো। স্কুল থেকে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফেরে। ডিকেন্স আদর করে বলেন—"ইয়ং স্কাল্, আই ব্লেস য়ু।"

ক'বছর পরের কথা। ল্যাণ্ডার চাকরী নিয়ে ভারতবর্ষে আসছে। মিস্ বারদেৎ কাউট্‌স নিজে বহু চেষ্টা করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবিভাগে তার জন্যে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করেছেন। ডিকেন্স এই সুখবর জানিয়ে বন্ধুকে লিখলেন:

"ওয়াল্টার শিগ্ গিরই ভারতবর্ষে পরীক্ষা দেবে। তারপর পাস করলে সে এক বিচিত্র দেশে জীবনধারণ করে কর্মে নিযুক্ত থাকবে।"

কিন্তু বেশীদিন ছেলেটিকে থাকতে হল না এ দেশে, মহাকাল কেড়ে নিয়ে গেল তাকে। ১৮৫৭ সালের জুলাইয়ে ওয়াল্টার জাহাজে চড়েছিল। আর ক'বছর যেতে না যেতেই—ফেরার জাহাজে পা পড়বার আগেই থামতে হলো তাকে। মা-বাবার ভয় ছিল অন্য দিকে। মাত্র মিউটিনি হয়ে গেছে এমন সময়। কিন্তু দেশীয় সিপাহীদের হাতে প্রাণ গেল না ওয়াল্টারের—মৃত্যু হলো তার অসুখে।

ছুটি নিয়েছে। বাড়ি যাবে। কোলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়বে। ওয়াল্টার তাই উত্তর-ভারত থেকে কোলকাতায় এসেছে। সহসা অসুখ। হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। আলীপুরের মিলিটারী হসপিটাল। অনেক বড় বড় ডাক্তার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ৩১শে ডিসেম্বর,—বছরের শেষ দিনে দূর ভারতবর্ষের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ফেললে ডিকেন্সের দুইটি মাত্র ছেলের একটি। তাঁর স্নেহের এড্ গার।

খবর গেল দেশে। ডিকেন্স কলম নিয়ে বসলেন। তারপর লিখলেন তাঁর জীবনের সবচাইতে ছোট গল্পটি:

Aged—23 years. In memory of Lieut. Walter Landor Dickens, the second son of Charles Dickens, who died at the Officer's Hospital, Calcutta, on his way home on sick leave, December 31st. 1863.

ক'লাইনে একটি দীর্ঘ ছোট গল্প। ওলিভার টুইস্ট্ লিখতেও বোধ হয় চোখ দিয়ে জল পড়েনি তাঁর। কিন্তু এই ক'লাইন লিখতে বার বার নিশ্চয় কাগজের উপর টপ্ টপ্ করে পড়ছিল ঔপন্যাসিক-শ্রেষ্ঠের চোখের জল! পাথরের গায়ে, আলীপুরের এই কবরখানায় আজও যেন চিক্ চিক্ করছে সেই ক'ফোঁটা অশ্রু।

॥ কোলকাতার বাঙালী ॥

কোলকাতার বাঙালীবাবুর গল্প বলার আগে একটা বিলেতি গল্প বলে নিই। এক স্কচ্ লণ্ডনে গেছেন। উদ্দেশ্য : ব্যবসা এবং শহর দেখা দুই-ই। ফিরে আসামাত্র পাড়াপড়শীরা সব ছেঁকে ধরলো : হ্যাঁ ভাই লণ্ডন কেমন দেখলে? ইংরেজেরা সব লোক কেমন?—স্কচ্‌দের মতো কি? ভদ্রলোক চমকে উঠলেন প্রশ্ন শুনে।—তাই তো, লণ্ডন তো ভালই দেখেছি, কিন্তু ইংরেজ তো চোখে পড়েনি! কথাবার্তা যাদের সঙ্গে হয়েছে তারা তো সব ব্যবসায়ী।

কোলকাতার বাঙালীও তাই। অন্ততঃ অষ্টাদশ শতকে তাই ছিল। সুতরাং আগেই বলে রাখি এখানে কোলকাতার বাঙালীর এই গল্প বঙ্গদেশের বাঙালী নামক জাতির গল্প নয়।

রামমোহন বাঙালীকে ভাগ করেছিলেন তিনটে শ্রেণীতে। এক, গেঁয়ো বাঙালী বা রাজনারায়ণ বসুর ভট্টাচার্য বাঙালী। সমস্ত বুনো রামনাথেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। গিন্নি উতলানো ডালকে সামান্য ক'ফোঁটা তেলে বশ মানাতে পারেন দেখে এঁরা গল-লগ্নী-কৃতবাসা হইয়া করজোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলেন : কে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা? বল, অবশ্য কোন দেবী হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণী : কর্মজীবী বাঙালী। এঁরা সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী এবং উকিল-মোক্তার, মুন্সী প্রভৃতি। এঁরা কোম্পানীর কিংবা তস্য কর্মচারীদের হৌসে কিংবা দেশী জমিদারের কাছে চাকরী করেন। এঁদের কাছে পথ এবং বিপথ, ধর্ম এবং অধর্ম সমান। রামমোহন এঁদের সমর্থনে বলেছেন : অন্য কোন পথে জীবিকা সংস্থান করতে

না পেরেই এঁরা এমনিভাবে চলতে বাধ্য হন। এঁদের বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে আর একটি শ্রেণী। রামমোহনের সমাজ-বিন্যাসে তাঁরা বাঙালীকুলে দ্বিতীয়। আমার বর্তমান হিসাবে তৃতীয়। এঁরা শহুরে বাঙালী।

হুতোম অনুযায়ী এই শহুরে বাঙালীকে ভাগ করতে পারি আমরা চার ভাগেঃ (১) বড়মানুষ, (২) দালাল এবং মোসাহেব, (৩) বেকার জয়কেতু, এবং (৪) শিল্পী বা বাইজী, খেমটা, কবি, যাত্রাওয়ালা, বৈষ্ণব, গোঁসাই, পুরোত প্রভৃতি।

হুতোম থেকেই এই চার শ্রেণীর পরিচয় নেওয়া ভাল। প্রথম ধরুন বড়মানুষের কথা। কিভাবে তাঁরা বড় হলেন তা আমরা সন্ধান করবো না। কারণ শাস্ত্রে বলে বীর, নদী এবং নারীর উৎস সন্ধান করতে নেই। কোলকাতার বড়মানুষেরা যথার্থই বড়, এবং সেই অর্থে বীরতুল্য। সুতরাং সেইদিকে দৃষ্টি না দেওয়াই ভালো। হুতোম অবশ্য দিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেবো না। কারণ 'ভালুকের লোম বেছে' নিজেদের বড় হওয়ার কাহিনী শুনতে আমাদের ভালো লাগে না। আমরা শুধু শুনবোঃ তাঁরা গোলাপ-জলে জল-শৌচ করতেন, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরতেন। পাছে কোমরের কোমল চর্মে জরির পাড়ের চোট লাগে তাই এই ব্যবস্থা। হাটখোলার দত্তবংশের তনুবাবু নাকি এজন্যে বিলক্ষণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তনুবাবু অবশ্য একমাত্র বাবু ছিলেন না। আরও সাতজন ছিলেন প্রায় সমপর্যায়ের। আটজনে মিলে তাঁরা ছিলেন 'আটুবাবু।' এঁরা মুক্তাভস্ম দিয়ে পান খান, কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করেন, যাত্রায় নোট ফেলেন, গায়ে তেল মেখে ভেঁপু বাজিয়ে চার ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে স্নান করতে যান। আজ্ঞা-হুজুর উঁচু গদী, কার্তিকের মতো বাউরীকাটা চুল, একপাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিতা বেশ্যা পোষেন। এঁরাই সমাজের রক্ষক, বারোয়ারী বা বার-ইয়ারী পুজোর প্রধান পেট্রন,

শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। হুতোমের মতেঃ ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মায়, তাঁর আমলে (অর্থাৎ রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতির আমলে) তেমনি রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি কবি জন্মায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার রিফর্মারও ছিলেন বটে। রামমোহন তখনও দেখা দেননি। তার আগেই বাগবাজারে রামমোহন হয়ে উঠলেন একজন। তিনি শিবচন্দ্র ঠাকুর। শিবচন্দ্র বাগবাজারে রামমোহন, কেননা পক্ষীর দল গড়ে তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। তাঁর আটচালায় বাগবাজারের ছেলেরা পক্ষী হতো, উড়তো।

বড়মানুষদের পরেই দালাল এবং মোসাহেবেরা শহরের দর্শনীয়। দালাল এবং মোসাহেবে পার্থক্য অতি সামান্য। দালালই—মোসাহেব, আবার মোসাহেবই দালাল। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ফেল মেরে কেউ কেউ দালালী করেন, আবার কেউ কেউ মোসাহেবী করতে করতে পাকা দালাল বনে যান। এটাকে খুব বড়-রকমের পদোন্নতি ভাববেন না। হুতোমের পদ্মলোচন এর অনেক নীচু থেকে এর চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। পদ্মলোচন প্রথমে ছিলেন বাবুর ফাইফরমাসী বয়। কাপড় কোঁচান, ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে লুচি পাকান ছিল তাঁর কাজ। এ কাজে হাত পাকিয়ে নাম হয় তাঁর—'মেকার পদ্মলোচন।' মেকার পদ্মলোচন বাবুদের ধরাধরি করতে করতে জনৈক বাবুর আনুকূল্যে প্রথমে নিযুক্ত হন তাঁদের হৌসের 'শিপ্-সরকার' বা ওজনবাবু। সেখান থেকে ক্রমে সদরমেট্, তারপর মুৎসুদ্দি এবং অবশেষে—'হঠাৎ অবতার'! তবে সকলকেই এই এভলিউশনের জন্য অপেক্ষা করতেই হয় এমন নয়, কেউ কেউ বর্ন-দালাল বা জাত-দালাল। কিংবা জাত-মুৎসুদ্দি। দু-কাজেই সমান পসার। দালালীতে কাজ সামান্য। কার বাড়ি বিক্রি হবে, কার বাগানের দরকার,

কে টাকা ধার করবে তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ। এজন্যে অনেক চোটাখোর বেনে ও ব্যাভার বেনে শহুরেবাবু দালাল চাকর রেখে থাকেন। তারা শিকার ধরে আনে, বাবুরা আড়ে গেলেন। মাইনে ছাড়াও একাজে পয়সা বিস্তর। সুতরাং কোলকাতার দালাল ব্রাউহাম গাড়ী চড়ে, 'কলাগেছে থাম ফেঁদে বসে।'

মোসাহেব আরও করিৎকর্মা। তার একমাত্র কাজ 'বাবুর ল্যাজ ফোলান। এজন্যে বাবু বুঝে তাদের মাইনে এবং মাসোহারা বরাদ্দ করা আছে।' নিজের থাকবার ঘর পর্যন্ত নেই, 'মাসীর বাড়ি অন্ন লুটেন, ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বসবার আড্ডা।'

তৃতীয় দলের যারা: তারা শহরের বেকার যুবক দল। হুতোম এদের বলেছেন—'বেকার জয়কেতু। এঁরা ভদ্রলোকের ছেলে। অনেকে লেখাপড়া জানেন; তবে কেউ কেউ মূর্তিমতী মা। যার যখন নতুন বোলবোলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাকেই জগতের শ্রেষ্ঠ দেখান ও অন্য মনে তারই উপাসনা করেন, আবার কেউ যদি তার চেয়ে উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাকে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে মিশেন।' ব্যক্তিগতভাবে এরা প্রত্যেকেই আজকালকার যুবকদের মতোই বিশেষ আদর্শে আস্থাবান, বিশেষ বিশেষ দলে বিভক্ত। অর্থাৎ এরা মোটামুটিভাবে "গোখুরী, ঝকমারী এবং পক্ষীর দলে বিভক্ত।" প্রত্যেকেই এই তিন দলের কোনটির না কোনটির ভলান্টিয়ার—অর্থাৎ দোহার। এদের আরও গুণ আছে। 'এরা ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে স্নানে যেতে গিয়ে বাজারের মেয়ের অভাবে ঘরের পিসীকে সহযাত্রিণী করে। মত্ত অবস্থায় বৃদ্ধ পিতাকে আহত করে মাকে সান্ত্বনা দেয়: 'ও, ওল্ড ফুল মারা যাক্ না কেন, একে আমরা চাইনে; এবারে মা এমন বাবা এনে দেব যে, তুমি, নতুনবাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে হেলথ্ ড্রিঙ্ক করবো।'

কোলকাতার বাঙালীর প্রধান প্রধান তিন শ্রেণীর এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পরিচয়। চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ কবিওয়ালা খেমটাওয়ালী প্রভৃতি শিল্পীদের কাহিনী এখানে বাদ দিচ্ছি। এই তিন শ্রেণীর একটা পাঁচমিশালী সান্ধ্য মজলিসের কথা ভাবুন। তারপর ভেবে দেখুন—এদের বাহবা পেতে হলে কি গান গাওয়া দরকার, দরকার কেমন তালে নাচা। তাহলেই বুঝতে পারবেন—সহরের শিল্পীদের হালত।

কোলকাতার বাঙালীদের এসব দেখে দেখে ইংরেজেরা তাদের সম্বন্ধে মোটামুটি যে একটা এষ্টিমেশন দাঁড় করিয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। বাঙালী-চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের পাঠের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে কোলকাতার বাঙালী-পরিচয় শেষ হয় না।

এই সেদিনের কথা। এক সাহেবি কাগজ লিখছেন :

We have found a timid Bengali Baboo capable of performing one of the bravest acts of gallantry, under circumstance, repugent to his nature, opposed to his caste principles and contrary to his inbred scruples, if not indeed to his religious belief. We refer to the man known as "Bengali Hero."

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯০৭ সালে। নফর কুণ্ডু ম্যানহোল্ থেকে একটা কুলিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন কোলকাতার রাস্তায়। সারা শহরে 'ধন্য ধন্য' রব উঠেছে। সাহেবেরাও তাতে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু এই ভূমিকা সহ। কারণ তাঁদের কাছে বাঙালী ভীরুতার মূর্তবিগ্রহ (perfection in timidity)। নানা ভাবে এই কোলকাতা শহরে না খেয়ে মরতে দেখা গেছে তাদের, কিন্তু কখনও অন্যকে বাঁচাবার জন্যে নয়। তাই তাদের মতে নফর কুণ্ডু কোলকাতার প্রথম 'বঙ্গবীর'। এবং বিশেষভাবে মনে রাখতে

হবে—এই বীরের আবির্ভাব কাল—বিংশ শতকের প্রথম দশকে অর্থাৎ—আমার বাঙালী-পরিচয়ের একশ' বছর পরে।

একশ' বছর আগে শহুরে বাঙালীর যে পরিচয় আমরা পাই তাতে তাকে ভীরু বলা ভুল। হুতোম বলেছেন: সে নিজের ছায়া দেখে নিজে আঁৎকে ওঠে, ভয় পায়। আর এক সাহেব মন্তব্য করেছিলেন: বাঙালীবাবুর একটি সন্তান হলে তিনি পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এই ভেবে যে, তার পৌরুষ অক্ষুণ্ণ আছে!

এহেন বাঙালী বাবু ইংরেজের কাছে সরকারের কাজ করেন। সাহেব একদিন কোন কারণে রেগে তেড়ে এলেন তাঁকে মারতে। বাবু নিরুপায় হয়ে চিৎকার করে উঠলেন: Master can die, Master can live,—অর্থাৎ প্রভু, আমার জীবন আপনার হাতে, ইচ্ছে করলে মারতে পারেন, ইচ্ছে করলে রাখতে পারেন। ফল ফললো উল্টো। মনিব উঠলেন আরও চটে।—কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?—Master can die! দেখাচ্ছি তোমাকে,—বলে লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। সরকার দেখলো বেগতিক; নিশ্চয় কোথায়ও গোলমাল হয়ে গেছে। তখন প্রাণভয়ে সে চিৎকার করে উঠলো—Stop there. অর্থাৎ অনুগ্রহ করে থামুন প্রভু,—Die me, ইচ্ছে করলে তো আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন-ই। কিন্তু—

If master die, then I die, if my cow die, my black stone die, my fourteen generation die.

অর্থাৎ আমার মনিব মরলে আমি মারা পড়বো, আমার গরুটি মারা যাবে, আমার ব্ল্যাক স্টোন অর্থাৎ বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর মারা যাবেন এবং আমার ফোরটিন জেনারেশন—অর্থাৎ চৌদ্দ পুরুষ নিপাত যাবে, সুতরাং প্রভু আমায় রক্ষা করুন।

স্লেভ, স্লেভ!—বাঙালী মানে স্লেভ। স্টিভেনস (G. W. Steevens) নামে এক সাহেব অনেক গবেষণা করে বললেন, বাঙালী

মানে স্লেভ্। দেখছ না এদের পাগুলো। স্বাধীন মানুষের পা থাকে সোজা, লম্বা আর বাঙালীর পাগুলো দেখ কেমন হাড্ডি-চর্মসার, আগাগোড়া এক মাপের। উরু গোল, মেয়েদের মত। স্লেভদের এমনিই থাকে। স্লেভ এরা চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবেও। স্লেভদের সব গুণই দেখতে পাওয়া যাবে এদের মধ্যে। যেমনি প্রভুভক্ত, তেমনি বাক্‌বিচক্ষণ।

স্টিভেনস সাহেব কথিত বাঙালীর এই 'বাক্-বিচক্ষণতা'র একটা উাদহরণ দিয়েছেন ম্যাকবেরী সাহেব। ম্যাকবেরী ছিলেন, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের সেক্রেটারী। তিনি দেশে চিঠি লিখছেন: এখানে ঘরে বাইরে প্রতি মুহূর্তে আমরা প্রতারিত হচ্ছি। এইমাত্র কলিংস একটা সরকারকে গালাগালি করছিল। শুধু মাত্র হিসেবের হেরফের করে ব্যাটা এক্ষুনি আমাদের প্রায় দেড়শ পাউণ্ড ঠকিয়েছিল আর কি! ধরা পড়ে কি বলছে জান?

—ওঃ হোঃ, সাহেব তাহলে বের করে ফেলেছেন?

—তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে—

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আলবৎ স্বীকার করবো, হুজুর যেখানে বলছেন আমি সেখানে অস্বীকার করতে পারি? কি যে বলেন হুজুর?

—তবে?

—আর তবে! আমার হিসেব-ই হুজুর ভুল হিসেব; হুজুরের হিসেব রাইট হিসেব। Very right what my master say, my way bad way, master's account right! আমার কায়দাটাই হুজুর ভুল!

এসব দেখেশুনে চার্লস গ্রাণ্ট (১৭৯২) বলেছিলেন: ইউরোপের নিকৃষ্টতম অঞ্চলেও এমন বহুলোক পাঁওয়া যাবে যারা সৎ, সরল ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু বাংলাদেশে এমন লোক বিরল।··· নিজ স্বার্থ ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই হিন্দুরা উদাসীন।···দেশাত্মবোধ কাকে বলে তা তারা জানে না।

—'দেশাত্মবোধ ! দেশাত্মবোধ তো দূরের কথা, মিথ্যে ছাড়া ব্যাটারা কি জানে শুনি !'—কথায় কথায় মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলে গালাগালি করতেন নাকি জস্টিস ওয়েলস সাহেব আমাদের।

শুনে শুনে একদিন হঠাৎ রাগ চেপে গেল বাঙালী বাবুদের। অষ্টাদশ শতক তখন শেষ হয়ে গেছে। ওয়েলস সাহেবদের খোঁচায় খোঁচায় কেঁচো বাঙালী সাপ হয়ে উঠলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলে সভা করবে। উপরে দরখাস্ত পাঠাবে। কিন্তু গোটা শহরে বাঙালী সভার ঠাঁই নেই। 'টাউন হল সাহেবদের, নিমতলার ছাতখোলা গভর্ণমেণ্টের, প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচজন সাহেব-সুবার সঙ্গে আলাপ আছে।···শেষে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে সভা হবে স্থির হলো।'

স্থির হলেই সভা হয় না। কারণ 'শহরের অনেক বড়মানুষ—তাঁরা যে বাঙালীর ছেলে ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন ; রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দিরে ওয়েলসের বিপক্ষে বাঙালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন।' তাঁরা সভা পণ্ড করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। তবুও সভা হলো। বাংলা দেশের ইজ্জতের নামে—কোলকাতার দশ লক্ষ বাঙালী দরখাস্ত লিখল সে সভাতে। হুতোম সভার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : বাঙালীর যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেছে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল।

এই সাহসকে ভর করেই 'জয় মা-কালী কলকেত্তাওয়ালী' বলে কোলকাতার বাঙালী পা দিল উনিশ শতকের কোলকাতায়।

॥ লটারীর শহর ॥

রাডিয়ার্ড কিপলিং কোলকাতাকে বলেছিলেন ভুঁই-ফোঁড় শহর। যেমনি বলা, আর যায় কোথা। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা হৈ হৈ করে তেড়ে এলেন—একি বলেন স্যার, একি বলেন— ? ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি যাবতীয় যুক্তিসহ তাঁরা কোলকাতার মর্যাদা রক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন ইংরেজ রাজপুরুষেরা। তাঁরা সাক্ষ্য দিলেন। বললেন, ম্যালেরিয়া আর রক্ত আমাশয়ে আমরা কি হাজারে হাজারে মারা যাইনি এখানে। আমারা লড়াই করিনি, আমরা—কি—। এ কথার বোধ হয় জবাব নেই।

তবুও আলীপুরের মিলিটারী কবরখানা থেকে শুরু করে ইংরেজদের প্রতিটি কবরখানা ঘুরে আসার পরও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিপলিং সাহেব ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে যাই বলে থাকুন—কোলকাতার কথাটা যথার্থই বলেছেন। এ শহর সত্যই লটারীর শহর। জানি, একটু পরে আপনিও স্বীকার করবেন, একথা। কিন্তু তার আগে বলুন দেখি, আপনি বিশ্বাস করেন কিনা লটারীতে, ভাগ্যে। অন্ততঃ খবরের কাগজের রাশিফলে ?

যদি 'না' বলেন তা হলেও আমি মানবো না। কারণ, 'না'য়ে বিশ্বাস নেই আমার। কেন, শুনবেন কোলকাতার সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই শহরে কিছু কিছু লোক আছে যাঁরা কোন ধর্মে আস্থাবান নন (Person who did not return a religion)। কথাটা চোখে পড়া অবধি আমি সেই সব ধর্মহীনদের (অ-ধার্মিক নয় কিন্তু) সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু গেল তিন

মাসে সম্ভাব্য এলাকা এবং আস্তানায় ঘুরে ঘুরে কি পেয়েছি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। দু'টি মাত্র বলছি। প্রথমটির নিবাস ব্রাবোর্ন রোডের ফুটপাথ। অবলম্বন—পতিত জমি ঘেরা একটি দেওয়াল। উপজীবিকা বোধ হয় ভিক্ষা (যে দু'দিন তাকে আমি দেখেছি সে দু'দিনই সে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। সে দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য ছিল, প্রার্থনা ছিল না)। পরিবার-কর্ত্রী পোড়াকাঠের মত কোন বয়সের এক মেয়ে। তার সংসার—তিন খানা ইট, একখানা মাটির হাঁড়ি আর তিনটি হাড্ডিসার সন্তান। কিন্তু একি—মাথার ওপরে সেই আঁস্তাকুড়ের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে একখানা সিন্দুরচর্চিত রং-চটা দেবীমূর্তি। বোধহয়—কালী।

দ্বিতীয় জনের নিবাস—চিৎপুর রোড্। তারও আশ্রয় ফুটপাথ। তবে এতো নিঃসঙ্গ নয় সে বেচারা। স্থানটি আবর্জনা-স্তূপ সংলগ্ন তাই অনেক কুকুর এবং তার নিত্য প্রতিবেশী। তার দেওয়ালটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় বিলক্ষণ কলা-প্রীতি আছে লোকটির। একগাদা ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা দেওয়ালে। প্রধানতঃ কাপড়ের ট্রেডমার্কের সংগ্রহ। যতখানি দেখেছি—তার বেশীর ভাগ ছবিই—রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি, খাদ্যভাণ্ড হাতে অন্নপূর্ণা, সিংহারূঢ়া জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি। সুতরাং বুঝতে পারছেন, এরা দু'জনেই হিন্দু। প্রথমটি শাক্ত, দ্বিতীয়টি শৈব। আর উদাহরণের দরকার নেই। তাহলে সেন্সাসের মতো এক ভল্যুম রিপোর্ট লিখতে হবে আমাকে।

এর পর নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন আমি ভাগ্য-ভূত-ভগবান এবং লটারীতে আস্থাহীন লোক আছে বলে বিশ্বাস করি না। আমিও নিরীহ বঙ্গ সন্তান। 'মদায়ত্তং পৌরুষং' বলার মতো জোর আমার কল্‌জেয় নেই। কারণ আপনাদের মতো আমারও শৈশব কেটেছে হাঁচি-টিকটিকি-কুষ্ঠি-ঠিকুজী এবং গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা অনুযায়ী। এই যৌবনেও আমি বারবেলা কালবেলা গুনে পথে নামি। রাশিফলের জন্য রোববারে তিনখানা

বাংলা কাগজ রাখি। রীতিমত স্টাডি করে বিশেষ কোনটির স্বপক্ষে পরের মাসে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করি। স্বভাবতঃই প্রতি মাসে আমার সমর্থন পত্রান্তরিত হয়। এ বয়সেই পাখী, কুলো, ষাঁড়, জ্যোতিষী কোনটাতেই অবিশ্বাস নেই আমার। টিকিট কেনার পয়সা থাকলে লটারীতে তো নয়-ই। সুতরাং বুঝতে পারছেন কেন আমি কিপলিং সাহেবের সঙ্গে একমত। বস্তুতঃ কিপলিংয়ের সমর্থনে অনেক কষ্ট করে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি আমি শুধু মাত্র এই একটি কারণেই। আহা, এতো বড়ো শহরখানাই যদি সত্যি-সত্যিই ভাগ্যের দান হয়— !

ইতিহাস বলে—'হতো' নয়, তাই হয়ে আছে। এ-শহর লটারীর শহর।—কোথায় থাকেন আপনি? কর্নওয়ালিস স্ট্রীট—কলেজ স্ট্রীট? মানিকতলা-বউবাজার-আমাহার্স্ট স্ট্রীট—কোথায়? আরো এদিকে? ওয়েলিংটন স্ট্রীট—ওয়েলেসলি? কোথায়, সাহেব পাড়ায়? লাউডন স্ট্রীট, হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীট,—জানবেন, এর যেখানেই থাকেন আপনি আপনার ওখানে বাস নেহাৎ ভাগ্যের লীলা। কারণ আরো। অনেক পথের মতো ওগুলো পুরোপুরি লটারীর দান। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট, হেস্টিংস স্ট্রীট, ক্রীক রো, ম্যাঙ্গো লেন, বেন্টিক স্ট্রীট—এগুলোও অংশতঃ তাই। অর্থাৎ লটারীর বরে এগুলো অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়েছে, পুষ্ট হয়েছে কিংবা মসৃণতা লাভ করেছে। আচ্ছা, ধরে নিচ্ছি আপনি আমার মতোই বাস্তহারা। বেলেঘাটা কিংবা পার্ক-সার্কাসের কোন বস্তি-বাসিন্দা। কোথায় স্নান করেন আপনি,—বেলেঘাটা খালে? ওয়েলেসলি স্কোয়ারে? এগুলোও কাটা হয়েছে আগের পথেই, ভাগ্যের বলে।

বাবুঘাটের উদ্বাস্তুরাও জানতে পারেন বাবুঘাটও লটারীর দান। তারপর, জনসভায় অরুচি নেই নিশ্চয়। এমন দল-মত-নিরপেক্ষ

প্রিয় সভাস্থল ওয়েলিংটন স্কোয়ারও তাই, বুঝতে পারছেন ব্যাপারটি তাহলে।

আচ্ছা, আরও খুলেই বলি কথাটা। যে যুগের কথা বলছি তখন পৌরসভাও নেই, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টও নেই কোলকাতায়। অষ্টাদশ শতকের কথা। সে যুগে রাস্তা-ঘাট তৈরি, মেরামত তথা পরিচ্ছন্ন করা হত লটারীতে, লটারীর টাকায়। ১৭৯১ সাল থেকে চলে আসছে এই প্রথা। অনেককাল পর্যন্ত, সম্ভবতঃ ১৮৩৬ সাল অবধি এটাই ছিল প্রথা, অন্য সব ব্যতিক্রম। বে-সরকারী ভাবেই শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সরকারও পা বাড়ালেন এ পথে। সরকারী লটারী হত। সরকারী কমিটি। ১৮০৯ সালে স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেল বসালেন—এক লটারী কমিটি। ওয়েলেসলি সাহেবের ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি আরও প্রসার ঘটাল তার। যেমনি টিকিট তেমনি টাকা, তেমনি পুরস্কার। গরীব লোক শুনত, কিনতে পারত না। একখানা টিকিটের দাম হয়ত ৫০ সিক্কা টাকা। আর একজন মশালচীর মাসিক মাহিনা—দুই টাকা! তবে পুরস্কারও ছিল তেমনি। চার্লস ওয়েষ্টন (১৭৯১) শেষ টিকিটের মালিক হিসাবে পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন—গোটা টিরেট্টা বাজারটি! তখনকার দিনেও তার দাম কমপক্ষে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা! ১৮০৯-১৭ সালের মধ্যে কমপক্ষে সাড়ে বার লাখ টাকা দিয়েছে মানুষ পুরস্কারের আশায়। ১৭ সালে উঠে গেল ওয়েলেসলির কমিটি। আবার নতুন করে বসল আর এক লটারী কমিটি। পুরনো সারাই তাদের কাজ নয়—সে দায়িত্ব তখন চলে গেছে অন্য হাতে। ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনে। এদের কাজ হল—নয়া পুকুর তৈরী, নতুন ড্রেন কাটা, গাছপালা কেটে নতুন রাস্তাঘাট তৈরী ইত্যাদি। অনেক কাজ হয়েছে তখন। সম্ভবতঃ আপনার বাড়ীর সামনে পেছনের রাস্তা দুটো সে কালেরই তৈরী। অবশেষে ১৮৩৬ নাগাদ এসে বন্ধ হয়ে গেল—সরকারী লটারী।

কেন হল সে একটা প্রশ্ন বটে। কেউ কেউ বলেন—জনসাধারণ নীতির নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছিল। মানুষের লোভ প্রবৃত্তিকে এমনিভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলাতে তারা গররাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শুধু সে কারণে বন্ধ হয়েছে বলে মনে করেন না অন্যরা। কারণ নেটিভদের মর‍্যাল নিয়ে বৃটিশ শাসকদের ভাবনার কোন কারণ থাকতে পারে এটা বিশ্বাস করার মত কথা নয়। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে তখন এই লটারী সর্বজনপ্রিয় খেলা! তবে মনে হয়, উঠে গেল—লোকসান খেয়ে। বহু টাকা ঋণ হয়ে গিয়েছিল নাকি কমিটির। তবুও কত লাভ করেছিলেন তাঁরা দশ বছরে জানেন?—১০,১৯,৩৪৯৲ টাকা। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৪৮,৯৪৫৲ টাকা!

আমরা শুনেছি সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল টাউন হলের লটারী। পাঁচজন মিলে মিশে একটু খানাপিনা নাচ-গান আলাপ আলোচনা করব—অথচ এমন একখানা হল নেই শহরে এ কেমন কথা? কোলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা লা গ্যালারিস ট্যাভার্নে সমবেত হলেন। প্রস্তাব গৃহীত হল। যুগপৎ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন আরও একদল। তখনকার দিনে দল থাকলে, এসব ব্যাপারে দলাদলি ছিল কম। দুই দল এক হয়ে গেলেন। তারপর শুরু হল—কাজ। কাজ মানে লটারী। শহরময় রটে গেল টাউন হল হবে, লটারী হবে। হু হু করে বিক্রী হয়ে গেল টিকিট। ৬,৫০০ টিকিট। এক একখানা ৬০ সিক্কা টাকা। ১,৩৩১ খানা ছাড়া আর সব ফাঁকা। গরীবেরা শুনল। বড় মানুষেরা হৈ হৈ করলেন কিছু দিন। লটারী হয়ে গেল। কিন্তু খানাপিনা হবে বলেই এত আর রেস্টুরেন্ট গড়া নয়—টাউন হল।—টাকা চাই কত! সুতরাং আবার হল, আবার হল। পর পর চারবার হল টাউন হল লটারী। তারপর তৈরী হল আজকের বাড়িটি। ২২শে মার্চ, ১৮১৪। সময় লাগল পনর বছর আর টাকা গেল ৭ লক্ষ! তাজমহলের প্রায় কাছাকাছি।

টাউন হল দেখে এসেছি। পুনঃসংস্কার হচ্ছে বলে নয়—লটারীর ধন বলে। ভাগ্য-বিশ্বাসে কত বড় কাজ করে ফেলতে পারে মানুষ তার সাক্ষী এই বাড়িটি। তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়ালাম—কিন্তু কোথাও পেলাম না সেই সব ভাগ্যহীনদের নাম। স্ত্রীর গহনা অথবা জমি বন্ধক রেখে যারা কিনেছেন ষাট সিক্কা টাকায় ফাঁকা টিকিটগুলি। দেশী বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ছবি আছে, মূর্তি আছে, স্মারক চিহ্ন আছে; কিন্তু নেই ভাগ্য-বিশ্বাসী সেই সব ভাগ্যহীনের একজনও। তাদের উত্তর-পুরুষেরা কোনদিন টাউন হলে নাচ গান করেনি, খানাপিনা করেনি, খাদ্য দপ্তরের লোয়ার ডিভিসন কেরানী হিসেবে—কলম পিষে গেছে এর বিরাট বিরাট স্তম্ভের আড়ালে, অথবা নিম্ন আদালতের মুহুরিগিরি! এখনও টাউন হলের নীচে রাস্তার রেলিংয়ের পাশে, রাজভবনের দরজায়, এখানে ওখানে তারা দোকান সাজিয়ে বসে। রঙ-বেরঙয়ের টিকিটের দোকান। রাজ্যপাল যক্ষ্মাভাণ্ডার, রেডক্রস—কত কি নাম জানা না জানা টিকেট। লাইন টানা ফরম, দোয়াত কলম। একখানা টুল। ভাগ্যের টিকিট বিক্রি করে সংসার চালায় এরা দুর্ভাগ্যের প্রহর গুনে গুনে। আজব ভাগ্য বৈকি! এর পরও কি বলতে পারেন আপনি, কিপলিং সাহেব মিথ্যা বলেছেন?

॥ কাফি হৌস ॥

আরে, আরে, আসুন আসুন।—ইস, কতদিন পরে দেখা! তারপর কি খবর?—কেমন আছেন?—সব ভালো তো? ওমুকের খবর কি, তমুক কি করছেন আজকাল? ইত্যাদি।

ভদ্রলোক উত্তর দিতে দিতেই বসলেন।

—হারে, বাইরের ঘরে আর একটা চা দিতে বল।—তারপর—ওঃ, আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি বুঝি? আমার উপস্থিতি এতক্ষণে মনে পড়লো গৃহকর্তার। আলাপ করিয়ে দিলেন। দু'জনেই তাঁরা সাহিত্যিক। বাংলা দেশে দু'জনেই খ্যাতনামা ব্যক্তি।

সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে আলাপ। সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্নটিই হলো—তারপর, কি লিখলেন ইদানিং।—আঃ, আপনার সেই লেখাটি আজও—।

ভদ্রলোক বাধা দিলেন।—রেখে দিন ওসব লেখার কথা। আপাততঃ আপনাদের এদিকে একখানা বাড়ির সন্ধানে এসেছি।—লেখা-টেখার পাট উঠে যাওয়ারই মতন হয়ে এসেছে।—আপনি কি লিখছেন তাই শুনি—।

—আর লেখা! এ ভদ্রলোকের কণ্ঠেও রীতিমত খেদ। হঠাৎ অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠলেন তিনি। লিখবো কি ভাই, লেখা আসবে কোথা থেকে বলুন;—আড্ডা সুখ পাই না আজ কতো-কাল! বলার ভঙ্গীটি এমন যেন পুত্রশোক পেয়েছেন আড্ডার অভাবে।

আমি আর পারলাম না। হেসে উঠলাম।

—কি, হাসলে যে তুমি?—রীতিমত সমবেদনা নিয়েই দ্বিতীয়

সাহিত্যিক বললেন,—তুমি লেখ-টেখ ? তবে জেনে রেখো—আড্ডা সুখ সর্ব সুখের মূল ! ঠিকই বলেছেন উনি। আড্ডা না পাওয়ার যে কি দুঃখ, তা একবার যে আড্ডা সুখ পেয়েছে সে-ই জানে।—বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে—।

অতঃপর আড্ডা প্রসঙ্গেই জমে উঠলো সেই দুই প্রবীণ সাহিত্যিকের আড্ডা। সেই আড্ডা এতো গভীর এবং এমন ঐতিহাসিক যে, আমার মতো তরুণ তাতে খেই পায় না। সুতরাং শ্রোতা হয়েই রইলাম। কথায় কথায় অবশেষে নামলেন তাঁরা কফি হাউসে। ভদ্রলোক বলছিলেন—'কাফি হৌস্'। কিছুটা ইংরেজী এবং কিছুটা হিন্দী মেজাজে !

—কি, তুমি যাও না বুঝি কাফি হৌসে ?—তবে কিছু হবে না। ইয়ং বেঙ্গল কফি খায় নি। তারা দুধ বেচে মদ খেয়েছে ;—

—আর ১৯০৫-এর বাংলা খেয়েছে মদ বেচে দুধ !—তাই না ? ফোড়ন কাটলেন অন্য জন।

—দূর, তাও খায়নি। ওঁরা গঙ্গাজল খেয়েছেন, আর গীতা পাঠ করেছেন ! নয়ত ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ এঁরা এমন হন ?

—তবে নিও-বেঙ্গল চা না কফিতে সেটা নিয়ে কিন্তু বিতর্ক হতে পারে। এই ধরুণ আমরা,—আমরা কিন্তু ছোকরা বয়সে কফি পাইনি। এনতার চা লুটেছি—।

—কিন্তু সে ঘাটতি পুষিয়ে নিয়েছিও তেমনি বুড়ো বয়সে। আচ্ছা ভাই, কফি হাউস কি সত্যিই তুলে দেবে ?

—আমি বললাম ঃ তাই তো দেখছি কাগজে।

—আরে কাগজে তো আমিও দেখেছি। সে কথা হচ্ছে না। আমার মনে হয় এমন অপকর্ম ওরা করবে না।—তোমরা নিয়মিত গতায়াত কর তো, ওখানে কেমন শুনছো ? স্পষ্ট নিউজ্ চাই—।

বললাম ঃ উঠে যাবেটাই তো শুনছি সেখানেও !

ক্ষেপে উঠলেন ভদ্রলোক ঃ শুনছি, শুনছো তো বসে আছ

কেন? ছুটে, দল বেঁধে যাও।—গিয়ে হাতটি চেপে ধর। বল গিয়ে—ছোট ছোট টুকিটাকি রেল লাইনগুলো তুলে দিলে, কিছু বলিনি। নয়া পয়সা বার করলে তাও কিছু বলিনি। দণ্ডকারণ্যে পাঠাচ্ছো তাও কিছু বলছি না, কিন্তু—'কাফি হৌস্' নেই ছোড়েঙ্গা!

When gossiping stops, democracy dies বাধা দিলেন অন্যজন। তার চেয়ে বরং বল গিয়ে আচ্ছা বাবা সব ব্যবসাই যদি দেখ লোকসানের, তবে এমন লোকসানের রাজত্বটা সেধে নিলে কেন?—ছেড়ে দিলেই পারো।

টি. এস. এলিয়ট যখন বলেন : "Have known the evenings mornings, afternoons, I have measured out my life with coffee spoons." তখন হয়ত গভীর অর্থেই তা বলেন। সকাল সন্ধ্যা বা কফির চেয়ে চামচটাই হয়ত মুখ্য সেখানে। কিন্তু যে দু'জন বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর আলাপ আপনাদের শুনালাম আমি, এখানে তারাও কম গভীর নন। তাতেও অনেক বেদনা। এলিয়টের কফির চামচের মত কফিটাই তাদের কাছে উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য: কাফি হৌস্। কফি হাউসের স্বাধীনতা, কফি হাউসের জীবনাদর্শ, কফি হাউসের স্বচ্ছন্দচারিতা এঁদের ধ্যান-কল্প। শুধু এই দু'জনেরই নয়, শুধু সাহিত্যিকদেরই নয়,—কফি হাউস কোলকাতার হাজারো লোকের ধ্যান, স্বপ্ন, সাধ। তার মধ্যে কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা আছেন, ছেলে-ছোকরা ছাত্র-ছাত্রীরা আছে, বেকার আছে, কেরানী সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী আণ্ডার সেক্রেটারীরা আছেন, আছেন পাখোয়াজ দালাল, হবু অভিনেতা, ডাইরেক্টার প্রোডিউসর, বিজনেস স্পেকুলেটার—সব। কফি হাউস চেহারায় তাই এত বিচিত্র, এমন সুন্দর, এত ভিন্ন। পাড়ার 'সিদ্ধেশ্বরী কাফে'র এই চরিত্র নেই, নেই কোন 'বারে'রও। কফি

হাউসের মেজাজ বারের ডিমডিমে আলোয় আসে না। স্থান এবং দ্রব্য মাহাত্ম্যে সেখানকার আবহাওয়া ভিন্ন। অনেক বেশি সিরিয়াস 'যোগী'দেরই মানায়। সিদ্ধেশ্বরী কেবিন আবার বেশি তরল। বিশেষ করে রকের ছেলেরা যখন মাঝে মাঝে একটু আড়-ভাঙার জন্য উঠে আসে এখানে তখন আর টেঁকা যায় না! পাড়ার কবি-কবি ভাবের ছেলেটিকে তখন উঠে আসতেই হয়—কাফি হৌসে! কফি হাউস একমাত্র সান্ত্বনা আজকের নগরের! মধ্যবিত্ত যৌবনের একমাত্র ওয়েসিস।

কাফি হৌস্! কোলকাতার কফি হাউস এ নগরের প্রায় জন্ম থেকে। আজকের মতো কফিবোর্ড তখন ছিল না, সুতরাং আজকের কফি হাউসগুলোর কথা হচ্ছে না। এগুলো নিতান্তই হালের। কিন্তু তখনও ছিল। ছিল মানে, ফোর্ট উইলিয়ামের মতোই তখনকার কফি হাউস ছিল এ নগরের প্রাণ। রাজত্বের প্রসার, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি, তথা টুকিটাকি কালচার সব-ই স্বপ্ন ছিল তার! বিশেষ করে সাধারণ চায়ের বা মদের কিংবা খাবারের দোকানের সঙ্গে কফি হাউসের যে স্বাতন্ত্র্য সেটার সূত্রপাতও সে যুগেই। অষ্টাদশ শতকে।

কোলকাতার সবচেয়ে পুরানো যে কফি হাউসটির সন্ধান পেয়েছি আমরা, তার জন্ম ১৭৬২ সালে। অবশ্য সেটি একটি পুরো কফি হাউস নয়। একটি 'কফি রুম' মাত্র। তবে আজকের কফি হাউসের লক্ষণাদি সবই ছিল তার।

১৭৬২ সালের ২১শে জুনের খবর। মিঃ উইলিয়াম পার্কেস্ নামে এক সাহেব কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টারদের কাছে এক আবেদন জানাচ্ছেন যে, তিনি অত্র শহরে একখানা বাগান-বাড়ি কিনেছেন। তার ইচ্ছে বাড়িখানাকে তিনি ভদ্র এবং মহাশয় ব্যক্তিদের খানাপিনা এবং আমোদ-আহ্লাদের কেন্দ্রে পরিণত

করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি কোম্পানীর সম্মতি প্রার্থনা করছেন।

কোম্পানী পার্কেস সাহেবের প্রস্তাব শুনে অবশ্যই আহ্লাদিত হলেন। কারণ, কোলকাতায় তখন হোটেল টেভার্নাদির বিশেষ অভাব। কিন্তু চিন্তার বিষয়ও আছে বৈ কি! তারা তো আর নাচগানের জন্যে এদেশে আসেন নি। এমনিতেই ছেলে-ছোকরাদের যা মতিগতি শেষে এমন হোটেল পেয়ে দিন রাত্তির সেখানেই না মজে থাকে। তা হলে যে গণেশ উল্টে যাবে। তারা তাই অনেক ভেবেচিন্তে পার্কেসকে বললেন: দেখ তোমার বাগানবাড়ির আড্ডাখানা তুমি খুলতে পার, কিন্তু একটি সর্ত আছে। সকালে অর্থাৎ আপিস-টাইমে ওটিকে বন্ধ রাখতে হবে (It was not to be open in the morning as the Board were afraid that it would be the means of keeping people from doing their duty.)। বোধহয় এই ভাবনা থেকেই কফিবোর্ডও তাদের কফি হাউসগুলো বন্ধ করে দেন রাত আটটায়!

যাহোক, তাতেই রাজী হয়ে তার বাগানবাড়িকে হোটেল করলেন সাহেব। নাম হলো তার লণ্ডন হোটেল! 'কফিরুম'ও করা হলো সেখানে একটি। প্রাইস (Prices) ১৭৮০ সালে এই হোটেলের বিবরণে লিখছেন: হোটেলটির খাবার বেশ সস্তা। মদ্যাদি বাদ দিলে খানাপিছু খরচ পড়ে মাত্র এক মোহর! মদের দাম আলাদা। হোটেলে একটি 'কফিরুম'ও আছে। সেখানে এক ডিস্ কফির দাম এক সিক্কা টাকা। তবে তার কিছুটা নেওয়া হয় অন্য কারণে। ইংলণ্ডে কফি হাউসগুলোতে যেমন থাকে, এখানেও তেমনি ইংরেজী খবরের কাগজ স্তূপ দিয়ে রাখা হয়। কফির দামের কিছুটা যায় তার চাঁদা! অর্থাৎ শুধু কফি গিলতে কেউ সেখানে যেতো না। যেতো কাগজ পড়তেও। কফি হৌসের এটাই বৈশিষ্ট্য।

এ বৈশিষ্ট্যে লণ্ডনাগত কোম্পানীর ছেলে-ছোকরারা কিন্তু খুশী হলো না। এ আবার একটা কফি হাউস? গোটা একখানা কফি হাউস চাই আমাদের। এইটু'ন একটা ঘর, মন খুলে একটু আড্ডা দেব তারও জো নেই। ছেলেদের এই মৌন দাবিকে বুঝেই ১৭০৮তে জন্ম হলো ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ কফি হাউসের (Calcutta Exchange Coffee House), এখন সে বাড়িটাকে বলে রয়াল এক্সচেঞ্জ! তার বিজ্ঞাপনে জানানো হলো: এ কফি হাউসটি ভদ্রলোক, বণিক এবং ব্যবসায়ীদের জন্যে (gentlemen, merchants and traders), ছাত্ররা নেই আমন্ত্রণ তালিকায়, কারণ কোলকাতার তখন ছাত্র-ই নেই। এক্সচেঞ্জ কফি হাউসের নিয়ম অন্য রকম। ওখানে কফি খেতে হলে মেম্বার হতে হয়। মাসে চাঁদা চার টাকা! তবে সে তুলনায় ব্যবস্থাদিও কম নয়। কোলকাতা এবং মাদ্রাজের যাবতীয় ইংরেজী খবরের কাগজ এবং লণ্ডনের কিছু কিছু কাগজ ও রাজনৈতিক প্রচারপত্রাদি রাখা হতো ওখানে। সদস্যরা সেগুলো পড়তেন, বিতর্ক ব হৈ-হট্টগোল করতেন।

অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ কফি হাউস ছিল ক্লাবের মতো। যারা যায় সেখানে তারা হয়ত জীবিকায় ভিন্ন কিন্তু কফি হাউসের সদস্য হিসেবে জীবনে এক। সন্দেহ নেই, ডালহৌসির এই বিরাট বাড়িটি কাঁপিয়ে তুলতেন তাঁরা কফির কাপের উপর দিয়ে! আজ মেম্বারসিপের ব্যবস্থা নেই বটে; কিন্তু কফি হাউসগামীদের অন্তরের ঐক্য বোধ হয় এখনও আছে। বোধ হয়, আজও এক-ই প্রতিষ্ঠানের সেবায়েত হিসেবে তাদের সকলের মনে মনে গর্ব। মনে মনে বন্ধুত্ব।

কিন্তু এক্সচেঞ্জ কফি হাউস আড্ডা হিসাবে জমলো যেমন, ব্যবসা হিসাবে ঠিক তেমন নয়। এক বছর যেতে না যেতেই হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে বের হলো: এক্সচেঞ্জ কফি হাউস

বিক্রি হবে। অনেক ঋণ হয়ে গেছে মালিকের, তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর হাউসটিকে রাখা সম্ভব হলো না।

খবর শুনে আজকের মতোই ফ্যানদের তখন মানসিক অবস্থা। তবে তারা খবরের কাগজে দুঃখ করে চিঠি লিখলো না, সোজা চলে গেল মালিকের ওখানে।

—একি করছেন আপনি? আমাদের কি গতি হবে?

মালিকেরা আজকের মতো এতো হৃদয়হীন ছিলেন না বোধ হয়। তাই খদ্দেরদের সঙ্গে বসে নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। লটারী করা হবে। কফি হাউসটিকে বাঁচানোর জন্যে শেষ চেষ্টা হবে এবার। লটারী তখন খুব জনপ্রিয় উদ্যোগ। ঠিক হলো একচেঞ্জ কফি হাউসও লটারী করবে। একশ' টাকা করে টিকিট। ষোল হাজার টিকিট থাকবে।

লটারীর ফলে কফি হাউসটি বেঁচে ছিল কিনা জানি না। তবে সমসাময়িক কালের আর একটি কফি হাউসের খবর আমরা জানি। তার নাম জেরুজালেম কফি হাউস। জেরুজালেম কফি হাউস নামটির একটু ইতিহাস আছে। তখনকার সময়ে লণ্ডনে একটি কফি হাউস ছিল এই নামে। কবি কউপারের পিতৃনিবাস 'কউপারস্ কোর্টে' ১৮৮৮ সাল অবধিও ছিল ওটি। জেরুজালেম কফি হাউসটি কিন্তু লণ্ডনের আর পাঁচটা কফি হাউসের মতো ছিল না। হিকি লিখেছেনঃ ওটি ছিল ভারতবর্ষ নিয়ে যাদের কারবার তাদেরই আড্ডাখানা।

হিকি নিজেও ভারতে আসার আগে ওখানে বসে বসে ভারতের কাহিনী শুনেছেন ভারত-ফেরত নাবিক, সৈনিক এবং সিবিলিয়ানদের মুখে। ভারতবর্ষের শেষ খবর, ভারতের হালচাল জানতে আগ্রহীরা ভীড় জমাতেন ওখানে। কোন্ জাহাজ কবে ছেড়েছে, কোন্ জাহাজ কবে পৌছাবে এখানে—এসব জানারও একমাত্র বেসরকারী স্থান ছিল ওটি। সুতরাং ভারতের সঙ্গে

যাদের যোগ ছিল, তাদের পরিচয় ছিল জেরুজালেম কফি হাউসের সঙ্গেও।

কিন্তু কোলকাতায় নবাগতদের ঠিক এ ধরনের আড্ডাখানা ছিল না। নাবিকেরা গঙ্গায় জাহাজ ভিড়িয়ে উসখুস করতেন। লণ্ডনে সেই জেরুজালেমে কফি গিলে উঠেছেন আর এই এখানে যদি মনের মতো একটা কফি হাউসও থাকতো!—একি রাজ্যি বাবা!

১৭৯০ সালের কথা। মিঃ জন ম্যাকডোনাল্ড নামে এক নাচের মাস্টার কোলকাতায় পা দিয়েই বুঝতে পারলেন—এখানে জেরুজালেমের অভাব। তিনি স্থির করলেন ঐ নামেই একখানা কফি হাউস খুলবেন কোলকাতায়।

ম্যাকডোনাল্ড বাড়ি কিনলেন একখানা ডালহৌসি স্কোয়ারে। কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট যেখানটায় মিলেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে সেখানটায়। জেরুজালেম কফি হাউস খোলা হল। কিন্তু এও তেমন জমলো না। ওয়েলেসলি সাহেব ম্যাকডোনাল্ডের কাছে ভাড়া চাইলেন বাড়িটি। সিবিলিয়ানদের জন্যে ওখানে কলেজ করবেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ম্যাকডোনাল্ড রাজী হয়ে গেলেন। হিকি লিখেছেন: Mcdonald's speculation did not answer his expectation and he was glad to obtain so good a tenant. সুতরাং ফুরিয়ে গেল জেরুজালেম কফি হাউসও। ১৮০০ সালে বসলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। কফি হাউসের কবরে কলেজ। আজ ওখানটায় ব্যাঙ্ক। এখন হংকং অ্যাণ্ড সাংহাই ব্যাংকের বাড়ি ওটি।

জেরুজালেম কফি হাউস উঠে গেল বটে, কিন্তু কোলকাতার ইংরেজ একবার তার স্বাদ পেয়েছে লণ্ডনে। সুতরাং জেরুজালেমের নেশা কাটলো না তাদের।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে Alexander's East India Magazine এ

তাদের উৎফুল্লিত করে বের হলো আর এক সংবাদ। স্পেন্সেস হোটেলের কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, লণ্ডনের জেরুজালেম কফি হাউসের মতো তারাও একটা কফিরুম খুলবেন।

লণ্ডনের জেরুজালেম কফি হাউসের মত সেখানেও খবরের কাগজ পাওয়া যাবে, জাহাজ আসা-যাওয়ার খবর মিলবে। ডাকের থলিও ওখানেই বাঁধা হবে। অর্থাৎ লণ্ডনে চিঠি পাঠাতে হলে কিংবা তাড়াতাড়ি পেতে হলে ওখানে আসা দরকার।

স্পেন্সেস হোটেল তখন ছিল লণ্ডন বিল্ডিংসে। লণ্ডন বিল্ডিংটি ছিল গভর্নমেণ্ট প্লেস্ ওয়েষ্ট এবং হেষ্টিংস স্ট্রীটের মোড়ে, আগে যেখানটায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরখানা এবং ট্রেজারী। এখন বোধ হয় ওখানে ইনকামট্যাক্সের আপিস।

স্পেন্সেসের পর কোলকাতায় স্থাপিত হলো আর এক বিরাট হোটেল। তার নাম অকল্যাণ্ড হোটেল। ১৮৫৮তে অকল্যাণ্ড হোটেলের জন্ম। জন্ম পর থেকেই এর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল জেরুজালেম রুম বা কফি ঘরটি। বিজ্ঞাপনে হোটেলটির পরিচয় দিয়ে কর্মকর্তারা খদ্দেরদের প্রলোভন দেখাচ্ছেন: The Calcutta Jerusalem subscription assembly and reading rooms, for merchants, brokers and captains of ships. অর্থাৎ আড্ডাখানা আছে, পড়বার ঘরও আছে। কফি হাউস আড্ডাপীঠ, কফি হাউস কালচারের নাট-মন্দির বটে!

কেমন আড্ডা জমাতেন সেকালের দালালেরা, সি বয়েরা আমরা তা জানি না, কিন্তু নিজেদের দিয়ে এটুকু অনুমান করি তার বহর আমাদের চেয়ে খাটো ছিল না!

চায়ের আসরের একটি বর্ণনা রেখে গেছেন মিস্ সোফিয়া গোল্ডবর্ন। ১৭৮৯ সালের আড্ডার বর্ণনা। তাই দেখে কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারি কফিরুমের অবস্থা। সোফিয়া বিবি লিখছেন: দেখ, আমরা এখানে—অর্থাৎ কোলকাতায় চা খাই, দল বেঁধে।

ইংলণ্ডের মতো না। এখানকার কায়দা-কামুনও অন্য রকম। তুমি চা খেতে বস্‌লে বেয়ারা এসে দিয়ে গেল একটি কাপ। ধীরে সুস্থে খাও। ওটি ফুরিয়ে যেতে না যেতে আবার সে এসে ভরে দিয়ে যাবে কাপটি। তোমাকে নড়তেও হবে না, কাপটিকেও হাতছাড়া করতে হবে না। এমনি মজা। শেষে লিখছেন : I think I was never so pleased with any one article so polite etiquette in my whole life.

স্পেন্সসের, অকল্যাণ্ডের কফিখানায় অনেক সোফিয়া হয়ত অমুচ্চ গলায় সাগরফেরা নাবিকের কানে কানে একথাটিই বলেছে বার বার !—সে যাক।

অকল্যাণ্ড হোটেল ক্রমে নাম নিল উইলসন হোটেল। ইয়ং বেঙ্গল ভীড় জমালো সেখানে। —ধ্যুত, কফি নিরামিষ ! খেতে হয়—অন্য কিছু !

কফিরুম উঠে গেল। আবার নাম পাল্টাল হোটেলটি। উইলসনের নাম হলো গ্রেট্‌ ইষ্টার্ণ হোটেল ! জেরুজালেমের কাহিনী হয়ত আজকের গ্রেট্‌ ইষ্টার্ণের কাছে স্বপ্নমাত্র।

কফি হাউসের কামনা কোলকাতার আজন্ম। কোলকাতা জন্মও দিয়েছে অনেক কফি হাউস। কিন্তু কেউ টেঁকেনি। বলতে পারেন শুধু খদ্দেরের উৎসাহে তো আর ব্যবসা চলেনা !

আমি অনন্যোপায় হয়ে তাই সেই প্রবীণ সাহিত্যসেবীকে বলেছিলাম, লাভই যদি হবে, তবে বন্ধ করবে কেন তারা ?

—হ্যাঁ, দরকার হলে তাই করে তারা। বজ্রগম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন ভদ্রলোক—Because they know ideas canst thrive in vacuum !—And they are afraid of ideas !

ঠিক এতখানি গুরুতর কি কোলকাতার 'কাফিহৌস'গুলো ? বোধ হয় না।

।। কালেজ-বয় ।।

ঠিক হলো মুসলমানের দোকান থেকে বিস্কুট কিনে খেতে হবে। বেশ তাই হবে। তক্ষুনি দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল ক'জন ছেলে। কোলকাতার বনেদী হিন্দু ঘরের ছেলে সব। কুলীন বামুন পণ্ডিতের ছেলেও যে দু'একজন না আছে এমন নয়। মুসলমানের দোকান থেকে বিস্কুট খাবে তারা। দোকানের সামনে এসে কিন্তু পা থেমে গেল। আর সাহস হয় না এগুতে। হাজার হোক হিন্দু ঘরের ছেলে তো! "—দূর, ভয় কিসের?" বলে কাঁপা কাঁপা পা নিয়েই এগিয়ে গেলো একটি ছেলে। সোজা একেবারে দোকানীর সামনে। দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো বন্ধুরা। অবশেষে যখন ঠোঙা হাতে সত্যিই পা দিল সে রাস্তায়, তখন আনন্দে সবাই চিৎকার করে উঠলো—Hip! Hip! Hurrah!

খেতে হবে। এমনি করে কচ্ কচ্ করে চিবিয়ে চিবিয়ে যেতে হবে কুসংস্কারকে। ঠনঠনেতে এক চাঁদনীরাতে লুটেপুটে খাওয়া হলো উইলসনের বাড়ির রুটি। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে ডেকে একপাল ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো—'এই দেখ গো, বামুনঠাকুর দেখ, আমরা মুসলমানদের জল খাই।' বলেই টপাটপ ক'খানা তামাক খাওয়ার টিকে দিয়ে দিল মুখে।—হোক না টিকে, মুসলমানের তৈরী না? রাগে, দুঃখে অপমানে চোখ বুজে দুর্গানাম স্মরণ করলেন ব্রাহ্মণ।

ছেলেগুলো যেন ঠিক করেছে খেয়ে খেয়েই শেষ করে দেবে হিন্দুধর্ম। শুধু বিস্কুট আর টিকে খেলে চলবে না। রাধানাথের

দৃঢ় অভিমত বাঙালীকে মানুষ হতে হলে গরু খেতে হবে। রাধানাথ গরু ধরলেন। পুত্র রামগোপালের দোষে বাগাতির বামুন-কায়েতেরা গোবিন্দ ঘোষের নাম দিল—গরু-খেকো গোবিন্দ ঘোষ।

সবাই যে খায় তা নয়। দু'একজন হয়ত খায়, কিন্তু চেঁচায় সকলে। ব্রাহ্মণ দেখলেই চেঁচামেচি করে,—বামুনঠাকুর, আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই। শুনে ব্রাহ্মণ কানে আঙুল দেন। আর মনে মনে মুণ্ডপাত করেন—কালেজের। এরা সব কালেজ-বয় কিনা। তাই ছেলে-ছোকরাদের ওপর যতখানি রাগ হয় তার চেয়ে দেড়া হয় কালেজের ওপর। যেমন শিক্ষা, তেমনই তো শিখবে।

কিন্তু হিন্দু কালেজ ঘৃণায় জন্ম হয়নি। এর জন্মের ইতিহাসটা তীব্র বেদনাবোধ আর প্রখর দূরদৃষ্টির ইতিহাস। এখানে তা অবান্তর। শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, এর প্রতিষ্ঠার পেছনে যতখানি উৎসাহ ছিল হেয়ার, হাইড কিংবা হেরিংটনের, তার চেয়ে কম ছিল না—রামমোহন, বৈদ্যনাথ মুখার্জি প্রমুখ নেটিভদের। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল ওল্ড পোস্ট হাউস স্ট্রীটের হাইড সাহেবের বাড়িতে, তার আটাশজন সদস্যের মধ্যে কুড়ি জনই ছিলেন নেটিভ। নেটিভরাই পর পর জায়গা দিয়েছেন কালেজের জন্যে। প্রথমে গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাক, পরে চিৎপুরের রূপচাঁদ রায় এবং অবশেষে জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়িতেই কলেজ বসেছে ১৮১৭ সাল থেকে '২৪ সাল অবধি। হিন্দু কালেজের শেষ বাড়ি কলেজ স্কোয়ারের বাড়িটি অবশ্য গড়া হয়েছিল হেয়ার সাহেবের দেওয়া জমির ওপর। শুধু দালান নিয়ে তো আর কালেজ হয় না। অর্থ এবং সেই সঙ্গে ছাত্রও জুগিয়েছেন কোলকাতার নেটিভরা।—কেন? না ছেলেরা ইংরাজী লেখাপড়া শিখে দুটো পয়সা কামাতে পারবে। ইংরাজী সাহিত্য-

দর্শন পড়ুক, তাতেও তাদের আপত্তি নেই।—কিন্তু এ কি? একে কি বলে শিক্ষা?

রামমোহনের কাছে এসে নালিশ করলেন একজন: "দেওয়ানজি, আমাদের অমুক আগে ছিল—Polytheist, তারপর হয়েছিল diest, এখন হয়েছে atheist." রামমোহন শুনে হেসে উত্তর দিলেন—"শেষে বোধ হয় হবে—beast".

রামমোহন হেসে বলেছিলেন। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হয়ে অনেকে চিৎকার করেই বলতে লাগলেন—পশু, নরপশু। কালেজ-বয় তো নয়—আস্ত একখানা অপোগণ্ড। আজকের এক্‌জামিনে পাওয়া নোটে-ধরা ক্ষীণতনু কালেজ-বয়দের সঙ্গে তুলনা চলে না সেকালের সেই অপোগণ্ডদের। মাথায় যেমনি মগজ, কলজেয় তেমনি সাহস। মদ্য মাংস তো তাদের কাছে চা-পানি। এর চেয়েও অনেক লোমহর্ষক কাজ করে থাকে তারা প্রতিদিন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক নামে ছাত্র ছিল একজন। আদালতে একবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে। তখন নিয়ম ছিল হিন্দু সাক্ষীদের তামা তুলসী আর গঙ্গাজলের ছুঁয়ে শপথ করতে হতো। রসিককৃষ্ণের সামনে গঙ্গাজল পাত্রটি যখন ধরা হলো যথারীতি তখন আদালত সুদ্ধ লোককে চমকে দিয়ে সে ঘোষণা করলো—I do not believe in the sacredness of the Ganges.

আর-এক কালেজ-বয়, নাম তার মাধব মল্লিক, প্রকাশ্য কাগজে স্ব-নামে লিখে বসলেন:

If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism.

ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখছেন হিন্দুর ছেলে:

ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিড়াল-লোচনা
বিবাহ করিব সুখে ইংরেজ-ললনা।

শুধু লেখালেখি নয়, কাজেও শুরু হয়ে গেল। বামুনের ছেলে গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল পৈতে। '—বলে সন্ধ্যা আহ্নিক করবো না, এসব বোগাস্, বাজে।' এ কি কথা, হিন্দুর ছেলে আচার-বিচার মানবে না? মা-বাপ জোর করে ছেলেকে ঢোকালেন ঠাকুর ঘরে। তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজাটি। ছেলে ভেতরে বসে শুরু করলো শাস্ত্রপাঠ। সে শাস্ত্র গীতা নয়, হোমারের 'ইলিয়ড্'!

গোঁড়া বাপ-মায়েরা বিপদে পড়লেন। যাঁরা একটু জবরদস্ত-গোছের তাঁরা বল-প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। রসিককৃষ্ণকে বাইরে চালান দেওয়া স্থির হলো। সজ্ঞানে তা সম্ভব নয়। সুতরাং ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করা হলো তাকে। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গলী' হার্ট, কবরেজী ওষুধ ধরলো না। অসময়ে জ্ঞান ফিরে এলো রসিকের। সে বাড়ি ছেড়ে পালালো।

'—আরও অনেকেই গৃহত্যাগী হবে গো, অনেকেই হবে—ক্রমে ক্রমে'—ছুই চোখ কপালে তুলে এই মাত্র কি দেখে এসেছি তালতলায় তারই বিবরণ দিতে লাগলো বৃন্দাবন ঘোষাল। বনেদী হিন্দুপল্লীতে ঘোষাল—খবরের কাগজ। 'ইয়ং বেঙ্গলীদের' খবর তার চেয়ে বেশি আর কেউ রাখে না; 'কালেজ-বয়দের' নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে—পরিবেশন করাই তার কাজ। সে খবর দিল—এমেলিয়ার সঙ্গে বিয়ে হবে দক্ষিণা-রঞ্জনের।

—হ্যাঁ গা বামুনের পো, আমেলি কে? ওমা এ কি শুনি? আমেলি আবার কে?—জান্‌তে চাইলেন হয়ত মুখুজ্জে বাড়ির ছোট পিসি।

—এমেলি কে তাও জান না বুঝি? ডিরোজিও সায়েবের বোন! তাই তো দিন রাত্তির ছেলে-ছোকরাদের ভীড় তার বাড়ি!

বৃন্দাবন ঘোষাল আরও রঙ্গ করে করে জবাব দেয়।

এমনি সব কাহিনী রটতে লাগলো। প্রতিদিন কালেজ-বয়দের নিত্য-নতুন কেচ্ছা। একদিকে দেওয়ানজী মশাইর সমাজ, অন্যদিকে হিন্দু কালেজ, ডিরোজিও সাহেব। তার উপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদরীদের বক্তৃতা। ছেলে-ছোকরাদের ঘরে রাখা কষ্টকর। বিচলিত হয়ে—গোঁড়ারা অভিযোগ তুললেন কালেজে। রামমোহনকে নিরস্ত করা যায় না। চিৎপুরের রাস্তায় ইঁট মারা হয়েছিল তাঁর গাড়িতে। হেসে দরজাটা টেনে রামমোহন নাকি কোচম্যানকে বলেছিলেন—হেঁকে যাও আপন মনে। হেঁকে হেঁকেই গেলেন তিনি হিন্দু সমাজের মধ্যে দিয়ে। তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু ডিরোজিও সামান্য মানুষ। সামান্য একজন মাস্টার, শিক্ষক। সে কিনা মাসে মাসে মাইনে নিয়ে—এমনি করে নষ্ট করবে ঘরের ছেলেদের?

ডিরোজিওর এই ছেলে-বিগড়ানোর কাহিনীটাও একটু বলতে হয়। একুশ বাইশ বছরের এই তরুণ শিক্ষকটিই ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রকৃত জন্মদাতা। ডিরোজিও বলতে ছেলেরা একেবারে অজ্ঞান। যেমনি পণ্ডিত, তেমনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর। ক্লাসে পড়ানো ছাড়াও টিফিনে টিফিনে তাদের নিয়ে সভা বসাতেন তিনি। ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস নিয়ে ছেলেরা আলোচনা করতো, বিতর্ক হতো। কিছু দিন পরে 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়ে একখানা সমিতিই গড়ে তুললেন তিনি। ওয়ার্ড ইনস্টিটিউসনের বাড়িতে অধিবেশন বসতো তার। কালেজ-বয়রা ছাড়াও তাতে উপস্থিত থাকতেন—শহরের গণ্যমান্য বিদ্বজ্জনেরা। তারও কিছুদিন পর ছেলেদের দিয়েই কাগজ বার করলেন একখানা। নাম: পার্থেনন (The Parthenon)। ডিরোজিওর এক মন্ত্র। জ্ঞানের মন্ত্র। ধর্ম সমাজ সংস্কার—সব কিছুকে বিচার করতে হবে জ্ঞানের কষ্টিপাথরে, যুক্তির আলোকে। যা যুক্তিগ্রাহ্য তাই সত্য। এই ছিল তাঁর শিক্ষা।

এই শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা যখন 'ইয়ং বেঙ্গলী' রূপ ধরে পা দিল বনেদী সমাজের এতদিনকার গোবরলেপা আঙ্গিনায়—তখন স্বভাবতই 'গেল' 'গেল' রব উঠলো চারিদিকে ! এবার হিন্দুয়ানী গেল বুঝি ! ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন : 'কিছু বুঝি নাহি পাও চারিদিক চেয়ে, এবার ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম খেয়ে ! অভিভাবকেরা ক্ষেপে গেলেন। আমরা কালেজে ছেলে পাঠাবো না আর। কালেজের ভেতরেও চললো ডিরোজিওকে সরানোর চেষ্টা। পর পর বের হতে লাগলো নানা রকমের ফতোয়া। অবশেষে গৃহীত হলো বরখাস্তের সিদ্ধান্ত। হেয়ার সাহেব চুপ করে দেখলেন, দেখলেন ডাঃ উইলসন। তাঁরা নিরুপায়। ডিরোজিওর মতো শিক্ষক যে কোন বিদ্যায়তনের গৌরব। তাঁকে রাখতে পারলে—হেয়ার বা উইলসন সাহেবের চেয়ে কে আর খুশী হবে বেশী ? কিন্তু নেটিভদের জন্যই এই কালেজ। তাদের অমতে তাদের ছেলেদের নিয়ে কালেজ করা যাবে কি করে ? সুতরাং তাঁরা নীরব রইলেন।

ডিরোজিও সব শুনলেন। শুনে উইলসনের কাছে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন একখানা। সঙ্গে দিলেন তাঁর পদত্যাগপত্র। ফিরে এলেন বাড়ি। তালতলায় (মোলআলির কাছে)। মা আর বোনদের নিয়ে বাস করতেন তিনি। বাড়িতে বসে কাগজ বার করলেন একখানা। ইস্ট ইণ্ডিয়ান। আর চালালেন তার আলোচনা সভা। দেখতে দেখতে তালতলা তীর্থ হয়ে উঠলো জ্ঞানপিপাসু তরুণদের। পুরনো ছাত্ররা আসেন, নতুনেরাও ভীড় করে। এমন কি মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে, ঝড়-ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করে সুদূর গ্রাম থেকে ছুটে আসে ছেলেরা। এমনি তাঁর আকর্ষণ। আলোর সন্ধান পেয়েছ যেন পতঙ্গ।

এই ছেলেরাই আজব নগরীর নয়া নাগরিক। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হারুচন্দ্র

ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্তির প্রমুখ ছেলেরাই এ নগরের চলতি ধারার বাইরে পা দিল প্রথম। এরা প্রত্যেকের স্বনামধন্য। প্রত্যেকের নিজ নিজ পরিচয় আছে বাংলা দেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে। কিন্তু একদিক থেকে এরা সবাই এক দলের। সবাই কালেজ-বয়। হয় ডিরোজিওর ছাত্র কিংবা মানস-শিষ্য।

ছাত্র হিসেবেও এদের পরিচয় গৌণ নয়। এমিলি ইডেন এই ছাত্রদের সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :—"ইটনের ষষ্ঠ শ্রেণীর যে কোন ছেলেকে কাৎ করে দেবে এরা অঙ্কে। আর যদি ইতিহাস হয়, তবে যে কোন বুড়োকে। এমনি আশ্চর্য এদের স্মৃতিশক্তি।

They asked them to give an account of the firsr Syracusan war, of the Greek schools and their founders, when the Septennial Bill was passed and why, what Pope thought of Dryden, what school of philosophy Trajan belonged to—in short, dodged them about in this way—and they gave most detailed and correct answers. জনশিক্ষা বিষয়ক কমিটিও তাঁদের রিপোর্টে একই কথা বলেছেন, হিন্দু কালেজের ছেলেদের সম্বন্ধে।

যেমন ছাত্র, তেমনি মানুষ। তারাচাঁদের দুর্দিন। খবর পেলেন দক্ষিণারঞ্জন। বেনামীতে টাকা পাঠিয়ে দিলেন তক্ষুনি। হারুচন্দর মুন্সেফ হয়েছিলেন বাঁকুড়ার। একশ' বছর তাঁর কথা মুখে মুখে বলাবলি করেছে বাঁকুড়াবাসী। অমৃতলাল পেলেন সরকারী চাকরী। তোষাখানার অধিকর্তা। লোকে ভাবলো—এবার আর তাঁকে পায় কে! কিন্তু চাকরী ছেড়ে যখন বাড়ি ফিরলেন বেচারা, তখন দেখা গেলো—অবস্থা তাঁর ফিরছে বটে। তবে চলতি দিকে নয়। আরও গরীব হয়ে গেছেন তিনি। সুদূর পশ্চিমে এক দেশীয়

রাজ্যে দুর্ভিক্ষ। প্রজাদের কষ্ট নিয়ে কাগজে খুব লেখালেখি শুরু করলেন—এক অজ্ঞাত স্বামিজী। শেষে অনেক কষ্টে সংবাদ নিয়ে জানা গেল—তিনি কালেজ-বয়, ডিরোজিওর ছাত্র।

কালেজ-বয় সব পারে। মদ খেতে পারে, নিষিদ্ধ মাংস খেতে পারে—কিন্তু পারে না যুক্তিহীন কাজ করতে। গোমাংস তার কাছে মাংস, আর মিথ্যাচার গোমাংস। হিন্দু কালেজের কেরানীবাবু লিখে রেখে গেছেন—

"It was a general belief and saying amongst our countrymen that such a boy is incapable of falsehood, because he is a college boy."

সুতরাং এই কালেজ-বয়েরা অনায়াসে কোলকাতার রাতকে করে তুললেন দিন। বাবু আংটি পরতেন। 'য়্যাসা দিন নেহি রহেগা, ডিজাইনের আংটি। মামলা মকদ্দমা টানাটানির দিন থাকবে না এটাই ছিল তার আংটির কামনা। কিন্তু দেখা গেল দিন সত্যিই পাল্টে যাচ্ছে এবং বড্ড তাড়াতাড়ি। গতি তার নতুন দিকে। তিনিও ধরতে চাইলেন সে দিনকে। শুরু হলো নয়া বিলাস; ছাপাখানা চালাও, এড-মিটিং বসাও, অ্যাসোসিয়েশন কর, ইস্কুল খোল। বাবুদের বিলাস ক্রমে অন্য পথ ধরলো।

নয়া বিলাস পেয়ে বসলো ছেলেছোকরাদেরও। তারা হেয়ার সাহেবের পাল্কীর পেছনে পেছনে ছোটে। '—সাহেব, তোমার স্কুলে নাও না আমাদের।' জ্ঞান চাই। জ্ঞানান্বেষণ কাগজ, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, লিপিলিখন সমিতি। কেবল জ্ঞান। নতুন কথা জানতে হবে। ইংরেজী বই পড়তে হবে। স্কুল খুলতে না খুলতেই বানের জলের মাছের মতো লাফিয়ে এসে পড়ে ছেলের দল। ষ্টীমারে করে গঙ্গা দিয়ে এক সাহেব ফিরছিলেন কোলকাতার দিকে। রাস্তার একদল ছেলে ছেঁকে ধরলো তাকে।—কি চাই?

বই। বই। সকলের এক দাবী।

টেবিলের ওপর ছিল প্ল্যাটোর রচনাবলীর একখণ্ড। তাই দেখিয়ে বললেন—চলবে এতে ?

—হ্যাঁ, যে কোন বইয়ে চলবে। বই চাই শুধু আমরা। ভদ্রলোক অগত্যা কোয়ার্টারলি রিভিউ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ভাগাভাগি করে দিলেন ছেলেদের মধ্যে।

উনবিংশ শতকের কোলকাতা এমনি ক্ষুধা জাগিয়ে তুলেছিল—সেদিন দূর গ্রামেও। জ্ঞান চাই, বুদ্ধি চাই, যুক্তি চাই। গুটি কয় মহাবীর্য বাহু আর গোটা কতক দুরন্ত ছেলে—অবশেষে সত্যিই সূর্যোদয় ঘটালো সূতানটী-গোবিন্দপুরের আকাশে।

অতঃপর এখানে আর সতীদাহের কথা ভাবা যায় না, বিধবা বিয়ের কথায় লজ্জা আসে না, বাগদী ছেলের সঙ্গে বসে পড়তে অপমান বোধ হয় না, অ্যাসোসিয়েশান করতে ভয়ে দাঁতকপাটি লাগে না।